মাছের কাঁটা ।
পথের কাঁটা ॥

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৬২

প্রকাশক
উৎপল হালদার
বাণীশিল্প
১১৩ই, কেশব সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬ বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

"মৈত্রেয়ী তখন একমুহূর্তে বলে উঠলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' যার দ্বারা আমি অমৃতা হব না, তা নিয়ে আমি কী করব।... উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রী-কণ্ঠের এই একটি মাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায়নি—সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম, এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে ."

হঠাৎ রবীন্দ্র রচনাবলীটা বন্ধ করে বাসু-সাহেব তাঁর একক শ্রোতার দিকে তাকিয়ে দেখেন। দেখেন, রানী দেবী তাঁর হুইল-চেয়ারে ক্লান্ত হয়ে বসে আছেন। চোখ দুটি বোজা।

—ঘুম পাচ্ছে?—প্রশ্ন করলেন বাসু-সাহেব।

চমকে উঠে রানী দেবী বললেন, না, শুনছি, পড় তুমি—

—ভাল লাগছে না, নয়?

ম্লান হাসলেন রানী দেবী। মাথাটা নেড়ে সত্যিকথা স্বীকার করলেন।

—তবে থাক! এস কিছু গান শোনা যাক। বল, কী বাজাব?

উঠে গেলেন উনি রেডিওগ্রামের দিকে।

—গান থাক। তুমি এখানে এসে বস তো। কয়েকটা কথা বলার ছিল।

সন্দিগ্ধ চোখে বাসু-সাহেব তাকিয়ে দেখলেন একবার স্ত্রীর দিকে। এসে বসলেন তাঁর পরিত্যক্ত চেয়ারে: বল?

—দেখ, আমাদের যা গেছে তা আর কোনদিন ফিরবে না। আমি না হয় পঙ্গু হয়ে পড়েছি, তুমি তো হওনি! তুমি কেন এভাবে জীবনটাকে বরবাদ করছ?

বাসু-সাহেব নিরুত্তর স্তব্ধতায় বসে থাকেন। পাইপটা পর্যন্ত জ্বালেন না। একটা দম নিয়ে মিসেস বাসু বলেন, তুমি আবার প্র্যাকটিস্ শুরু কর।

হঠাৎ কৃত্রিম হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন পি. কে. বাসু। পাইপটা ধরাতে ধরাতে বলেন, এই কথা! আমি ভাবছি, না জানি কোন সিরিয়াস প্রসঙ্গ তুলবে তুমি।

মিসেস বাসু জবাব দিলেন না। বাসু মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলেন, বললেন, কি হল আবার?

—আমি সিরিয়াসলিই কথাটা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। তোমার যদি আপত্তি থাকে, তবে থাক—হুইল-চেয়ারের চাকাটায় পাক মারতে যান। বাসু হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেন তাঁকে। বলেন, কী বলছ রাণু! তা কি হয়?

—কেন হবে না? মাইথনে সেদিন মিঠুর সঙ্গে যদি তার মা-ও মারা যেত তাহলে তুমি এমন করতে পারতে? এমন সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত··না, না, আমাকে বলতে দাও, প্লীজ! আমি সেন্টিমেন্টাল কথা বলব না, প্র্যাকৃটিকাল কথাই বলব।

বাসু পাইপটা কামড়ে ধরে বলেন, বেশ বল।

—আমি কী বলব? এবার তো তোমার বলার কথা। কেন প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দেবে তুমি?

—কী হবে প্র্যাকটিস্ করে, রাণু? টাকা আমাদের যা আছে, দুজনের দুটো জীবন কেটে যাবে। নাম-ডাক? ও নিয়ে কোন মোহ আমার নেই তা-ছাড়া এই অবস্থায় তোমাকে একলা বাড়িতে ফেলে রেখে আমি কোর্ট কাছারি করতে পারি?

—না, টাকার জন্যে নয়। নাম-ডাকও নয়—কিন্তু তোমার শির-দাঁড়াটা যে ভাঙেনি এটা আমাকে বুঝে নিতে দাও!···তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ, পঙ্গু হয়ে যাচ্ছ। তোমার কি বিশ্বাস চোখের উপর এটা প্রতিনিয়ত দেখেও আমি মনে শান্তি পেতে পারি?

এবার আর রসিকতা করলেন না বাসু-সাহেব। বললেন, কথাটা যখন তুললে রাণু, তখন খোলাখুলিই বলি। কথাটা আমিও ভেবেছি। তুমি ঠিকই বলেছ। আমাদের সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে রয়েছে। 'নেগেশান' দিয়ে অত বড় ফাঁকটা ভরিয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের বাঁচতে হবে! এভাবে নয়—বই পড়ে, গান শুনে, দাবা খেলে—মানে জীবনকে অস্বীকার করে নয়। কাজের মাধ্যমেই আমরা অতীতকে ভুলতে পারব—'আমরা' মানে আমি আর তুমি!

কিন্তু সে জীবন-সঙ্গীতে ঐকতান চাই। রেজনেন্স হওয়া চাই। তুমি গাইবে আমি শুনব, আমি বাজাব তুমি শুনবে—তা নয়! পারবে?

—তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও! তুমি তো জান আমার কতটুকু শক্তি।

—জানি! কিন্তু তোমার মনের কতখানি জোর তাও আমি জানি! বেশ সেই পথেই চিন্তা করি। দু-চারদিন পরে তোমাকে জানাব। কিছু একটা পথ খুঁজে বার করতেই হবে!

—নিশ্চয়ই খুঁজে পাব আমরা।

ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুকে যাঁরা চেনেন না তাঁদের জন্য কিছু পূর্বকথন দরকার। এখন ওঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এককালে দুর্ধর্ষ প্র্যাকটিস্ ছিল ওঁর। কলকাতার বারে সবচেয়ে নামকরা ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। কোর্ট, বার এ্যাসোসিয়েশান, ক্লাব, টেনিস, এই নিয়ে ছিল তাঁর জীবন। সহধর্মিণী রানী বাসুও স্বনামধন্যা। গানের আসরে সৌখীন গাইয়ে হিসাবে তাঁর ছোটা-ছুটিরও অন্ত ছিল না। রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত মাসে পাঁচ-সাতখানা তাঁকে গাইতেই হত। এ্যাপয়েন্টমেণ্টে ঠাসা থাকত কর্তা-গিন্নির দিনপঞ্জিকা।

তারপর একদিন। একটি খণ্ডমুহূর্তে একেবারে বদলে গেল সব। মাইথনে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওঁরা। কর্তা-গিন্নি আর ওঁদের দশ বছরের একমাত্র মেয়ে সুবর্ণ বা মিঠু। পথ-দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মিঠু শেষ হয়ে গেল। বাসু-সাহেব বেঁচে ফিরে এলেন প্রায় অক্ষত, আর তিনমাস পরে যখন মিসেস বাসু [illegible]পাতাল থেকে বের হয়ে এলেন তখন জানা গেল, তাঁর মেরুদণ্ডের একটি [illegible] কোনক্রমে জোড়া তালি দিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি আর কোনদিন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। সন্তানের জননী হতে পারবেন না।

প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছিলেন বাসু-সাহেব। স্ত্রীকে সাহচর্য দেওয়াই হল এর পর থেকে তাঁর দৈনন্দিন কাজ। অদ্ভুত আমুদে লোক—প্রথম পরিচয়ে কেউ বুঝতেই পারত না—ওঁর জীবনের অন্তরালে লুকিয়ে আছে এতবড় একটা ট্র্যাজেডি। পঙ্গু-স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন এখানে-ওখানে। রানী দেবীকেও হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না তিনি উত্থানশক্তি-রহিত—কিন্তু তাঁর মুখখানা বিষাদ মাখানো। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও না কি ধান ভানে। এই ধুরন্ধর প্রতিভাশালী ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ারটিও নাকি তেমনি বেড়াতে গিয়েও তাঁর পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন দু-একবার। আগরওয়াল ইণ্ডাস্ট্রিজের মালিক ময়ূরকেতন আগরওয়ালের মৃত্যু-রহস্যের কথা হয়তো কেউ কেউ শুনে থাকবেন। সেখানে ঐ খুনের মামলায় সুজাতা চট্টোপাধ্যায় আর কৌশিক

মিত্র নামে দুজন জড়িয়ে পড়েছিল। বাসু-সাহেব তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে ঐ দুজনকেই সে মামলা থেকে উদ্ধার করে আনেন। এসব খবর একদিন খবরের কাগজে ফলাও হয়ে বার হয়েছিল তা হয়তো আপনাদের নজরে পড়েছে। তারপরেও আরেকটি খুনের কিনারা তিনি করেছিলেন দার্জিলিঙয়ের এক হোটেলে। হোটেলটার নাম 'দ্য রিপোজ'—সদ্য খোলা হয়েছিল। বস্তুত ঐ হোটেল খোলার উদ্বোধনের দিনেই অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে। হোটেলের মালিক ঐ সুজাতাই—সুজাতা চট্টোপাধ্যায় নয়, সুজাতা মিত্র। ইতিমধ্যে কৌশিক মিত্রকে সে বিয়ে করেছে। সুজাতার বাবা নাকি কী একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন। সেসব এঞ্জিনিয়ারিং খটমট ব্যাপার! আমার ঠিক মনে নেই; মোটকথা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সেই আবিষ্কারের পেটেণ্টটা বেচে সুজাতা লাখ-দেড়েক টাকা পায়। সেই টাকাতেই হোটেল-বিজনেস্ শুরু করেছিল ওরা—স্বামী-স্ত্রী। বাসু-সাহেব আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে হোটেলের উদ্বোধনের দিন ওখানে যান। হোটেলে থাকতেই ঐ খুনের কিনারা করেন। শুনেছি, সেই ঘটনাটার উপর ভিত্তি করে একটি গল্পের বইও লেখা হয়েছে—তার নাম "সোনার কাঁটা।"

যাক্ ওসব অবান্তর কথা। যে কথা বলছিলাম। স্বামী-স্ত্রীর ঐ কথোপকথনের পর থেকেই বাসু-সাহেব ভাবছিলেন কী করে নতুনভাবে বাঁচার ব্যবস্থা করা যায়। উত্থানশক্তিরহিতা স্ত্রীকে জড়িয়ে কেমন করে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়া যায়। ঠিক এমনই সময়ে একদিন ওঁদের বাড়িতে এসে দেখা করল কৌশিক আর সুজাতা। বাসু-সাহেবের নিউ আলিপুরের বাড়িতে। বাসু-সাহেব ওদের আপ্যায়ন করে বসালেন। সুজাতা আর কৌশিক দুজনেই ওঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন। খুশিয়াল হয়ে ওঠেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বলেন, খুব খুশি হয়েছি তোমরা দেখা করতে আসায়। কবে এসেছ দার্জিলিঙ থেকে? হোটেল কেমন চলছে?

সে কথার জবাব না দিয়ে সুজাতা বলে, রাণু-মামীমা কোথায়?

বাসু-সাহেব আসলে বিপুল ঘোষ, আই. এ. এস.-এর মামাশ্বশুর। সেই সূত্রে সকলে তাঁকে 'মামু' বলে ডাকত। বিপুল ঘোষ ছিলেন ডি. এম। যে জেলা-সদরে কৌশিক আর সুজাতার সঙ্গে তাঁর আলাপ সেখানকার অফিসার্স ক্লাবে বাসু-সাহেব হয়ে পড়েছিলেন সার্বজনীন মামু। সেই সুবাদেই কৌশিক-সুজাতা ওঁকে 'বাসুমামা' বলে ডাকে।

বাসু-সাহেব বলেন, আছে ভিতরে। খবর পাঠাচ্ছি, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। হোটেল রিপোজ্ কেমন চলছে? এবার গ্রীষ্মকালে ওখানে

গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসব ভাবছি। এবার কিন্তু গেস্ট হিসাবে নয়, রেগুলার বোর্ডার হিসাবে !

কৌশিক বললে, আমরা দুঃখিত বাসুমামু। আমাদের হোটেলে আপনার ঠাঁই হবে না। অন্য কোনও হোটেল বুক করুন।

হো হো করে হেসে ওঠেন পি. কে. বাসু। বলেন, ওরে বাবা! এত রাগ ! পয়সা দিয়ে থাকব বলায় ? একেবারে—'ঠাঁই হবে না ?'

কৌশিক বললে, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। শুধু সেজন্য নয়। হোটেলটা আমরা বিক্রি করে দিয়েছি।

—বিক্রি করে দিয়েছ ! সে কি গো ! কেন ?

—চলছিল না। পুজোর সময় কিছুদিন, আর গরমের সময় কয়েক সপ্তাহ—বাস্ ! বাকি সাত-আট মাস তীর্থের কাকের মত হাপিত্যেস করে বসে থাকা। সবচেয়ে হরিব্ল্ শীতকালের কটা মাস। দেড় বছর চালালাম—এস্টাব্লিশমেণ্ট খরচই ওঠে না। তাই সুযোগমত একটা অফার পাওয়া মাত্র লক্-স্টক-ব্যারেল বেচে দিলাম !

—বেশ করেছ ! তুমি হলে পাশ করা এঞ্জিনীয়ার। হোটেল-বিজনেস কি তোমার পোষায় ? তা নতুন কি বিজনেস ধরেছ ?

—ধরিনি কিছু। সব বেচে-বুচে ঝাড়া-হাত-পা হয়ে ক'লকাতায় চলে এসেছি !

—উঠেছ কোথায় ?

—হোটেলে। একটা বাসা খুঁজছি; আর একটা বিজনেস। লাখ দেড়েক টাকা ক্যাপিটাল আছে। তাই সুজাতা বললে, চল বাসুমামার কাছ থেকে একটু লীগ্যাল এ্যাডভাইস্ নিয়ে আসি।

বাসু-সাহেব সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, তোমাদের বাসুমামু চেম্বার অফ কমার্স-এর কেউ নন সুজাতা। এখানে আমি কী পরামর্শ দেব ? খুন-জখম রাহাজানি যদি কখনও করে ফেল তখন বাসুমামুর কাছে এস। পরামর্শ দেব।

সুজাতা মাথা নেড়ে বললে, উহুঁ ! খুন-জখম রাহাজানি যদি কখনও করে বসি তবে আর যার কাছেই যাই, আপনার কাছে আসব না। ভরা ডুবি হবে তাহলে !

—কেন, কেন ? এভাবে আমার বদনাম করার মানে ?

—বদনাম নয়, বাসুমামু—আপনিই বলেছিলেন একদিন যে, যখন প্র্যাক্টিস্ করতেন তখন সত্যিকারের অপরাধীর কেস নাকি আপনি নিতেন না !

—কারেক্ট।

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, নিতেন না! কেন?

চুরুটটা ধরাতে ধরাতে বাসু-সাহেব বলেন, ওটাই ছিল আমার প্রফেশনাল এথিক্স। যার এজাহার শুনে বুঝতাম সে নিরাপরাধ, তার কেসই আমি নিতাম। যাকে মনে হত সত্যিকারের অপরাধী তাকে বলতাম—হয় 'গিল্টি প্লীড' করে সাজা নেও, নয় অন্য কোনও উকিলের কাছে যাও।

কৌশিক বলে, সেরেছে! সব উকিল যদি তাই বলে তবে অপরাধীগুলো ডিফেন্স পাবে কোথায়?

—পাবে না।

—কিন্তু পিনাল কোড তো বলছে যে, অপরাধীরও ডিফেন্স পাবার অধিকার আছে। যে অপরাধীর আর্থিক সঙ্গতি নেই তাকে তো সরকারী খরচে ডিফেন্স পাইয়ে দেওয়া হয়।

—তুমি ভুল করছ কৌশিক। পিনাল কোড একথা বলছে না যে, অপরাধীরও ডিফেন্স পাওয়ার অধিকার আছে, বলছে অভিযুক্তের আছে, আসামীর আছে। 'অভিযুক্ত আসামী' আর 'অপরাধী' শব্দ দুটোর অর্থ পৃথক। কিন্তু এসব আইনের কচকচি বন্ধ কর। দাঁড়াও, তোমাদের রাণু-মামীমাকে আগে খবরটা দিই।

বাসু-সাহেব টেবিলের তলায় একটা ইলেকট্রিক বেল টিপলেন। এসে হাজির হল একটি বছর দশ-বারোর চটপটে ছোকরা।

—এই বিশে! এঁদের চিনিস?

বিশু কৌশিক আর সুজাতাকে এক নজর দেখে নিয়ে বললে, হুঁ। সিনেমা করেন।

সুজাতা হেসে ওঠে। বাসু-সাহেব বলেন, দূর গরু! না, এঁরা সিনেমা করেন না। তুই ভিতরে গিয়ে তোর মা-কে বলে আয়, দার্জিলিঙ থেকে সুজাতা আর কৌশিক এসেছে।

সায় দিয়ে বিশু ভিতর দিকে চলে যাচ্ছিল। বাসু-সাহেব তাকে ফিরে ডাকেন—এই বিশে, দাঁড়া! কী বলবি?

—বলব কি, যে দার্জিলিঙ থেকে সুজাতা আর কৌশিক এসেছে।

—তাই বলবি! বেটাচ্ছেলে! কী শেখাচ্ছি এতদিন ধরে?

—তাই তো বললেন আপনে!

—আমি বললাম বলে তুইও বলবি? না! তুই গিয়ে বলবি দার্জিলিঙ থেকে সুজাতা দেবী আর কৌশিকবাবু এসেছেন। বুঝেছিস্?

—আজ্ঞে আচ্ছা।—এক ছুটে চলে যায় ভিতরে।

কৌশিক প্রশ্ন করে, নিউ রিক্রুট?

—সদ্য আমদানি। তবে ইন্টেলিজেন্ট খুব—

সুজাতা বলে, তাহলে আপনি ও বিষয়ে কোনও পরামর্শ দেবেন না? ঐ আমাদের নতুন ব্যবসা কী জাতীয় হবে সেই প্রসঙ্গে?

—কে বলেছে দেব না? ক্রিমিনাল ল-ইয়ার হিসাবে আমার বলার কিছু নেই, কিন্তু তোমাদের মামু-হিসাবে পরামর্শ দিতে দোষ কি? বল, কিসের বিজনেস করতে চাও তোমরা? কৌশিক তো শিবপুরের বি. ই। ঠিকাদারী পোষাবে?

কৌশিক মাথা নেড়ে বললে, না! আমরা যৌথভাবে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। এমন একটা পথের নির্দেশ দিন যাতে আমরা দুজনেই ব্যবসায়ে খাটতে পারি। ঠিকাদারী ব্যবসায়ে প্রায় হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট কাজই টেকনিকাল —তাছাড়া ও ঠিকাদারী আমার পোষাবেও না।

বাসু-সাহেব বিচিত্র হেসে বললেন, তবে কী পোষাবে? গোয়েন্দাগিরি?

একটু বক্রোক্তি ছিল কথাটার ভিতর। কৌশিক, সাময়িক ভাবে, ঘটনাচক্রেই বলতে পারি, সুজাতার বাড়ি গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়েছিল। এই সূত্রেই সুজাতার সঙ্গে তার পরিচয়, প্রণয় ও পরে পরিণয়। কৌশিক কিন্তু রসিকতার ধার দিয়েও গেল না। বললে, কথাটা আপনি মন্দ বলেননি। বক্সীমশায়ের তিরোধানের পর কলকাতা শহরে নামকরা প্রাইভেট গোয়েন্দা আর কেউ নেই। ফিল্ড আছে, কম্পিটিটার কেউ নেই।

সুজাতা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে, বক্সী মশাই মানে?

—ব্যোমকেশ বক্সী! নাম শোননি?

—ও! ব্যোমকেশ বক্সী! তুমি কি তাঁর শূন্য আসনে বসতে চাও নাকি?

কৌশিক উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ছোঁয়ালো। বললে, আমি তো পাগল নই। ব্যোমকেশ বক্সী ছিলেন দুর্লভ প্রতিভা। তাঁর মত গোয়েন্দা আর হবে না; কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর কেউ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না, এটাই বা কি কথা?

—কিন্তু আমার সেখানে ভূমিকা কি?—জানতে চায় সুজাতা।

—যুগ পাল্টে গেছে সুজাতা। ব্যোমকেশবাবু যে-যুগের মানুষ তখনও 'উইমেন্‌স্ লিব.' কথাটার জন্ম হয়নি। এখন যদি আমি ঐ জাতের একটা প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ এজেন্সি খুলে বসি তাহলে তুমি আমি সমান পার্টনার হিসাবে কাজ করতে পারি। বাসুমামু কি বলেন?

—তোমাদের ব্যাপার তোমরা বলবে. আমি কি বলব?

সুজাতা ছদ্ম-অভিমান করে বললে, বা রে! গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিচ্ছেন?

—মোটেই নয়! তোমরা যদি চাও—তলা থেকে ঐ মইটা আমিই ধরে থাকতে রাজী আছি!

সুজাতা আর কৌশিক পরস্পরের দিকে তাকায়। বলে, কি রকম?

বাসু-সাহেব গম্ভীর হয়ে বলেন, জোক্‌স্ এ্যাপার্ট, কয়েকটা কথা তোমাদের বলে নিতে চাই রাণু এসে পড়ার আগে। রাণু কিছুদিন থেকে আমাকে খোঁচাচ্ছে আমি যেন আবার প্র্যাক্‌টিস্ শুরু করি। আমি রাজী হইনি—ওর কথা ভেবেই। তোমরা যদি সিরিয়াসলি এই প্রস্তাবটা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা কর তাহলে আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে এই রকম: আমার বাড়িটা দোতলা। ইংরাজি 'U' অক্ষরের মত। এক তলায় দুটো উইং। পুবদিকের উইং-এ হবে আমার ল-অফিস আর লাইব্রারী। মাঝখানের অংশটা আমাদের রেসিডেন্স। পশ্চিমদিকের উইংটা হবে তোমাদের প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ এজেন্সির অফিস। একতলা কম্‌প্লিট। এবার এস দোতলায়। উপর তলায় তিনখানি ঘর। তোমাদের ফ্ল্যাট। গোটা বাড়িটা হচ্ছে আমাদের দুজনের রেসিডেন্স-কাম-অফিস। তোমাদের কাছে যারা কেস নিয়ে আসবে তাদের লীগ্যাল এ্যাডভাইস নিতেই হবে। তাদের তোমরা পাঠিয়ে দেবে ইস্টার্ণ-উইংএ, আমার অফিসে। আবার আমার কাছে যারা ফৌজদারী মামলায় পরামর্শ করতে আসবে তাদের হামেশাই দরকার হবে একজন প্রাইভেট গোয়েন্দার সাহায্য—আমার টেকনিকের জন্য। ঐ জুনিয়ার ব্রীফ্ সাজিয়ে দেবে আর কোর্টে দাঁড়িয়ে কথার মারপ্যাচে আর লীগ্যাল রেফারেন্স দিয়ে কর্তব্য শেষ করার পাত্র আমি নই। ফলে আমরা হতে পারব পরস্পরের পরিপূরক।

কৌশিক বলে ওঠে, গ্র্যাণ্ড আইডিয়া।

—সুজাতা বলে, কিন্তু একটা সর্ত আছে! আপনি এখনই বলছিলেন, এবার গ্রীষ্মকালে আপনি হোটেল রিপোজে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন—আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে নয়, রেগুলার বোর্ডার হিসাবে। আমরা যদি এ বাড়ির দোতলায় থাকি তবে ভাড়া দিয়ে থাকব।

বাসু-সাহেব বলেন, রাজী আছি! তবে সর্ত একটা কেন হবে? অনেকগুলি সর্ত হবে।

—যেমন?

—ধর—আমি তোমাদের কেস দিলে তোমরা কমিশান চার্জ দেবে। তোমরা আমাকে কেস পাঠালে আমি কমিশন দেব। এসব তো গেল

বিজনেসের ডিটেল্‌স। দ্বিতীয় সর্ত হচ্ছে—হেঁসেল হবে একটা। সুজাতা তার ইনচার্জ। তৃতীয়ত দুটি অফিসের জন্য একটি মাত্র রিসেপ্‌শান কাউন্টার —এই সেন্ট্রাল ব্লক-এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কম্বাইণ্ড রিসেপ্‌শানিস্ট একজনই হবেন —তিনি তোমাদের রাণু-মামীমা!—ঐ যে নাম করতে করতেই এসে গেছেন উনি।

সুজাতা উঠে আসে তাঁকে প্রণাম করতে। রানী বলেন, থাক, থাক।

কৌশিক বলে, থাক নয়, মামীমা—আজকে প্রণাম করতে দিতেই হবে। আপনার পায়ের ধুলোর বিশেষ প্রয়োজন আমাদের নতুন বিজনেস-এর উদ্বোধন দিনে।

—আবার উদ্বোধন! কিসের বিজনেস্‌ তোমাদের?

—শুধু আমাদের নয়, আপনাদেরও। আপনি আর মামুও আমাদের পার্টনার।

রানী দেবী আকাশ থেকে পড়েন। বাসু তখন মিটিমিটি হাসছেন।

সুজাতাই পরিকল্পনাটা সাড়ম্বরে পেশ করে। রানী উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। বলেন, এ খুব ভাল হবে। এই নির্বান্ধব পুরীতে তাহলে কথা বলার লোক পাব এবার থেকে! এস সুজাতা, তোমাকে হেঁসেলের চার্জ বুঝিয়ে দিই!

সুজাতা বলে, সে কি মামীমা, শুভস্য শীঘ্রম্‌ মানে এই মুহূর্ত থেকেই নয়! আমরা আজকালের মধ্যেই চলে আসব। একটা কাজ কিন্তু এখনও বাকি আছে। আমাদের প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ ফার্মটার একটা নামকরণ করতে হবে। মামীমা আপনিই নাম দিন।

রানী দেবী আঁৎকে ওঠার ভঙ্গি করেন। বলেন, ওরে বাবা! ও আমার কর্ম নয়। তোমরা বরং তোমাদের মামাকে ধর।

—বেশ আপনিই নাম দিন—সুজাতা ঘুরে বসে বাসু-সাহেবের মুখোমুখী।

বাসু পাইপটা ধরাচ্ছিলেন। বলেন—উঁ? নাম দিতে হবে? বেশ দিচ্ছি। তোমাদের প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ এজেন্সির নাম হবে—'সুকৌশলী'!

সুজাতা এবং কৌশিক দুজনেই লাফিয়ে ওঠে—গ্র্যাণ্ড নাম!

—উঁহু-হু! তোমরা নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থটা না বুঝেই লাফাচ্ছ মনে হচ্ছে!

—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ! মানে?

—লেডিজ-ফার্স্ট আইনে প্রথমেই সুজাতার 'সু', তার পিছনে পিছনে যথারীতি অনুগামী কৌশিকের-'কৌ'! বাকি 'শলী'টা হচ্ছে 'খলু পাদপূরণে'! সমস্ত কথাটার একটা ব্যঞ্জনা দিতে!

দুই

মাসখানেক পরের কথা।

এই একমাসে নিউ আলিপুরের ও-ব্লকের বাড়িটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এতদিন অধিকাংশ ঘরই তালাবন্ধ হয়ে পড়েছিল। মিসেস্ বাসুর গতিবিধি শুধুমাত্র একতলাতেই সীমিত। দোতলাটা ভাড়া দেবার কথা হয়েছে মাঝে মাঝে—কিন্তু অজানা উটকো লোক এসে ঝামেলা না বাধায় মাথার উপর বসে—এ জন্যই এতদিন দোতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়নি। অর্থের প্রয়োজন তো আর ওঁদের নেই। প্রথম জীবনে মাসে দশ-বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছেন বাসু-সাহেব।

বাড়ির পুবদিকের অংশে দুখানি ঘর। পিছনের ঘরটা হচ্ছে লাইব্রারী, সামনেটা দুটি অংশে বিভক্ত। সামনের দিকটা ল-অফিস—ভিতরে বাসু-সাহেবের চেম্বার। একজন সদ্য-পাশ উকিল প্রদ্যোত নাথ, জুনিয়ার হিসাবে কাজ শিখতে এসেছে। এছাড়া দ্বিতীয় কর্মী নেই। বাসু-সাহেব বলেন, অনেকদিন পর শুরু করছি তো—প্রথমেই কতকগুলো লোককে চাকরি দেব না। প্র্যাক্‌টিস্ যেমন যেমন জমবে, অফিসে লোকও বাড়াব।

পশ্চিমদিকের অংশটাতেও দুখানি ঘর। 'সুকৌশলী'ও কোনও বাড়তি লোক নেয়নি। সুজাতা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা পোর্টেবল টাইপ-রাইটারে ধীরে ধীরে টাইপ করে। কৌশিক প্রথম মাসে একটাও বিজনেস্ পায়নি। কিভাবে বিজ্ঞাপন দেবে তাই শুধু ভাবছে। বাসু-সাহেব একটা কেস্ পাঠিয়েছিলেন—ডাইভোর্স কেস। মেয়েটির অভিযোগ তার স্বামী অসৎচরিত্র। তাই কৌশিককে কদিন তার পিছনে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। খারাপ পাড়ায়।

তারপর একদিন। শুক্রবার বারই এপ্রিল। বাসু-সাহেব নিজের ঘরে বসে একটা আইনের বই পড়ছিলেন। হঠাৎ ইণ্টারকমটা বেজে উঠল। সুইচটা টিপে বাসু-সাহেব বলেন, কী ব্যাপার, ব্রেকফাস্ট রেডি?

—না। তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছেন। মিস্টার জীবন-কুমার বিশ্বাস। প্রয়োজন বলছেন, আইনঘটিত পরামর্শ। পাঠিয়ে দেব?

বইটা সরিয়ে রেখে বাসু-সাহেব বলেন, দাও।

সকাল সাড়ে আটটা। অফিস আজ ছুটি, শুভ ক্রাইস্ট্‌ডে। প্রভোত আসবে না আজ। কাছারী বন্ধ। একটু পরে বিশু পথ দেখিয়ে একজন ভদ্রলোককে নিয়ে এল। ভদ্রলোক খোলা-দরজার সামনে একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন— দেখলেন, ব্যারিস্টার বাসু সামনের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। ভদ্রলোক কাশলেন। বাসু-সাহেব এবার ওঁর দিকে ফিরে বললেন, আসুন। বসুন ঐ সোফাটায়।

আগন্তুক ভদ্রলোক জানতেন না বাসু-সাহেবের টেক্‌নিক। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল পি. কে. বাসু জানেন উকিলের সাক্ষাৎমাত্র লোকে একটা আবরণ টেনে দেয় তার মনের উপর। ঠিক যে মুহূর্তে সে উকিলের দিকে চোখে-চোখ তুলে তাকায় তখনই সেই পর্দাটা সে টেনে দেয়—ঠিক তার আগের মুহূর্তটাতেই সে সব চেয়ে দুর্বল—যখন সে ছদ্মবেশ ধারণ করতে চাইছে। তাই বাসু-সাহেবের চেম্বারে ওঁর সামনেই টাঙানো আছে, একটা আয়না, আর প্রবেশ পথের উপর ফেলা আছে একটা জোরালো আলো। আগন্তুক ধ্যানস্থ ব্যারিস্টার সাহেবকে দেখে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না—তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে আয়নার ভিতর দিয়ে ওকেই লক্ষ্য করছিলেন। ঘরে ঢুকে পরে হয়তো সে এটা লক্ষ্য করে—কিন্তু ততক্ষণে প্রথম প্রবেশ-মুহূর্তটি অতিক্রান্ত।

—বলুন, কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?

আগন্তুক ধুতি-পাঞ্জাবি পরা—বেশবাসে আভিজাত্য নেই কিছু। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চোখে চশমা, ঝোলা গোঁফ, হাতে একটি ফোলিও ব্যাগ।

ব্যাগটা পাশে রেখে জীবনবাবু বসলেন সোফাটায়। হাত দুটো জোড় করে নমস্কার করলেন। বললেন, তার আগে স্যার, একটা কথা জানতে চাই। আপনাকে কত ফি দিতে হবে। আমি মধ্যবিত্ত ছা-পোষা মানুষ, বিপদে পড়ে এসেছি। আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি; কিন্তু আপনাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার আর্থিক ক্ষমতা আমার নেই।

—কি করেন আপনি ?

—আমি স্যার বোম্বাই-এর কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ক্যাশিয়ার। কুল্লে চারশ পচাত্তর টাকা মাইনে পাই, আর ফ্রি কোয়ার্টার্স। ব্যবসায়ের কাজেই কলকাতা এসেছি—মানে মালিকের নির্দেশে। আমি আজ দশ বছর কলকাতা ছাড়া—পথ-ঘাটও ভাল চিনি না। এখানে এসেই বিপদে পড়ে গেছি। আত্মীয় বন্ধু কেউ নেই যে পরামর্শ করি। আপনার নাম জানা ছিল। টেলিফোন গাইড খুঁজে ঠিকানা দেখে চলে এসেছি।

—তাহলে আগে একটা টেলিফোন করলেই পারতেন ?

—টেলিফোনে ও সব কথা বলতে চাই না স্যার।

—কী আশ্চর্য! টেলিফোনে তো শুধু এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতেন। যাক সে কথা, আপনার বিপদটা কী জাতীয় ?

—স্যার, আপনার ফি-এর কথাটা—

—ফি-এর অঙ্কটা নির্ভর করবে আপনার কেস-এর উপর। তবে কেসটা শোনার জন্য আমি কিছু চার্জ করব না। আপনি বিস্তারিত বলে যান। ফি-এর কথা অত ভাববেন না, প্রয়োজন হলে আপনাকে পরামর্শও দেব, ফি চার্জ করব না।—বলুন—

—আপনি আমাকে বাঁচালেন স্যার। তাহলে খুলেই বলি সব কথা।

জীবন বিশ্বাস মাড়োয়ারী সওদাগরী অফিসের কেশিয়ার। কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া একটি কোটিপতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। মালিকের নির্দেশে জীবনবাবু কলকাতায় এসেছেন দিন-সাতেক আগে। একা নয়, সঙ্গে আছেন ম্যানেজার সুপ্রিয় দাশগুপ্ত। ম্যানেজারের নতুন চাকরি, এম. এ. পাশ। চাকরি নতুন হলেও বড় কর্তার প্রিয় পাত্র। ওঁরা এসে উঠেছেন পার্ক স্ট্রীটের পার্ক হোটেলে—

বাসু-সাহেব ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ঐ সুপ্রিয় কত টাকা মাইনে পায় ?

—কাটাকুটি করে পে-প্যাকেট পায় এগারো শো টাকার, লোন নেওয়া আছে বলে বেশ কিছু কাটা যায়!

—বুঝলাম। পার্ক হোটেলে দৈনিক কত খরচ পড়ছে আপনাদের ?

জীবনবাবু রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন স্যার। খুলেই বলি। আমরা ঠিক কোম্পানির কাজে আসিনি—এসেছি আমাদের বড় কর্তা মোহনস্বরূপ কাপাড়িয়ার ব্যক্তিগত কাজে—যাবতীয় খরচ তাঁরই। বড় কর্তার সাদার্ন এ্যাভিন্যুতে একটা বাড়ি আছে। সেটা বিক্রির ব্যাপারে। বিক্রি হল সাড়ে ছয় লাখ টাকায়। রেজেস্ট্রি ডীডে কিন্তু লেখা হল সাড়ে চার। দুই লাখ হচ্ছে কালো টাকা। এটা আমরা নগদ নিয়েছি। টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখা চলবে না, ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ করানো চলবে না। বড় কর্তার নির্দেশ আছে ওটা নগদে বড়বাজারে একজনের কাছে জমা দিয়ে হুণ্ডি করিয়ে নিয়ে যেতে হবে। নগদ দু লাখ টাকা হয়তো দু-একদিন হোটেলে লুকিয়ে রাখতে হতে পারে। তাই বড় কর্তা আমাদের দুজনকে কোন খানদানী বড় হোটেলেই উঠতে বলেছিলেন। দিন চার পাঁচের তো ব্যাপার—

—বুঝলাম। তারপর? লেনদেন হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ স্যার; কিন্তু মুশ্‌কিল হয়েছে কি, সুপ্রিয়বাবুর মতি গতি সন্দেহজনক লাগছে আমার কাছে। উনি টাকাটা নগদেই বোম্বাই নিয়ে যেতে চাইছেন। কারণ বলছেন, যাঁর কাছ থেকে হুণ্ডি করানোর কথা তিনি এখন কলকাতায় নেই—

—এ কথাটা সত্যি? আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন?

—হ্যাঁ স্যার। সত্যি।

—তাহলে আপনার বড় কর্তার সঙ্গে ট্রাংক লাইনে কথাবার্তা বলে নির্দেশ নিন না।

—ঐখানেই তো হয়েছে মুশ্‌কিল স্যার। বড় কর্তা বোম্বাইয়ে নেই—এমন কি ভারতবর্ষেই নেই। উনি এখন আছেন ব্যাঙ্ককে। আর সবচেয়ে ঝামে হয়েছে এই যে, বড় কর্তা এই সম্পত্তিটা বেচে দিচ্ছেন গোপনে—মানে পরিবারের লোকেরাও জানে না। ওঁর স্ত্রী পর্যন্ত না। ন,

—স্ত্রী পর্যন্ত না? আপনি সেটা কেমন করে জানলেন?

হাসলেন জীবনবাবু। বললেন, ও আপনি শুনতে চাইবেন না স্যার—মেয়েছেলে ঘটিত ব্যাপার। টাকাটা উনি ওঁর রক্ষিতাকে দিচ্ছেন। মানে ওড়াচ্ছেন!

—বেশ তো, তাঁর টাকা তিনি ওড়াচ্ছেন—তাতে আপনার আমার কি?

—না, তা তো বটেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে ঐ দু'লাখ টাকা নগদে নিয়ে যাবার সময় যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়, তবে আমি ফেঁসে যাব না তো?

বাসু-সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, দায়িত্বটা আপনার বড়কর্তা কার উপর দিয়েছেন?

—ম্যানেজারের উপর স্যার। আমি তো কেশিয়ার মাত্র। পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি দেওয়া আছে ম্যানেজারকে। দলিলে, রসিদে সইও করেছেন তিনি—আমি শুধু সঙ্গে আছি। উনিই আমার উপরওয়ালা—

—তবে আর কি? আপনার ভয়টা কি?

জীবনবাবু ইতস্তত করে বললেন, এর মধ্যে স্যার আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। ম্যানেজার-সাহেব আমাকে ট্রেনের টিকিট কাটতে পাঠিয়েছিলেন। বোম্বে মেলে একটা ফার্স্ট ক্লাস ক্যুপেতে দুখানা টিকিট আমি কেটে এনেছি—কিন্তু টিকিট কাটা হয়েছে মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস দাসগুপ্তের নামে।

—তাতে কি? মিসেস দাসগুপ্তাও ঐ ট্রেনে যাচ্ছেন বুঝি? আর আপনার টিকিট হয়েছে কি পাশের কামরায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, মিসেস দাসগুপ্তা বর্তমানে বোম্বাইতে আছেন।

—তার মানে? আপনি আপনার ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেননি এমন করার অর্থটা কি?

—করেছিলাম। উনি বললেন, মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস্ না বললে ক্যুপে পাওয়া যাবে না। তাই উনি তিনখানা টিকিট কাটতে বলেছেন। ট্রেন ছাড়ার সময় আমি বসবো পাশের কামরায়। ক্যুপের একটা সীট ফাঁকা থাকবে। তারপর আমি চলে আসব ক্যুপেতে।

বাসু-সাহেব জবাব দিলেন না। কি যেন ভাবছেন তিনি। জীবনবাবু লেন, ইতিমধ্যে আরও এক ব্যাপার হয়েছে স্যার। আমাদের হোটেলে শের ঘরেই একজন মহিলা এসে উঠেছেন। তিনি ম্যানেজারের সঙ্গে মাঝে গুজগুজ ফুসফুস করছেন। তিনি কে তা আমি জানি না। প্রথমে ছিলাম তিনি বুঝি বাঙালী। কিন্তু ম্যানেজার-সাহেব বললেন, ওঁর নাম ডিক্রুজা এবং জানালেন তিনিও নাকি ঐ একই ট্রেনে বোম্বাই যাচ্ছেন।

—ইন্টারেস্টিং কেস! ঐ একই ক্যুপেতে?

হঠাৎ লজ্জা পেলেন জীবনবাবু। মুখটা নিচু করে বললেন, সেটা আমি জিজ্ঞাসা করিনি স্যার। হাজার হোক উনি আমার উপরওয়ালা। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। এক নম্বর—কেন উনি এভাবে অতগুলো নগদ টাকা ট্রেনে করে নিয়ে যাচ্ছেন, দু নম্বর—কেন আমাকে পাশের ঘরে পাচার করলেন, তিন নম্বর—ঐ অচেনা মেয়েটা যদি সত্যিই ওঁর সঙ্গে এক ক্যুপেতে—সঙ্কোচে মাঝখানেই থেমে গেলেন জীবনবাবু।

—বুঝলাম। তা আপনি কি করতে চান?

—সেই পরামর্শই তো করতে এসেছি আপনার সঙ্গে।

—কবে আপনাদের রওনা হবার কথা?

—আজ রাত্রে সাড়ে সাতটার বম্বে মেল-এ।

—টাকাটা বর্তমানে কোথায় আছে? হোটেলে আপনাদের ঘরে?

—হোটেলেই; তবে আমাদের ঘরে নয়। হোটেলে সেফ-ডিপজিট ভল্টে।

—টাকাটা কি একশ' টাকার নোটে?

—আজ্ঞে না। দশ টাকার নোটে। দু' স্যুটকেশ বোঝাই!

—ঠিক আছে। আপনি এক কাজ করুন—আমাকে যা যা বললেন তা একটা বিবৃতির আকারে লিখে ফেলুন। সেটা আমাকে দিয়ে যান।

যাতে প্রমাণ হবে কোনও দুর্ঘটনা ঘটার পর আপনি বানিয়ে কিছু বলছেন না।

জীবনবাবু গোঁজ হয়ে বসে কী ভাবতে থাকেন।

—কী ভাবছেন বলুন তো?

—ভাবছিলাম কি স্যার, আপনি যা বলেছেন তা খুবই ভাল—কিন্তু একটা মুশ্‌কিল আছে। ধরুন যদি ভালমন্দ কিছু হয়েই যায় তখন আপনি হবেন আমার পক্ষের উকিল। সে ক্ষেত্রে তো আপনি নিজেই সাক্ষী দিতে পারবেন না। তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন? আমি এখন হোটেলে ফিরে যাই। সব কথা একটা বিবৃতির আকারে লিখে ফেলি। তারপর পোস্ট-অফিস থেকে রেজিস্ট্রি ডাকে আপনাকে পাঠাই। সীল মোহর করে। আমি ভাল করে দেখে দেব যাতে পোস্ট-অফিসে তারিখের ছাপটা খামের উপর পড়ে। সে ক্ষেত্রে আপনি সীলটা ভাঙবেন না। চিঠিটাও পড়বেন না। ভালমন্দ কিছু ঘটলে সীল-মোহর করা খামটাই আপনি প্রমাণ হিসাবে দাখিল করবেন!

বাসু-সাহেব বুঝতে পারেন এই কেশিয়ার একটি ধুরন্ধর ব্যক্তি। বললেন, কিন্তু পোস্ট-অফিস তো আজ বন্ধ। গুড-ফ্রাইডের ছুটি।

—জি. পি. ও. তে রেজিস্ট্রেশান খোলা। সে আপনাকে ভাবতে হবে না।

—ঠিক আছে। তাই করুন।

—আপনি আমাকে বাঁচালেন স্যার।

বাসু-সাহেব তাঁর ডায়েরিতে ওঁদের নাম, ধাম, পার্ক হোটেলের রুম নম্বর, রেলওয়ে টিকিট তিনটের নম্বর এবং বোম্বাইয়ের ঠিকানা লিখে নিলেন। জীবনবাবু প্রশ্ন করেন, আপনাকে কি দেব স্যার?

—কিছু দিতে হবে না আপনাকে। এবার আসুন আপনি।

জীবনবাবু যেন এই জবাবই আশা করছিলেন। নমস্কার করে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলেন তিনি। জীবনবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র বাসু-সাহেব ইণ্টারকমে সকলকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। পূর্বাংশ, পশ্চিমাংশ এবং মধ্যমাংশের রিসেপ্‌শান কাউণ্টারের মধ্যে ইণ্টারকম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পাঁচ মিনিটের ভিতরেই বাসু-সাহেবের ঘরে এসে বসলেন মিসেস বাসু, কৌশিক, আর সুজাতা। বাসু-সাহেব বললেন, তোমাদের পরামর্শ চাইছি, বল আমার কি করা উচিত। ওয়ান ইজটু টোয়েন্টি রেশিওতে একটা বাজি ধরার সুযোগ এসেছে আমার সামনে। পাঁচশ' টাকা ঢালতে হবে—পেলে পাব দশহাজার, না পেলে পাঁচশ' টাকাই বরবাদ হবে! এখন তোমরা বল, আমার কি করা উচিত।

কৌশিক বললে, ওয়ান হুন্ড্রেড-টু পোয়েন্ট! নিশ্চয় বাজি ধরবেন!

সুজাতা বলে, আগে বলুন জেতার চান্স কত পার্সেণ্ট?

রানী বললেন, করছ ওকালতি, এর মধ্যে বাজি ধরাধরির কি আছে?

বাসু-সাহেব নিরুপায় ভাবে শ্রাগ্ করলেন শুধু।

ওদের পীড়াপীড়িতে খুলে বলতে হল সব কথা। শেষে বললেন, আমার অভিজ্ঞতা বলছে—ব্যাপারটা ঘোরালো। ঈশান কোণে যে ছোট্ট কালো স্পটটা দেখা যাচ্ছে ওটা কালবৈশাখী হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। খুন, তহবিল তছরূপ, রাহাজানি, ডাকাতি যা হোক একটা কিছু হবে। কেসটা তাহলে অনিবার্যভাবে আসবে আমার কাছে। দু-লাখ টাকা ইনভল্‌ভড্ হলে পাঁচ পার্সেণ্ট হিসাবে আমার কমিশন হবে দশ হাজার টাকা। কিন্তু এখনই আমাকে সেই আশায় শ'পাঁচেক টাকা ইনভেস্ট করতে হয়। আমার প্রশ্ন: করব?

কৌশিক আবার বললে, আলবৎ!

সুজাতা বলে, এটা গাছে-কাঁঠাল-গোঁফে-তেল হচ্ছে না কি?

বাসু-সাহেব বলেন, আর রাণু? তোমার মত?

রানী বলেন, আমার মতে সুজাতা একটু বেশী আশাবাদী। গাছে কাঁঠাল নজরে পড়ছে না আমার! বরং বলতে পার 'ট্যাঁকে-বিচি, গোঁফে তেল!'

—সেটা আবার কি?

—তুমি কাঁঠালের বিচি পকেটে নিয়ে ঘুরছ। পুঁতলেই গাছ হবে, গাছ হলেই কাঁঠাল, পাকলেই পেড়ে খেতে হবে—তাই গোঁফে তেল দিতে শুরু করেছ!

হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই। মায় বাসু-সাহেব পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু বাসু-সাহেবকে রোখা গেল না। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস, হয় জীবনবাবু, না হয় ঐ সুপ্রিয়-ডিক্রুজা টাকাটা হাতাবার তালে আছে। এখন থেকে ব্যবস্থা করলে এ দুর্ঘটনা এড়ানো চলতে পারে। কৌশিককে উনি বললেন, তুমি এখনই একটা স্যুটকেস্ নিয়ে পার্ক হোটেলে চলে যাও। ওরা আছে রুম নম্বর 39-এ। তার কাছাকাছি একটা ঘর একদিনের জন্য ভাড়া নিও। ঘরটা নেওয়ার আগে দেখে নিও ওখান থেকে রুম 39 নজরে আসে কি না। তারপর সারাদিন ঐ কেশিয়ার-ম্যানেজারের উপর নজর রাখ। কে কখন বেরিয়ে যাচ্ছে, ঢুকছে, কোনও বাইরের ভিজিটার্স আসছে কিনা, কোথায় লাঞ্চ করছে ইত্যাদি।

কৌশিক বলে, আর কিছু ?

—হ্যাঁ। এছাড়া তুমি বম্বে মেলে-এ একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কাটো। রিজার্ভেশান যদি না পাও তাহলেও টিকিট কাটবে। সুপ্রিয় যে কথা জীবন বিশ্বাসকে বলেছে তা যদি সত্য হয় তাহলে একটা বার্থ শেষ মুহূর্তে খালি পাবেই। যদি নাও পাও তবে কণ্ডাকটার গার্ড-এর সঙ্গে ম্যানেজ করে নিও। শেষ পর্যন্ত দরকার হলে প্যাসেজে বসেই যেতে হবে। মোটকথা ঐ বগীতে তোমাকে বোম্বাই যেতে হবে।

—বুঝলাম। বোম্বাই গেলাম। তারপর ?

—ঐ ম্যানেজার আর কেশিয়ার নিরাপদে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেই তোমার ছুটি। ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগে সহযাত্রী হিসাবে ওদের দু-জনের সঙ্গেই যতটা পার আলাপ জমাবে।

—আর কিছু নির্দেশ ?

—আছে। প্রথম কথা, পার্ক হোটেলে যখন উঠবে তখন তোমার ছদ্মবেশ থাকবে। ট্রেনে স্বাভাবিক চেহারায়। যাতে ওরা দুজন বুঝতে না পারে যে, ওদের ট্রেনের সহযাত্রী ভদ্রলোক ঐ পার্ক-হোটেলেরই বোর্ডার ছিল। দ্বিতীয় কথা, ট্রেন ছাড়ার আগে তুমি সুজাতার সঙ্গে কথা বলবে না।

—সুজাতা! সুজাতাকে কোথায় পাব!

বাসু-সাহেব এবার সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, তুমি সুজাতা, সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া স্টেশানে চলে যাবে। সঙ্গে নেবে শুধু একটা লেডিজ হাত-ব্যাগ। স্টেশানে পৌঁছে একটা প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটবে। বম্বে মেল নয়-নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে রাত সাড়ে সাতটার সময় ছাড়ে। কিন্তু সেটাকে বেদবাক্য বলে ধরে নিও না। কানখাড়া করে শুনে নিও ঘোষক বলছে কিনা: কৃপা কর শুনিয়ে ত্রি-আপ বোম্বাই মেল নও নম্বরকে বদলে—

সুজাতা বাধা দিয়ে বলে, আপনি কি আমাকে বাচ্চা খুঁকটি পেয়েছেন ?

—না। সব সম্ভাবনাই ভেবে দেখছি আমি। মোটকথা ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভেশান চার্টে দেখবে 3542 এবং 3543 টিকিটধারী মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস্ দাসগুপ্তের ক্যুপে কোন্ বগীতে আছে। ঐ ক্যুপেতে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে। কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখবে।

—আর কণ্ডাকটার গার্ড যখন আমার রিজার্ভেশান টিকিট দেখতে চাইবে ?

—তখন বলবে, তুমি মিসেস দাসগুপ্তা। তোমার কর্তা টিকিট আর

মালপত্র নিয়ে পিছনের ট্যাক্সিতে আসছেন। ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত ঐ অজুহাতে কামরায় বসে থাকবে। তারপর বাধ্য হয়ে নেবে পড়ে কর্তাকে খুঁজবার অভিনয় করবে। এনি কোশ্চেন?

—ধরুন যদি ঐ সুপ্রিয় দাসগুপ্ত একটি মহিলাকে নিয়ে এসে কণ্ডাকটার গার্ডকে তাদের রিজার্ভেশান দেখায়?

—তা তো দেখাবেই। তবু তুমি সীট ছাড়বে না। ঝগড়া-চেঁচামেচি করবে—যাতে ভীড় জমে যায়।...অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন সুজাতা? এ জাতীয় কাজ তো তোমরা হামেশাই অহেতুক করে থাক, আজ প্রয়োজনে পারবে না?

—কী করে থাকি?

—অবুঝের মত অহেতুক চেঁচামেচি! আবদেরে ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলা—'আগে আমার মিস্টার আসুন, না হলে আমি সীট ছাড়ব না।'

সুজাতা হেসে ফেলে। বলে, আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলুন তো?

—ভীড় জমানো। যাতে আশপাশের কামরার প্যাসেঞ্জার কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা দেখতে আসে। অন্তত কণ্ডাকটার গার্ড যাতে ঐ তথাকথিত মিসেস্ দাসগুপ্তাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে ঐ কণ্ডাকটার গার্ড বা অন্য কোন সহযাত্রী সহজেই মেয়েটিকে সনাক্ত করতে পারবে।

রানী বলেন, আর আমার কাজ? কড়ায় তেল বসিয়ে দেব?

—তেল?

—ভ্যারেণ্ডা ভাজতে?

—না! তুমি হচ্ছ আমাদের কন্ট্রোলরুম। কৌশিক প্রতি দু' তিন ঘণ্টা অন্তর রিপোর্ট দেবে। তুমি সেই রিপোর্ট সময়-চিহ্ন দিয়ে নোট করে যাবে। আমাদের তিনজনকে গাইড করবে ওর রিপোর্ট অনুযায়ী।

তিন

রানী দেবীর সমস্ত দিনটাই কর্মব্যস্ত গেল। কৌশিক পর পর চার পাঁচ বার ফোন করেছে। বেলা দশটায় প্রথমবার—পার্ক হোটেল থেকে। খবর: ও একচল্লিশ নম্বর ঘরে উঠেছে। ওখান থেকে উনচল্লিশ নম্বর ঘর নজর রাখা যাচ্ছে। সেটাতে দুজন বোর্ডার আছেন। ডবল-বেড রুম। হোটেল রেজিস্টারে দেখেছে তাঁদের নাম: জীবনকুমার বিশ্বাস আর সুপ্রিয় দাসগুপ্ত।

ায়ী ঠিকানা—কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানি, বোম্বাই। জীবনবাবু ধাহমপী। দোহারা চেহারা, গোঁফ আছে। তিনি ঘর ছেড়ে দু-তিনবার বর হয়েছেন। সুপ্রিয় একবার মাত্র বার হয়েছিল। বারান্দায় বেরিয়ে এসেই াবার ঘরে ঢুকে যায়। সে যে ঘরে আছে তার আরও প্রমাণ আছে। ারণ জীবনবাবু যতবারই বার হচ্ছেন ঘরে তালা দিয়ে যাচ্ছেন না। ফিরে এসে নক্ করছেন। ভিতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিচ্ছে।

রানী দেবী রিপোর্টটা বিশুর হাতে পাঠিয়ে দিলেন বাসু-সাহেবকে। বাসু টা পড়ে তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন পার্ক হোটেলের একচল্লিশ নম্বর ঘরে— টা বারোয়।

কৌশিক ফোন ধরতেই বললেন, তোমার রিপোর্ট পেয়েছি। শোন, বার জীবন ঘর ছেড়ে বার হলেই তুমি উনচল্লিশে ফোন কর। সাড়া দিলেই লবে, তুমি জীবন বিশ্বাসকে খুঁজছ। ভ্যাচারালি লোকটা বলবে, তিনি রে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রশ্ন করবে, আপনি কি সুপ্রিয়বাবু? সে উত্তর দওয়ামাত্র লাইন কেটে দেবে। রিপোর্ট ব্যাক রেজাল্ট।

কৌশিক দ্বিতীয়বার ফোন করল দশটা কুড়িতে। বলল, জীবন সওয়া শটায় ঘর ছেড়ে বার হতেই ও ফোন করে। উনচল্লিশ নম্বরে কেউ সেটা রে। কৌশিক প্রশ্ন করে, 'জীবনবাবু আছেন?' লোকটা জবাবে প্রতিপ্রশ্ন রে, 'আপনি কে?' কৌশিক বলে, 'আপনি কি সুপ্রিয়বাবু?' লোকটা যেন পিন-আটকে-যাওয়া-রেকর্ড—বলে, 'আপনি কে?' সব শুনে বাসু-সাহেব লেন, ঠিক আছে। জীবন ঘরে ফিরলেই আমাকে ফোন জানিও।

গারোটার সময় কৌশিক জানালো সুপ্রিয় দাসগুপ্তকে এখনও দেখা য়নি; এবং জীবন বিশ্বাস ঘরে ফিরেছে। বাসু তখন নিজেই ফোন করলেন উনচল্লিশ নম্বর ঘরে। ফোন ধরল সুপ্রিয়। বাসু বললেন, 'জীবনবাবু াছেন?'

লোকটা বলল, আপনি কে?

বাসু বললেন, আমি যেই হই না মশাই, তাতে আপনার কি? জীবনবাবু থাকেন ডেকে দিন, না থাকেন—বলুন, নেই।

একটু নীরবতার পর বাসু শুনলেন, হ্যালো, জীবনকুমার বিশ্বাস বলছি।

—আমি পি. কে. বাসু। ফোন ধরেছিল কে বলুন তো। দু'-দু' বার— জীবন ওঁকে শেষ করতে দিল না। বললে, বুঝতেই তো পারছেন। ুন, কেন ফোন করছিলেন?

—রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ, এই মাত্র।

—দু'-লাখ টাকা ব্ল্যাক মানির কথাটাও লিখেছেন নাকি?

—না। শুধু লিখেছি অনেক টাকা নগদে নিয়ে যাচ্ছি।

—ঠিক আছে।—লাইন কেটে দিলেন বাসু।

এরপর কৌশিকের ফোন এল বিকেল চারটেয়। সে টিকিট পেয়েছে ঘটনাচক্রে রিজার্ভেশানও। সুপ্রিয় আর একবারও ঘর ছেড়ে যায় হয়নি এমনকি লাঞ্চ খেতেও নয়। বোধহয় লোকটা অসুস্থ। না হলে অন্ত দ্বিপ্রাহরিক আহার করতে একবার বার হত। অথচ সে যে ঘরে আছে এ নিঃসন্দেহ। এ-ছাড়া আর একটা খবরও পাওয়া গেছে। আটত্রিশ নম্ব ঘরে দিন তিনেক আগে একজন ভদ্রমহিলা তাঁর অসুস্থ ভাইকে নিয়ে নামি উঠেছিলেন। হোটেল রেজিস্টার অনুযায়ী তাঁদের নাম মিস্টার এবং মিসে সিলভা—ভাই বোন। ভাইটি নাকি বিকৃতমস্তিষ্ক। ইন্টারেস্টিং কেস রাঁচি থেকে ভাইকে নিয়ে উনি এ হোটেলে উঠেছিলেন। আজ সকা ছয়টায় চলে গেছেন। পাগল ভাইকে নিয়ে এই কদিন একটা গাড়িতে বারে বারেই বার হতেন চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে। ভাইটা কেমন যেন জড়দ ঐ ধন্ধ-ধরা। চেঁচামেচি গণ্ডগোল করত না। দিবারাত্র পড়ে পড়ে ঘুমাতো প'খবরটা ওকে দিয়েছে রুম-সার্ভিসের বেহারা হরিমোহন। সে পাগলটাকে দেখেছে। দু-একবার তাকে ধরে গাড়ি পর্যন্ত পৌছেও দিয়ে এসেছে লোকটা ঘুমাতে ঘুমাতেই হাঁটত। চোখ খুলে বড় একটা তাকাতোই না এত খবর ও জানাচ্ছে এজন্য যে, মিসিং-লিঙ্ক মিস্ ডিক্রুজার সঙ্গে ঐ ডি সিল্‌ভার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে।

সন্ধ্যা ছয়টার সময় সে ফোন করে জানালো—পাশের ঘরের দুই-বাসিন্দা রওনা হলেন। সঙ্গে দুটো বেডিং, চারটে স্যুটকেস। দুটো স্যুটকে হোটেলের সেফ ডিপজিট লকার থেকে এইমাত্র ডেলিভারি নেওয়া হল সুপ্রিয়কে ও এক নজর মাত্র দেখেছে। লোকটা ঘর থেকে বেশ তাড়াহুড় করেই হঠাৎ বেরিয়ে এল। কৌশিকও ঘর ছেড়ে বের হয়ে এসেছিল কিন্তু ভাল করে তাকে সনাক্ত করার আগেই লোকটা গিয়ে বসল ট্যাক্সিতে তবু এক নজরে সে তাকে যা দেখেছে দরকার হলে সনাক্ত করতে পারবে লম্বা একহারা, রঙ ফর্সা। গোঁফ-দাড়ি কামানো, বড় বড় জুলফি। কৌশি টেলিফোনে জানালো যে, সে-ও রওনা হচ্ছে। হাওড়া স্টেশনের ফার্স্ট ক্লা ওয়েটিংরুমে গিয়ে সে ছদ্মবেশ পালটাবে।

সুজাতাও হাতব্যাগ নিয়ে রওনা হয়ে গেল সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ।

যথেষ্ট সময় থাকতে সুজাতা স্টেশানে পৌঁচেছে। ত্রি-আপ বোম্বাই-মেল নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকেই ছাড়ছে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে স্টেশনে ঢুকে সে র্ভেশান চার্টটা দেখল। 7852 বগীতে সি-চিহ্নিত ক্যুপে-কামরায় মিস্টার মিসেস দাসগুপ্তার আসন সংরক্ষিত। সুজাতা গট্‌গটিয়ে যেই কামরায় ত যাবে কণ্ডাকটার গার্ড রুখল : আপনার টিকিটটা প্লীজ ?

অত্যন্ত সপ্রতিভ-ভঙ্গিতে ও বললে, আমার নাম মিসেস অঞ্জলি দাসগুপ্তা। ট আমার স্বামীর কাছে আছে, উনি পিছনে আসছেন। আমাদের ট নম্বর হচ্ছে 3542 এবং 3543। দেখুন তো সি-কম্পার্টমেন্ট কি ?

কণ্ডাকটার-গার্ড তাঁর হাতে চার্ট দেখে বললেন, হ্যাঁ, সি-কম্পার্টমেন্ট। বসুন।

সুজাতা উঠল বগীতে। সি-কম্পার্টমেন্ট ছোট্ট ক্যুপে। দরজা বন্ধ ছিল। া খুলতেই দেখে ভিতরে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। একা। বছর চল্লিশ , স্যুট-পরা। ওকে দেখেই বললেন, মিসেস দাসগুপ্তা নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

—না, আমিও আপনাকে চিনি না। ক্যুপেটা মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস গুপ্তের নামে রিজার্ভ করা তো—

—ও! তা আপনার কোন্ কম্পার্টমেন্ট ?

—এখনও জানি না। আপনি ততক্ষণ আমার ব্যাগটা দেখুন, আমি াকটার গার্ডকে জিজ্ঞাসা করে আসি।—ব্যাগটা রেখেই নেমে গেলেন লোক। ব্যাগটা হচ্ছে BOAC-এর এয়ার ব্যাগ। সেটা রাখা ছিল ালার ধারে। জানালার কাচটা বন্ধ। সুজাতা ব্যাগটা সরিয়ে দিল ঞ্চর মাঝ বরাবর। জানালার ধারে গিয়ে বসল। কাচটা নামিয়ে দিল। তে দেখল সাতটা পনের হয়েছে।

ঠিক তখনই কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে এক ভদ্রলোক এসে হাজির। র ত্রিশেক বয়স। সুন্দর একহারা চেহারা। গোঁফ-দাড়ি কামানো। া জুলফি। নিঃসন্দেহে সুপ্রিয় দাসগুপ্ত। সুজাতাকে এক নজর দেখে য় বললেন, ঐ ব্যাগটা আপনার ?

সুজাতা বললে, না। ঐ ভদ্রলোক রেখে গেছেন।—হাত বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে ানো স্যুটপরা ভদ্রলোককে সে দেখিয়ে দেয়। ভদ্রলোক এক প্যাকেট গ্রট কিনছিলেন। আগন্তুক মুখ বাড়িয়ে ভদ্রলোককে একনজর দেখে লন। তারপর সুজাতার দিকে ফিরে বললেন, আপনার রিজার্ভেশান াথায় ?

—এই কুপেতেই। আপনার ?

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে বাক্সটা পেতে ফেলছেন। কুলি তার উপর বেডিংটা রাখছে। তার হাত থেকে মালপত্র নিয়ে ঘরটা সাজাতে সাজাতে ভদ্রলোক বললেন, আপনি ভুল করেছেন। কাণ্ডাকটার গার্ডকে টিকিটটা দেখান, উনি আপনার কামরা দেখিয়ে দেবেন।

—উনিই আমার টিকিট দেখে বললেন, এই কুপে।

কুলি পয়সা চাইল। ভদ্রলোক সে-কথা কানে তুললেন না। সুজাতাকে বলেন, কই দেখি আপনার টিকিট ?

—আপনাকে টিকিট দেখাতে যাব কোন্ দুঃখে ?

এই সময় দ্বার পথে এসে দাঁড়লেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সুজাতার বুঝতে অসুবিধা হল না,—উনি জীবন বিশ্বাস। ঝোলা গোঁফেই তাঁর পরিচয়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, কি হল স্যার ?

—কণ্ডাকটার গার্ডকে ডাকুন তো। এ ভদ্রমহিলা অহেতুক ঝামেলা করছেন।

জীবনবাবুও বৃত্তান্তটা শুনে সুজাতাকে বোঝাতে চাইলেন সে ভুল করছে। সুজাতা কোন পাত্তাই দিল না। অগত্যা ওঁরা ডেকে নিয়ে এলেন কণ্ডাকটার গার্ডকে।

—কি হল আবার আপনাদের ?—দ্বারপথে এসে দাঁড়ায় কণ্ডাকটার গার্ড।

সুপ্রিয় বললে, এ ভদ্রমহিলার কোন্ ঘরে রিজার্ভেশান আছে দেখে দিন তো ?

—কই দিন তো আপনার টিকিট ?—কণ্ডাকটার গার্ড হাত বাড়ায়।

—বললাম না তখন, আমি মিসেস দাসগুপ্তা ? টিকিট আমার স্বামীর কাছে আছে। আমাদের টিকিট নম্বর 3542 এবং 3543।

কণ্ডাকটার গার্ড আবার তার চার্ট মেলাতে থাকে। সুপ্রিয় বাধা দিয়ে বলে, ওটা দেখতে হবে না। এই দেখুন, টিকিট নম্বর 3542 এবং 3543।

কণ্ডাকটার গার্ড ফ্যালফ্যাল করে দুজনের দিকে তাকায়।

—এঁকে নামিয়ে দিন !—কঠিন কণ্ঠে সুপ্রিয় বলে।

—আপনি কাইণ্ডলি নেমে আসুন—কণ্ডাকটার গার্ড সুজাতাকে অনুরোধ করে।

—ইয়ার্কি নাকি! আগে আমার স্বামী আসুন, তার আগে আমি নামব না।

—কী আশ্চর্য! আপনার কাছে টিকিট নেই—

—কে বলল টিকিট নেই? টিকিট আমার স্বামীর কাছে আছে। উনি আসুন আগে—

—আমিও তো তাই বলছি, তিনি যতক্ষণ না আসেন—

—বাধা দিয়ে সুজাতা বলে, বেশ তো, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না, মিসেস দাসগুপ্তা কোথায়? ঐ গুঁপো ভদ্রলোক কি মিসেস দাসগুপ্তা? ওঁর স্ত্রী কোথায়?

জীবনবাবু স্থট করে সরে পড়েন।

কণ্ডাকটার গার্ড-এর মনে হল সশরীরে টিকিটধারী ভদ্রলোকের স্ত্রীকে হাজির করতে পারলে হয়তো সমস্যার সুরাহা হবে। সুপ্রিয়কে বলে, ইয়েস, আপনার স্ত্রী কই?

—উনি এখনই আসবেন। টয়লেটে গেছেন।

সুজাতাও গম্ভীর হয়ে বলে, আমার কর্তাও এখনই আসবেন। টয়লেটে গেছেন।

ভীড়ের মধ্যে একজন যাত্রী কণ্ডাকটার গার্ডকে বলে, সাতটা পঁচিশ হয়ে গেছে স্যার! জি. আর. পি.-কে ডাকুন। না হলে ট্রেন ছাড়তে দেরী হয়ে যাবে।

সুজাতা মুখ তুলে দেখল বক্তা আর কেউ নয়, কৌশিক মিত্র। ইতিমধ্যে বেশ ভীড় জমে গেছে। একজন পুলিস অফিসার মুখ বাড়িয়ে বলেন, এনি ট্রাব্‌ল্‌?

ইন্সপেক্টরের আবির্ভাবমাত্র অবস্থাটা পালটে গেল। প্রথমেই তিনি ভিড়টা হটিয়ে দিলেন—প্লীজ ক্লিয়ার আউট! ট্রেন এখনই ছাড়বে। যে-যার সীটে গিয়ে বসুন।

তারপর ঘরে ঢুকে তিনি কণ্ডাকটার গার্ডের কাছে ব্যাপারটা সংক্ষেপে শুনে সুজাতার বিরুদ্ধেই রায় দিলেন। বললেন, আপনি নেবে আসুন। বোনাফাইড টিকেট-হোল্ডারকে সীট ছেড়ে দিন।

সুজাতা বোঝে আর দেরী করা ঠিক নয়। উঠে দাঁড়ায় সে। লেডিজ হাতব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। পুলিশ অফিসার BOAC মার্কা ব্যাগের পেটটা চেপে ধরে নেমে আসেন। সুজাতা বলে, ও ব্যাগটা আমার নয়।

—আই সী! আপনার?—পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করে সুপ্রিয়কে।

—হুঁ!—গম্ভীরভাবে সুপ্রিয় বলে, অন্য দিকে তাকিয়ে।

পুলিস অফিসার ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে কি ভেবে থেমে পড়েন। বলেন, কি আছে ব্যাগটায়? খুলুন তো?

সুপ্রিয় রুখে ওঠে, কেন বলুন তো ?

ইন্‌সপেক্টার মুখ তুলে একবার তাকায় তার দিকে। তারপর কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে খোলা ব্যাগের জিপটা টেনে ফেলে। হাত ঢুকিয়ে কী যেন স্পর্শ করে। পুনরায় বলে, ব্যাগটা আপনার ?

সুপ্রিয় খিঁচিয়ে ওঠে, বলছি তো, না! কেন, কি হয়েছে ?

ইন্‌সপেক্টার কণ্ডাকটার গার্ডকে বলে, কুইক! গার্ডকে বলুন, গাড়ি যেন না ছাড়ে। সামথিং ফিশি! আমার নাম করে বলুন।

সুপ্রিয়র মুখটা সাদা হয়ে যায়। কৌশিক এবং ঝোলা গোঁফ না-পাত্তা। সুজাতা তখনও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ডাকটার গার্ড ছুটে বেরিয়ে গেল। ইন্‌সপেক্টার সুজাতা এবং সুপ্রিয় দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে বললে, এই ব্যাগটা কার ? আইদার অফ য়ু! বলুন, কার ?

সুজাতা বললে, আমার নয়। আমি জানি না কার।

সুপ্রিয় বললে, আমি যখন ঘরে ঢুকি তখন ব্যাগটা এখানেই ছিল। উনি তখন ঘরে একা ছিলেন। ফলে ব্যাগটা ওঁর!

ইন্‌সপেক্টার ধমক দিয়ে ওঠে। তাহলে তখন কেন বললেন ব্যাগটা আপনার ?

—আমি সে কথা বলিনি।—সুপ্রিয় জবাবে জানায়।

—বলেছেন! উনি যখন বললেন ব্যাগটা ওঁর নয়। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনার ?' আপনি বললেন, 'হুঁ।' বলেন নি ?

—আমি তখন অন্যদিকে তাকিয়েছিলাম। দেখিনি, আপনি কোন্ ব্যাগটার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। কেন, কি হয়েছে ?

ইন্‌সপেক্টার ওদের দু'জনকে ভালভাবে দেখে নিল একবার। সুজাতাকে বললে, আপনার নাম অঞ্জলি দাসগুপ্তা ? ঠিকানা ?

সুজাতা অম্লানবদনে বললে, না, আমার নাম সুজাতা মিত্র।

—সুজাতা মিত্র! গুড গড! তাহলে এতক্ষণ মিথ্যা কথা বলেছিলেন কেন ?

—আমি বলব না!

—আই মে হ্যাভ টু এ্যারেস্ট য়ু!—হাত বাড়িয়ে ইন্‌সপেক্টার দরজাটা বন্ধ করে দেয়। বলে, এ ব্যাগের ভিতর কি আছে জানেন ?

হাত ঢুকিয়ে সে বার করে একটা লোডেড রিভলভার!

—কেন এতক্ষণ নিজেকে অঞ্জলি দাসগুপ্তা বলে চালাচ্ছিলেন ? বলুন ! জবাব দিন ?

সুজাতা একটুও ঘাবড়ায় না। তার লেডিজ হ্যাণ্ড-ব্যাগের ক্লিপটা খুলে ফেলে। একটা ছোট্ট আইডেন্টিটি কার্ড বার করে ইন্সপেক্টারের হাতে দিয়ে বলে, আই রিপ্রেজেন্ট 'সুকৌশলী'! আমার ক্লায়েন্টের স্বার্থে মিথ্যা কথা বলছিলাম। আমি জানতাম, এই কামরায় আজ একটা বিশ্রি কাণ্ড হতে যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টার স্তম্ভিত হয়ে যায়। আইডেন্টিটি কার্ডটা পরীক্ষা করে বলে, 'সুকৌশলী!' এমন প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফার্ম কলকাতা শহরে আছে বলে আমি জানতামই না!

—লালবাজারের সীলটা নিশ্চয় চিনবেন?

কার্ডটা পকেটে রেখে ইন্সপেক্টর সুপ্রিয়র দিকে ফেরে। বলে, আপনার নাম মিস্টার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত তা প্রমাণ করতে পারেন?

—নিশ্চয়ই। স্যুটকেশে আমার লেটার-হেড প্যাড আছে। ভিজিটিং কার্ড আছে।

—স্যুটকেশটা খুলুন!

—তার কি কোন প্রয়োজন আছে? অলরেডি পাঁচমিনিট লেট হয়ে গেছে ট্রেনটা ছাড়তে!

—আই সে ওপন ইয়োর স্যুটকেশ।

সুপ্রিয় রুমাল দিয়ে মুখটা মুছল। তারপর বেঞ্চির নিচ থেকে টেনে বার করল স্যুটকেশটা। চাবি দিয়ে স্যুটকেশের ডালাটা খুলল। ওর হাত রীতিমত কাঁপছে। অতি সন্তর্পণে সে জামা-কাপড়ের নিচে হাত চালিয়ে লেটার হেড প্যাডটা খুঁজতে থাকে। স্যুটকেশের উপর চাপা দেওয়া ছিল একটা নতুন তোয়ালে। হঠাৎ ক্ষিপ্র হাতে ইন্সপেক্টার তুলে ফেলল সেই তোয়ালেটা।

তার নিচে থাক দেওয়া দশটাকার নোট! এক স্যুটকেশ বোঝাই!

—মাই গড! কত টাকা আছে ওখানে?

একটা ঢোক গিলে সুপ্রিয় বললে, এক লাখ টাকা।

—সব দশ টাকায়?

—হুঁ!

—বাক্সটা বন্ধ করুন!

আদেশ পালন করে সুপ্রিয়।

ইন্সপেক্টার সুজাতার দিকে ফিরে বললে, আপনি জানতেন, উনি একলাখ টাকা নগদে এবং দশটাকার নোটে নিয়ে যাচ্ছেন?

—না! আমার ইনফর্মেশান ছিল উনি দু-লাখ টাকা নগদে এবং দশটাকার নোটে নিয়ে যাচ্ছেন!

—আই সী!—ইন্সপেক্টার ঘুরে দাঁড়ায় সুপ্রিয়র মুখোমুখি, এ টাকা কোন ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছেন?

—ব্যাঙ্ক থেকে তুলিনি।

—ব্ল্যাক-মানি?

সুপ্রিয় মাথা নাড়ে—নেতিবাচক।

—মিস্টার দাসগুপ্ত, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন যে, নগদ এক লাখ টাকা আপনি দশটাকার নোটে নিয়ে যাচ্ছেন—উইথ এ লোডেড রিভলভার—

—ওটা আমার নয়।

—আয়াম সরি! য়ু আর আণ্ডার এ্যারেস্ট! নেমে আসুন আপনি!

আবার রুখে ওঠে সুপ্রিয়, আপনি—আপনি এভাবে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না! আমি বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার! আমি হিউজ কম্পেন্সেশন ক্লেম করব।

—করবেন! তার আগে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে ওটা ব্ল্যাকমানি নয়। নেমে আসুন আপনি! না হলে কিন্তু আমি আপনাকে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে মাজায় দড়ি বেঁধে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নিয়ে যাব!

কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল সুপ্রিয়। পাশের কেবিন থেকে জীবন বিশ্বাস। সুজাতা মুখ তুলে দেখল, কৌশিকও নেমে পড়েছে ট্রেন থেকে। অগত্যা সেও নামল।

দশ মিনিট দেরীতে অনুমতি পেয়ে গুড্‌ফ্রাইডের সন্ধ্যায় রওনা হল বোম্বাই মেল। তার চার-চারটে ফার্স্ট ক্লাস বার্থ খালি!

চার

শনিবার তের তারিখ সন্ধ্যায় জীবন বিশ্বাস এসে হাজির হল বাসু সাহেবের চেম্বারে। একদিনেই লোকটা যেন অর্ধেক হয়ে গেছে। ভেঙে পড়ল সে একেবারে, হুজুর এবার বাঁচান আমাদের!

—কি হল আবার? আপনার না গতকাল বোম্বাই চলে যাবার কথা?

—তাই তো কথা ছিল স্যার। ট্রেন ছাড়ার আগেই নেমে পড়তে হল আমাকে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। বলি শুনুন:

জীবন বিশ্বাস বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন ঘটনাটার। হোটেল থেকে যথা-সময়ে ওঁরা স্টেশানে এসেছিলেন। কথা ছিল, মিস্টার দাসগুপ্ত কুপেতে একা থাকবেন ট্রেন ছাড়ার সময়; এবং ট্রেন চলতে শুরু করলে পাশের কামরা থেকে জীবনবাবু এসে ওটাতে রাত্রে শোবেন। কিন্তু ঝামেলা বাধালেন এক ভদ্রমহিলা। জীবন তাঁকে চেনেন না, তিনি নাকি আগে ভাগেই ঐ কুপের একটা সীট দখল করে বসেছিলেন। বললেন, তাঁর নাম মিসেস্ অঞ্জলি দাসগুপ্তা। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার সেই ভদ্রমহিলা ওদের টিকিটের নম্বর দুটোও কি করে জানি সংগ্রহ করেছিলেন।

বাসু-সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, সে আর শক্ত কি? ফার্স্ট-ক্লাস রিজার্ভেশান চার্টেই তো নামের পাশে টিকিট নম্বর লেখা থাকে।

—তবে তাই হবে স্যার; কিন্তু ভদ্রমহিলা ব্যাগে করে একটা লোডেড রিভলভার নিয়ে এসেছিলেন—

আনুপূর্বিক ঘটনার একটা বর্ণনা দাখিল করলেন জীবনবাবু। শোনা গেল, সুপ্রিয় দাসগুপ্ত জামিন পায়নি। তার বিরুদ্ধে পুলিশ নাকি হত্যার অভিযোগ আনছে।

—মার্ডার কেস? খুন হল কে আবার? কখন?

জীবনবাবু তখন বিস্তারিত জানালেন সেই পূর্ব ইতিহাস। তিনি থানা থেকে মোটামুটি জেনে এসেছেন।

এগারই তারিখ, বৃহস্পতিবার রাত পৌনে আটটার সময় বড় বাজারে নিজের গদিতে খুন হয়েছেন একজন ধনী ব্যবসায়ী—এম. পি. জৈন। আটটায় দোকান বন্ধ হয়। ওঁরা ঝাঁপ ফেলার উদ্যোগ করছেন এমন সময় তিন চারজন মুখোশধারী লোক হঠাৎ ঢুকে পড়ে দোকানে। তাদের একজনের হাতে ছিল রিভলভার আর সকলের ছোরা। গেটে ছিল দারোয়ান; সে বাধা দেবার চেষ্টা করায় প্রথমেই গুলিবিদ্ধ হয়ে উল্টে পড়ে। ডাকাতেরা দোকানে ঢুকে পড়ে। কেশিয়ারের কাছে চাবি চায়। কেশিয়ার ইতস্তত করে। তখন একজন ডাকাত তার কপালে রিভলভার উদ্যত করে ধরে। বাধ্য হয়ে কেশিয়ার চাবির থোকাটা বার করে দেয়।

মালিক এম. পি. জৈনের একটা নিজস্ব রিভলভার ছিল তাঁর ড্রয়ারে। ডাকাতগুলো আয়রণ সেফ খুলে নোট বার করতে ব্যস্ত আছে দেখে তিনি চট করে টানা ড্রয়ারটা খুলে রিভলভার বার করে ফায়ার করেন। কেউই তাতে গুলিবিদ্ধ হয় না। অপর পক্ষে ডাকাতদের একজন তখন মিস্টার জৈনকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারে। জৈন উল্টে পড়ে যান। তাঁর হাত থেকে রিভলভারটা

ছিটকে পড়ে। তখন আর একজন ডাকাত সেই রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়েই জৈনকে গুলি করে। তিন চার মিনিটের ব্যাপার। ওরা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একটা কালো এ্যাম্বাসাডার চেপে উধাও হয়ে যায়। তখন লোকজন ছুটে আসে। দেখা যায় এম. পি. জৈন মৃত। দারোয়ানটার আঘাত মারাত্মক নয়। ডাকাতেরা নগদে প্রায় যাট হাজার টাকা নিয়ে যায়, এবং মৃত এম. পি. জৈনের রিভলভারটাও নিয়ে যায়!

এখন নম্বর মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে গতকাল বোম্বাই মেলের ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় ঐ BOAC মার্কা ব্যাগের ভিতর যে রিভলভারটা পাওয়া গেছে সেটা জৈনসাহেবের রিভলভার।

সুপ্রিয়র বিরুদ্ধে তাই চার্জ হচ্ছে, ডাকাতি আর খুনের।

বাসু-সাহেব সমস্ত শুনে বললেন, কেসটা খারাপ। কাল রাত্রে ঐ পুলিস ইন্সপেক্টার যখন জিজ্ঞাসা করেছিল—'ব্যাগটা আপনার'? তখন সুপ্রিয় কেন বলেছিল, 'হুঁ'?

—ও অন্যমনস্ক হয়ে বলেছিল স্যার। বুঝতে পারেনি কোন্ ব্যাগটার কথা হচ্ছে।

—আপনাকেও তাই বলল?

—তার দেখা পেলাম কোথায় স্যার? হাজতে আমাকে যেতেই দিল না। বললে, একমাত্র ওর উকিল ছাড়া আর কারও সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেবে না। এখন আপনি যদি ওর কেসটা হাতে নেন স্যার!

একটু ভেবে নিয়ে বাসু-সাহেব বললেন, নেব, কিন্তু এবার আর মৌফতসে নয়।

—নিশ্চয় নয় স্যার, নিশ্চয় নয়—বলুন এবার কত দিতে হবে?

—আমার মোট ফি হবে দশহাজার টাকা, তার অগ্রিম পাঁচ হাজার এখনই দিতে হবে!

—দ-শ হা-জা-র টাকা! কী বলছেন স্যার?

গম্ভীর হয়ে বাসু বললেন, জীবনবাবু, ফি নিয়ে দরাদরি আমি করি না। কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ক্রিমিনাল ল-ইয়ার অনেকে আছেন এ-শহরে। অনেক কমেও হয়তো অনেকে রাজী হয়ে যাবেন। চেষ্টা করে দেখুন।

—না স্যার। আমিও বাজার যাচাই করতে যাব না। বেশ, ঐ দশ হাজারই দেব। টাকা তো আমার নয়, কোম্পানির! তবে স্যার আপনাকে আর একটা কাজও করে দিতে হবে। মামলায় যেন ঐ ব্ল্যাক-মানির প্রসঙ্গটা না ওঠে!

—সেটা অসম্ভব। এক লাখটাকা দশ টাকার নোটে ওর ব্যাগে কেন এল একথা উঠবেই। ভাল কথা, বাকি এক লাখ কি আপনার কাছে ছিল?

—হ্যাঁ স্যার। সেটা আবার ঐ হোটেলের ভল্টেই রেখেছি।

—পার্ক-হোটেলেই উঠেছেন কেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। অত টাকা নিয়ে আর কোথায় উঠব? এবার রুম নম্বর 78।

—আর একটা কথা। ঠিক খুনের সময়, অর্থাৎ এগারো তারিখ রাত পৌনে আটটায় আপনি আর মিস্টার দাসগুপ্ত কে কোথায় ছিলেন?

—দুজনেই মোকাম্বো রেস্তোঁরাতে খাচ্ছিলাম স্যার!

—মোকাম্বো! কেন পার্ক-হোটেলের খানা কি পছন্দ হচ্ছিল না?

—কী যে বলেন স্যার? আমি ছাঁ-পোষা গরীব মানুষ—ওসব খাবার কি চোখে দেখেছি কখনও? এগারো তারিখ রাতে আমাদের নিমন্ত্রণ করে মোকাম্বোতে খাইয়েছিলেন ঐ রঘুপতি সিঙ্ঘানিয়া সাহেবের বড় ছেলে যদুপতিজী।

—ওঁরা কে?

—আজ্ঞে বড়কর্তার বাড়িটা রঘুপতিজী তাঁর বড় ছেলের নামে কিনলেন। ঐ এগারো তারিখের দুপুরেই রেজিস্ট্রি হল কিনা, তা আমি বললাম যদুপতিজী, অতবড় সম্পত্তি কিনলেন, আমাদের মিষ্টিমুখ করাবেন না? উনি তৎক্ষণাৎ আমাদের মোকাম্বোতে নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা সন্ধ্যা সাতটায় ঐ রেস্তোঁরাতে যাই এবং রাত সাড়ে নয়টায় বার হয়ে আসি। আমরা তিনজনেই খেয়েছিলাম।

—তিনজন বলতে আপনি, সুপ্রিয় এবং ঐ যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার!

—তাহলে কেসটা অনেক সরল। যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া একজন নামকরা ধনী নিশ্চয়—

—নিশ্চয়, নিশ্চয়—বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম-ট্যাক্স দেন!

—তাঁর সাক্ষীটা জোরালো হবে। ঠিক আছে, আমি এ-কেস নেব। রিটেনারটা দিয়ে যান।

—রিটেনার কি স্যার?

—অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকা।

কেশিয়ার জীবনবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মাজার কষি আলগা করে একটা কোমরবন্ধ বার করে আনেন। পাঁচ থাক নোটের বাণ্ডিল নামিয়ে

রাখেন টেবিলে। বাসু-সাহেব টেলিফোনে রানী দেবীকে ডাকলেন। অল্প পরেই হুইলড্‌-চেয়ারে মিসেস্ বাসু এসে উপস্থিত হলেন ওঁর ঘরে। বাসু বললেন, এঁকে একটা পাঁচ হাজার টাকার রসিদ লিখে দাও। রসিদটা হবে মিস্টার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত, ম্যানেজার, কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির নামে।

জীবন বিশ্বাস চমকে উঠে বললে, কেন স্যার? টাকা দিচ্ছি আমি, রসিদ কেন ম্যানেজারের নামে হবে?

—কারণ সুপ্রিয় দাসগুপ্তই আমার ক্লায়েন্ট। আপনি নন।

জীবন বিশ্বাস ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, তার মানে কি এটাই ধরে নেব স্যার, যে আপনি ইঙ্গিত করতে চাইছেন আপনার ক্লায়েন্টের স্বার্থে আপনি আমারও বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেন?

—না। ইঙ্গিত করছি না। স্পষ্টাক্ষরে সে-কথা জানাচ্ছি। টাকা আপনি টেবিলে রেখেছেন। আমি তা নিইনি এখনও। ঐ সর্তেই আমি কাজটা হাতে নেব।

জীবন বিশ্বাস গোঁজ হয়ে বসে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বললেন, ঠিক আছে, রাখলেও আপনি, মারলেও আপনি—

রানী দেবী বললেন, আসুন আপনি। রসিদটা নিয়ে যাবেন।

পরদিন রবিবার। সকালবেলা প্রাতরাশের টেবিলে বসেছিলেন বাসু-সাহেব সুজাতা আর রানী দেবী। কৌশিক অনুপস্থিত। সুজাতাই এখন রান্নাঘরের হেপাজতে। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন রানী দেবী। তার চেয়েও বড় কথা নিঃসঙ্গতাটার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। অনেক—অনেকদিন পরে বাড়িটা কলমুখর হয়ে উঠেছে।

সুজাতা প্রশ্ন করে, আপনার ক্লায়েন্ট কী বলল শেষ পর্যন্ত?

বাসু-সাহেব শনিবার বিকালেই হাজতে গিয়ে দেখা করেছিলেন সুপ্রিয়র সঙ্গে। জামিন দেওয়া হয়নি তাকে। কথাবার্তা বলে বাসু-সাহেবের মনে হয়েছে খুনের মামলায় সে বেচারি বেমক্কা জড়িয়ে পড়েছে। সুপ্রিয় দাসগুপ্ত বোম্বাইয়ের একটা নামকরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। বিবাহিত। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া সে কলকাতার সমাজের খবর বড় একটা রাখে না। প্রবাসী বাঙালী। তার পক্ষে সাতদিনের জন্য কলকাতায় এসে ডাকাতির দলে ভীড়ে পড়া একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যে ব্যাগটার মধ্যে রিভলভারটা পাওয়া গেছে ওটা সুপ্রিয় সঙ্গে করে আনেনি। সুজাতা নিজেই

স্তার সাক্ষী। সুজাতা ডিফেন্স-এর তরফে সাক্ষী দিলে সুপ্রিয়র ঐ অন্যমনস্ক-ভাবে 'হুঁ' বলার অপরাধটা গুরুত্ব পাবে না। তাছাড়া সুপ্রিয়র অকাট্য অ্যালিবাই আছে। দু দুজন সাক্ষীর সঙ্গে সে মোকাম্বোতে নৈশ-আহার করছিল ঠিক যে-সময়ে বড়বাজারে খুনটা সংঘটিত হয়। দু-জন সাক্ষীর একজন অবশ্য ওরই অধীনস্থ কর্মচারী—কিন্তু দ্বিতীয়জন বিশিষ্ট নাগরিক।

রানী দেবী বলেন, তাহলে কাল থেকে এত কি ভাবছ তুমি?

—ভাবছি? হ্যাঁ ভাবছি অন্যদিক থেকে। দুটো কথা আমি ভাবছি। প্রথমত, ঐ মিস ডিক্রুজার ব্যাপারটা। মিস ডিক্রুজা নামটা তোমার মনে আছে সুজাতা?

—আছে। দার্জিলিঙ-এর খুনের কেসটার প্রসঙ্গে এক মিস্ ডিক্রুজাকে আমরা খুঁজছিলাম; কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—কারেক্ট। কিন্তু এটুকু বোঝা গিয়েছিল মেয়েটা নষ্ট-স্বভাবের।

রানী দেবী বলেন, কিন্তু মিস্ ডিক্রুজা নামে কলকাতায় কি একটিই মেয়ে আছে?

—না নেই। কিন্তু ঐ নামটা আমাকে কেমন যেন ভাবিয়ে তুলছে।

—আর আপনার দ্বিতীয় চিন্তার কারণ?

—মাইতি হঠাৎ এত উৎফুল্ল হয়ে উঠল কেন?

মিসেস বাসু বলেন, মাইতিটা কে?

বাসু-সাহেব বুঝিয়ে বলেন, নিরঞ্জন মাইতি হচ্ছেন পাবলিক প্রসিকিউটার। অর্থাৎ কোর্টে যখন কেস উঠবে তখন নিরঞ্জন মাইতি ওঁর বিরুদ্ধে সওয়াল করবেন, সরকার পক্ষে। মাইতি নাকি গতকাল বার-এ্যাসোসিয়েশানের আড্ডায় বলেছেন, বাসু-সাহেব কেন যে এই বুড়ো বয়সে তাঁর নিজের রেকর্ডটা ভাঙতে এলেন! বেচারি!

সুজাতা বলে, নিজের রেকর্ডটা ভাঙতে মানে?

বাসু জবাব দিলেন না। জোড়া পোচের প্লেটটা টেনে নিলেন।

রানী বললেন, উনি আজ পর্যন্ত কোনও কেসে হারেননি। মানে, মার্ডার কেসে!

সুজাতা প্রশ্ন করে, সত্যি কথা বাসু-মামা?

শ্রাগ করে ব্যারিস্টার বাসু বলেন, এ ফ্যাক্ট কান্ট বি ডিনায়েড! হ্যাঁ, ঘটনাচক্রে কোনও মার্ডার কেসেই আমি কখনও হারিনি সুজাতা। তাই আমি শুধু ভাবছি, মাইতি ও কথা বলল কেন? সে নিশ্চয় এমন কিছু প্রমাণ পেয়েছে, এমন সাক্ষীর খোঁজ পেয়েছে যাতে কোর্টে আমাকে, হঠাৎ চমকে

নেবে ! সেটা কেন্দ্ৰী, তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না ! বাট হি মাস্ট বি হ্যাভিং সামথিং আপ হিজ স্লিভস্ !

মিসেস বাসু প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্ম বললেন, কৌশিককে কোথায় পাঠালে ?

—রাঁচি।

—রাঁচিতে ? কেন ?

বাসু-সাহেব দাখিল করেন তাঁর যুক্তি। পার্ক-হোটেলের আটত্রিশ নম্বর ঘরের ঐ ভদ্রমহিলা আসলে কে, সেটা তাঁকে জানতে হবে। ঐ মেয়েটার সম্বন্ধে দুজনে দু-রকম কথা কেন বলছে।

—'দুজনে দু-রকম কথা' মানে ?

—জীবন বিশ্বাস বলেছে পাশের কামরায় ডি-সিল্‌ভাকে সে দেখেছে এবং ঐ মেয়েটির সঙ্গে সে সুপ্রিয়কে কথা বলতেও দেখেছে। অথচ সুপ্রিয় সরাসরি অস্বীকার করছে। পাশের ঘরের ঐ মেয়েটির অস্তিত্বই না কি সে জানে না।

—কেসটা কবে কোর্টে উঠবে ?

—চার্জ ফ্রেম করা হয়ে গেছে। প্রাথমিক শুনানিও। কেস উঠবে বৃহস্পতিবার।

—এত তাড়াতাড়ি আপনি তৈরী হতে পারবেন ?

—তৈরী আমাকে হতেই হবে সুজাতা। আমার মক্কেল জামিন পায়নি !

সোমবার সকালে বাসু-সাহেবের জুনিয়ার প্রদ্যোৎ নাথ এসে জানালো—জীবন বিশ্বাসকে সমন করা হয়েছে স্যার ; কিন্তু তার আগেই ওকে থানা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে সে একটা এজাহার দিয়ে এসেছে—

—তাই নাকি ? তা এজাহারে কি বলেছে সে ?

—আমাদের কাছে যা বলেছে সেই সব কথাই। তবে ব্ল্যাক-মানির কথা স্বীকার করেনি।

—অ্যালিবাই-এর কথা ?

—তা বলেছে। জীবনবাবু বললেন, থানা অফিসার ঐ মোকাম্বোর ব্যাপারে খুব বিস্তারিত প্রশ্ন করেছে। কখন ওঁরা আসেন, কখন যান—মায় কে কোন্ আইটেম খেয়েছেন তাও।

—সব কথাই সে সত্যি বলেছে তো ?

—তাইতো বললেন আমাকে।

—আর যদুপতি সিন্ধানিয়া ? তাকে সমন ধরানো হয়েছে তো ?

—না স্যার। তিনি বাড়ি ছেড়ে একেবারে নিরুদ্দেশ।

—নিরুদ্দেশ! মানে? কেউ জানে না তিনি কোথায়?

—আজ্ঞে না। আমার মনে হয় পাছে আদালতে ঐ দু-লাখ টাকা ব্ল্যাক-মানির প্রসঙ্গটা উঠে পড়ে, তাই তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন।

বাসু-সাহেব বলেন, তবে তো কেসটা আবার কাঁচিয়ে গেল!

রাত্রের ট্রেনে কৌশিক ফিরে এল। রাঁচি থেকে সে জেনে এসেছে—মিস্টার ডি. সিল্‌ভাকে সত্যিই আট তারিখে ওখানকার মানসিক হাসপাতাল থেকে মুক্ত করা হয়। তাকে নিয়ে যায় তারই দিদি মিস্ ডি. সিল্‌ভা। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ মেয়েটির যে বর্ণনা দিয়েছেন, পার্ক-হোটেলের বেহারা হরিমোহনও তাই দিয়েছে। সুতরাং ওখানে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

—কিন্তু তাহলে সুপ্রিয় কেন তার অস্তিত্বটাই অস্বীকার করছে?

সন্ধ্যাবেলা গাড়িটা বার করে বাসু-সাহেব কৌশিককে নিয়ে চলে গেলেন চৌরঙ্গী অঞ্চলে। প্রথমে মোকাম্বো। সেখানে কিছুই সুবিধা হল না। না ওদের ম্যানেজার, না কোনও বেহারা—কেউই ধনকুবের যদুপতি সিঙ্ঘানিয়াকে চেনে না। সেটাই স্বাভাবিক। এমন কত লক্ষপতি আছে কলকাতা শহরে যারা নিত্য মোকাম্বোতে এসে সান্ধ্য আসর জমায়—খাদ্যে আর পানীয়ে।

দ্বিতীয়ত পার্ক-হোটেল। এখানে হরিমোহন বরং কিছু খবর দিতে পারল। হ্যাঁ, আটত্রিশ নম্বরের সেই মেম-সাহেবকে তার মনে আছে; তার পাগল ভাইকেও। না, সে চেঁচামেচি কিছু করত না। কেমন যেন জড়বুদ্ধি, ধন্ধধরা মানুষ। সবসময় গোঁজ হয়ে বসে থাকত একটা চেয়ারে। মেমসাহেব তাকে নিয়ে দিবারাত্র একটা গাড়িতে করে ঘুরত। তার চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্যই হবে হয়তো। কবে তারা চলে যায়?—বারো তারিখ সকালে। ঠিক কখন তা সে জানে না। তখন সে ওখানে ছিল না। দারোয়ান বলতে পারে।

দারোয়ানকেও প্রশ্ন করা হল। তারও মনে আছে ওদের প্রস্থান পর্বটা। সে ঐ মেমসাহেব বা সাহেবকে আগে দেখেনি। তবে মনে আছে এজন্য যে, সাহেবটাকে প্রায় ধরাধরি করে এনে গাড়িতে তোলা হয়েছিল। তখন দারোয়ান ভেবেছিল সাহেবটা মাতোয়ারা। পরে শুনেছে—না, সে পাগল।

—আর কিছু মনে পড়ছে না তোমার?

নগদ পাঁচ টাকা বকশিশ পেয়েছে দারোয়ান। অনেক চিন্তা করে বলল, আরও একটা কথা মনে পড়েছে স্যার। ঠিক রওনা হবার আগে ড্রাইভার মেমসাহেবকে বলেছিল, জি. টি. রোড খারাপ আছে। আমরা দিল্লি রোড হয়ে যাই বরং।

—ট্যাক্সি না প্রাইভেট গাড়ি ?

—না সা'ব, প্রাইভেট গাড়ি।

বাসু-সাহেব মানি ব্যাগ খুলে আরও পাঁচটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন, থ্যাঙ্কু!

গাড়িতে স্টার্ট দিলেন উনি। কৌশিক বললে, ব্যাপার কি ? আপনি যে আজ দাতাকর্ণ!

বাসু রোষ-কষায়িত নেত্রে একবার তাকালেন কৌশিকের দিকে। কোন কথা বললেন না। বাড়িতে ফিরে এসেও নয়। সোজা ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে। ঘণ্টা-খানেক চুপচাপ বসে বাইরে গেলেন। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, সুজাতা ছটো ট্রাঙ্ককল বুক কর। একটা বোম্বাই। লাইটনিং কল। নম্বর এই নাও। পি. পি. মিস্টার সি. বরুয়া। দ্বিতীয়টা বর্ধমানের সদর থানার, ও. সি.। ওটাও পি. পি. এবং লাইটনিং। নাম নৃপেন ঘোষাল। নম্বরটা 183 ডায়াল করে জেনে নাও।

সুজাতা ওঁর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কোন প্রশ্ন করল না। এগিয়ে গেল টেলিফোনটার দিকে।

ছটি লাইনই পাওয়া গেল অল্পকালের মধ্যে। প্রথমে এল বর্ধমান।

রিসিভারটা তুলে বাসু-সাহেব বললেন, কে নৃপেন ? আমি পি. কে. বাসু ; চিনতে পারছ ?···হ্যাঁ, একটা উপকার করতে হবে। খোঁজ নিয়ে জানাও তো, যে, শুক্রবার বারো তারিখে বর্ধমানে সাম মিস্টার ডি. সিল্‌ভা এবং মিসেস্ ডি. সিল্‌ভা কোথায় উঠেছেন।···না, না একটু শোন ডিটেলস্‌টা। মিস্টার সিল্‌ভার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, লম্বা এক হারা। বিকৃতমস্তিষ্ক...ইয়েস, ম্যাড! তার দিদি তাকে একটা কালো এ্যাম্বাসাডারে নিয়ে যায় বারো তারিখ, বেলা আটটায়। তার মানে এগারোটা নাগাদ ওরা বর্ধমানে পৌঁচেছে। চেক অল্ দ্য হোটেলস্, রেস্ট হাউসেস্, অ্যাণ্ড য়ু নো বেটার হোয়্যার। ভাড়া বাড়িতেও উঠতে পারে। কালো রঙের এ্যাম্বাসাডারটাকে স্পট করার চেষ্টা কর বরং।
··কী ? না! বর্ধমান ছেড়ে যায়নি। গেলেও কাছে পিঠে কোনখানে আছে।···ইয়েস! খবর পেলেই আমাকে জানাবে। থ্যাঙ্কু!

নৃপেন ঘোষাল একটি বদলি সংক্রান্ত ব্যাপারে বাসু-সাহেবের কাছে প্রভূত-ভাবে উপকৃত। বেচারিকে ছ' নৌকায় পা দিয়ে চলতে হয়—সরকারী চাকরি আর ডিফেন্স কাউন্সেলার প্রতাপশালী ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু।

দ্বিতীয় ফোনটা ধরলেন বাসু-সাহেবের বোম্বাই প্রবাসী এক বন্ধু—চন্দ্রকান্ত বরুয়া। তাঁকে বললেন, একটু কষ্ট দিচ্ছি। বোম্বাইয়ের কাপাডিয়া অ্যাণ্ড

কাপাডিয়া কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে তাদের ম্যানেজার সুপ্রিয় দাসগুপ্তর স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। বেচারি বোধহয় এখনও জানে না, তার স্বামী কলকাতায় এসে একটা বিশ্রী মামলায় জড়িয়ে পড়েছে।···কী? না, মার্ডার চার্জ! তোমাকেই বললাম, ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাতে। তুমি মেয়েটাকে মার্ডার-চার্জের কথা বল না। আমার নাম করে বল, তার সাক্ষী খুব জরুরী দরকার। সে যেন নেক্স্ট এ্যাভেইলেবল্ প্লেনে ক'লকাতা চলে আসে। প্যাসেজ-মানি তার কাছে যদি না থাকে, তুমি আমার হয়ে দিয়ে দেবে। মেয়েটি যদি পারে তবে এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে যেন সোজা আমার বাড়িতে চলে আসে। যদি পার, তবে ওকে প্লেনে তুলে দিয়ে তুমি আমাকে একটা ফোন কর।···ইয়েস্ ইয়েস্···অল এক্সপেনস্ ইজ মাইন! চিয়ারিও!

পাঁচ

বৃহস্পতিবার সকাল। প্রতিবাদী সুপ্রিয় দাসগুপ্তের আজ প্রাথমিক হিয়ারিং হবে। বাসু-সাহেব আর সুজাতা তৈরী হয়ে নিল। সুজাতা প্রতিবাদী পক্ষের সমন পেয়েছে। প্রত্যেোৎ নাথ সরাসরি কোর্টে যাবে। ওঁরা রওনা হতে যাবেন এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোনটা। বাসু-সাহেব ধরলেন।

ফোন করছেন প্রবীণ ব্যারিস্টার এ. কে. রে। এখন বয়স আশির কোঠায়। ত্রিশ বছর হল তিনি প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর আমলে রে-সাহেব ছিলেন ক'লকাতার সবচেয়ে নামকরা ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার-মহলে তাঁকে বলা হত 'বারওয়েল দ্য সেকেণ্ড।' 'বারওয়েল' ছিলেন কলকাতা বারের বিখ্যাত শেষ ইংরাজ ব্যারিস্টার। পি. কে. বাসু প্রথম যৌবনে এঁর কাছেই জুনিয়ার হিসাবে কাজ শিখেছেন, ব্যারিস্টারী পড়তে যাবার আগে। রে-সাহেব ওঁকে শুভেচ্ছা জানালেন, বললেন, অনেক অনেকদিন পর কোর্টে বের হচ্ছ, তাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাসু বললেন, শুভেচ্ছা কেন স্যার? বলুন আশীর্বাদ!

—বেশ আশীর্বাদই। কিন্তু একটা কথা, বাসু। গতকাল নিরঞ্জন মাইতি হঠাৎ আমার কাছে এসেছিল। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেল আজ কোর্টে উপস্থিত থাকতে। আমি তো আজ বিশ-ত্রিশ বছর কোর্টে যাইনি। হঠাৎ এ নিমন্ত্রণটা হল কেন বল তো?

—জানি না। আন্দাজ করতে পারি। সে কী বলল?

—বলল, অনেকদিন পর আপনার শিষ্য আজ সওয়াল করছে, আপনি

আসবেন স্যার। আমি নিমন্ত্রণ করতে এসেছি! কিন্তু ওর মুখ চোখ দেখে আমার মনে হল, মানে···

—আপনার দৃষ্টি ভুল করে না, স্যার। আপনি ঠিকই ভেবেছেন—মাইতি বার এসোসিয়েশানেও বলে এসেছে এই কেস-এ সে আমার রেকর্ড ভাঙবে! অর্থাৎ অ্যাকিউস্‌ড-এর কন্‌ভিকশান হবে!

—কেসটা কী? তিনশ দুই?

—ইয়েস্‌ স্যার!

—কী বুঝছ? কেসটা কী খারাপ?

—ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি! কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, মাইতি এমন কিছু এভিডেন্স পেয়েছে যার কোন হদিসই আমি এখনও পাইনি—হি হ্যাজ্‌ সামথিং আপ হিজ্‌ স্লিভস! কোর্ট-এর ভিতর ড্রামাটিক্যালি সেটা সে পেশ করতে চায়—তাতেই আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করছে।

—আমারও তাই মনে হয়। এনি ওয়ে—যদি প্রয়োজন মনে কর তাহলে কোর্ট থেকে ফেরার পথে আমার সঙ্গে কনসাল্ট কর। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, য়ু ক্যান ওয়েল অ্যাপ্রিশিয়েট, বাসু—আই জাস্ট ক্যাণ্ট অ্যাফোর্ড টু সি মাই হিদারটু আনডিফিটেড কোলীগ—

—কোলীগ নয় স্যার, শিষ্য বলুন!

—ওয়েল মাই বয়! শিষ্যই।···যাক্‌ তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেস্ট অফ ল্যক্‌!

প্রবীণ গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে বাসু-সাহেব যখন কোর্টে এসে উপস্থিত হলেন তখন কোর্ট বসেছে। আদালতে তিলধারণের স্থান নেই। ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু নতুন করে প্র্যাকটিস্‌ শুরু করছেন এ-খবর আইনজীবী মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। বার এ্যাসোসিয়েশান ভেঙে পড়েছে। দর্শকদের আসন অনেক আগেই পূর্ণ হয়ে গেছে। অনেকে দেওয়াল ঘেঁষে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু প্রেসের লোকও এসেছে। কোর্ট থেকে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আদালত চলা কালে কোন ফটো তোলা না হয়।

বিচক্ষণ বিচারক জাস্টিস্‌ সদানন্দ ভাদুড়ী নিজের আসনে এসে বসলেন। জুরির মাধ্যমে আজকাল আর বিচার হয় না। জুরি নেই। একটু নিচের ধাপে বসে আছে দুজন কোর্ট পেশকার। প্রথা-মাফিক বাদী ও প্রতিবাদী প্রস্তুত আছেন কিনা জেনে নিয়ে বিচারক বিচার আরম্ভ ঘোষণা করলেন। পাবলিক প্রসিকিউটার বিশালায়তন প্রবীণ আইনজীবী নিরঞ্জন মাইতির দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রারম্ভিক ভাষণ?

মাইতি খুশিতে ডগমগ। উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে বললেন, আদালত যদি অনুমতি দেন, আমি একটি সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে ইচ্ছুক। আমরা আশা রাখি যে, আমরা প্রমাণ করব—আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্ত গত এগারোই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, রাত প্রায় পৌনে আটটার সময় বড়বাজারে মিস্ট্যর এম. পি. জৈনের গদীতে আরও তিনটি সঙ্গীর সঙ্গে অনধিকার প্রবেশ করে, আমরা প্রমাণ করব যে, সে ভয় দেখিয়ে ঐ দোকানের কেশিয়ার সুকুমার বসুর কাছ থেকে নগদ ষাট হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং মিস্টার এম. পি. জৈনের নিজের রিভালভারটি তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে গুলি বিদ্ধ করে হত্যা করে। আমরা আশা রাখি, আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্তের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশ, ডাকাতি, আনলাইসেন্সড্ রিভলভার রাখা ও হত্যার অপরাধ প্রমাণিত হবে। এবং আমরা আশা রাখি, মহামান্য আদালত এ ক্ষেত্রে আসামীর প্রতি চরমতম দণ্ড বিধান করবেন!

এই কথা বলেই নিরঞ্জন মাইতি আসন গ্রহণ করলেন। উকিল মহলে একটা গুঞ্জন উঠল। পি. পি. নিরঞ্জন মাইতিও শুরুতেই একটি রেকর্ড করলেন! এত সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ নাকি তিনি জীবনে দেননি।

জজ-সাহেবও বোধকরি এটা আশা করেননি। মাইতি শেষ করার পরেও তিনি আশা করেছিলেন, মাইতি বুঝি আবার উঠে কিছু বলবেন। মাইতি সত্যই উঠলেন আবার। হেসে বললেন, দ্যাটস্ অল মি' লর্ড!

জাস্টিস্ ভাদুড়ী এবার প্রতিবাদী আইনজীবীদের দিকে ফিরলেন। পাশাপাশি বসে আছেন ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু এবং তাঁর সহকারী প্রদ্যোৎ নাথ। জাস্টিস্ ভাদুড়ী বললেন, এবার আপনারা প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে পারেন।

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কিছু একটা বলতে গেলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল আদালতের প্রবেশদ্বারের দিকে। চমকে উঠলেন উনি। সংক্ষেপে বিচারককে বললেন, দ্যাটস্ অল মি' লর্ড! আমি কোন প্রারম্ভিক ভাষণ দেব না!

বিচারকের দিকে একটি বাও করে বাসু-সাহেব তাঁর আসন ছেড়ে এগিয়ে গেলেন দ্বারের দিকে। শুভ্রকেশ অতি বৃদ্ধ এ. কে. রে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এগিয়ে আসছিলেন। তাঁর হাতটা ধরলেন। হাসলেন রে সাহেব। বাসু ওঁকে নিয়ে এসে বসালেন নিজ আসনের পাশে। বৃদ্ধ এ. কে. রে স্থির থাকতে পারেননি। এসে উপস্থিত হয়েছেন আদালতে। কোর্টে একটা গুঞ্জন উঠল। জুনিয়র উকিল যাঁরা এ. কে. রে-র নাম শুনেছে, কিন্তু চোখে দেখেনি, তারা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে দেখতে চায়। জাস্টিস ভাদুড়ী তাঁর

হাতুড়িটা ঠুকলেন। এ. কে. রে বিচারককে একটা বাও করে আসন গ্রহণ করলেন। বিচারক ভাদুড়ীও হাত নেড়ে প্রত্যভিবাদন করলেন হেসে।

জজ-সাহেব মাইতিকে বললেন, আপনি প্রথম সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

প্রথম সাক্ষী : ডাঃ রামকুমার অধিকারী।

রামকুমার যথারীতি শপথ নিয়ে সাক্ষীর মঞ্চ থেকে তাঁর নাম, পরিচয়, পেশা ইত্যাদি জানালেন মাইতি মশায়ের প্রশ্নের উত্তরে। স্বীকার করলেন, তাঁর ডিস্‌পেনসারি ঐ জৈন-সাহেবের গদীর কাছেই। ঘটনার দিন রাত আটটা বেজে তিন মিনিটে একজন লোক ছুটে এসে বলে জৈন-সাহেব গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শুনেই তিনি দেখতে যান। ওঁর ডাক্তারখানা থেকে যেতে ওঁর আন্দাজ দু' মিনিট লাগে। সুতরাং আটটা পাঁচ মিনিটে তিনি প্রথমে জৈন-সাহেব এবং পরে দারোয়ানকে পরীক্ষা করেন। জৈন মারা গেছেন, আর দারোয়ানের বাঁ-কাঁধে গুলি বিদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তিনি জানতে চান যে, পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে কি না। ভীড়ের মধ্যে একজন, কে তা তিনি বলতে পারবেন না—জানায় যে, থানা এবং অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করা হয়েছে। মিনিট দশেকের ভিতরেই অ্যাম্বুলেন্স এসে যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিসও।

মাইতি প্রশ্ন করেন, মিস্টার জৈন কখন মারা গেছেন বলে আপনার বিশ্বাস?

—এগার তারিখ রাত আটটা পাঁচ মিনিটের আগে।

—না না, কত আগে? রাত আটটা পাঁচ মিনিটে তাঁকে যখন মৃত অবস্থায় দেখেছেন তখন ও-জবাব আমি চাইছি না।

দেখা গেল রামকুমার অত্যন্ত সতর্ক সাক্ষী। জবাবে বললেন, কত আগে তা অটোপ্সি সার্জেন বলতে পারেন। আমি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিনি।

মাইতি বিরক্ত হয়ে বলেন, কী আশ্চর্য! আপনার পাশের দোকানে ডাকাতি হল, চেঁচামেচি হল, গুলির আওয়াজ হল—

—গুলির আওয়াজ স্বকর্ণে শুনেছি, একথা আমি বলিনি।

—তা শোনেননি, কিন্তু হৈ-চৈ চেঁচামেচি তো শুনেছেন?

—শুনেছি। কিন্তু সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি বলি যে, মৃত্যু রাত পৌনে আটটার পরে হয়েছে তবে ঐ উনি কোর্টের মধ্যে আমার প্যান্টলুন খুলে নেবেন! ওঁকে আমি চিনি—

সাক্ষী ডিফেন্স-কাউন্সিলার পি. কে. বাসুকে ইঙ্গিত করেন। বাসু-সাহেব তখন একদৃষ্টে একটা নথি পড়ছিলেন। চোখ তুলে দেখলেন না।

কোর্টে একটা মৃদু হাস্যরোল উঠতেই জাস্টিস্ ভাদুড়ী তাঁর হাতুড়ি পিটলেন। বিচারক সাক্ষীকে বললেন, আপনি অবান্তর কথা বলবেন না। প্রশ্নের যা রেঞ্জ উত্তর তার মধ্যেই সীমিত রাখুন।

মাইতি বললেন, দ্যাট্‌স্ অল মি' লর্ড।

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, নো ক্রশ এক্সামিনেশান।

এবার সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন সরকারপক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী অটোপ্সি-সার্জেন ডাঃ অতুলকৃষ্ণ সান্যাল। তিনিও তাঁর পরিচয় ইত্যাদি দিয়ে স্বীকার করলেন, মৃত মিস্টার জৈনের শবদেহ তিনি ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। সীসার গোলকটি মৃতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঁজরের মাঝামাঝি অংশ দিয়ে হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে, ঠিক যেখানে 'সুপিরিয়র ভেনা কাভা' এবং দক্ষিণ দিকস্থ 'পালমোনারি আর্টারি' এসে পড়েছে হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ আর্টিয়ামে। ফলে দক্ষিণ আর্টিয়াম বিদ্ধ হয়, তারপর ঐ সুপিরিয়র ভেনা কাভাকে ফুটো করে এবং দক্ষিণ পালমোনারি আর্টারিদ্বয়ের উপর দিকের ধমনীটি বিচ্ছিন্ন করে সীসার গোলকটি পিঠের দিকে চলে যায়। শিরদাঁড়ার একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রাতে আহত হয়ে সেটা হৃদপিণ্ড অঞ্চলেই আটকে থাকে। যেহেতু 'সুপিরিয়ার ভেনা কাভা' এবং হৃদপিণ্ডের আর্টিয়াম মানবদেহে অতি আবশ্যিক প্রত্যঙ্গ—যাকে বলে ভাইটাল-অর্গান, তাই কয়েক মিনিটের ভিতরেই গুলি-বিদ্ধ জৈনের মৃত্যু হয়েছিল বলে তাঁর বিশ্বাস।

মাইতি প্রশ্ন করেন, আপনি যা বললেন তা থেকে বোঝা যাচ্ছে গুলিটা জমির সমান্তরালে যায়নি, ক্রমশঃ উঁচু থেকে নিচু দিকে গিয়েছে। তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বুকের যেখান দিয়ে ঢুকেছে এবং পিঠের যেখানে আটকেছে এতে গুলিটা কতখানি নেমেছে?

—পাঁচ সেন্টিমিটার অর্থাৎ প্রায় দু-ইঞ্চি।

—এ-থেকে কি আপনার ধারণা যে-লোকটা গুলি করেছে, সে মৃত ব্যক্তির চেয়ে উচ্চতায় বেশি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার উত্তরের সাধারণ-বোধ্য একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিন—

ডাক্তার সান্যাল মনে হয় এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। আদালতের অনুমতি নিয়ে তিনি মানব-কঙ্কালের একটি বড় চার্ট পিছনের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। লম্বা একটা লাঠি দিয়ে দেখালেন ঠিক

কোন্ স্থানে গুলিটা বুকে প্রবেশ করেছে এবং কোন্ অস্থিতে আটকে ছিল। উনি বললেন, মানুষে সচরাচর গুলি করে নিজের বুকের সমতলে রিভলভারটা ধরে। ফলে আহত ব্যক্তির ঠিক বুকেই যদি গুলি বিদ্ধ হয় এবং দেখা যায় সেটা ক্রমশঃ নিচের দিকে নেমেছে তবে আন্দাজ করতে পারা যায় হত্যাকারীর উচ্চতা আহতের চেয়ে বেশী ছিল।

—মিস্টার জৈন-এর উচ্চতা কত ছিল?

—ঠিক পাঁচ ফুট।

—আপনার হিসাবমত আততায়ীর উচ্চতা কত হবে?

—তা ঠিক করে বলা শক্ত। তবে আন্দাজে বলা যায়, সাড়ে পাঁচ ফুটের উপরে তো বটেই।

—আমার জেরা এখানেই শেষ—বসে পড়েন মাইতি।

ব্যারিস্টার বাসু জেরা করতে উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ডক্টর সানিয়াল—ঐ যে বললেন, আপনার মতে আততায়ীর উচ্চতা আহত জৈন-এর চেয়ে বেশী ছিল—এটা আপনার আন্দাজ, বিশ্বাস, না স্থির-সিদ্ধান্ত।

—না, স্থির সিদ্ধান্ত নয়, আবার আন্দাজও নয়—ওটা আমার যুক্তি-নির্ভর অনুমান!

—আই সী! যুক্তি-নির্ভর অনুমান! কী যুক্তি?

—তাই তো আমি বোঝালাম এতক্ষণ।

—আমি বুঝিনি।

—সেটা আমার দুর্ভাগ্য! আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

—তা বললে তো চলবে না ডক্টর সানিয়াল। আপনি মানবদেহ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ; কিন্তু আমি শারীর-বিদ্যার কিছু জানি না। আমাদের বোধগম্য ভাষায় আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বইকি। আচ্ছা, আমি একে একে প্রশ্ন করি। আমাকে বুঝিয়ে দিন।—ধরুন গুলি করার মুহূর্তে যদি আততায়ী বা আহতের মধ্যে একজন বসে থাকত অথবা কুঁজো হয়ে দাঁড়াত তাহলে আপনার যুক্তিনির্ভর অনুমানটা টেঁকে না, কেমন?

—না, টেঁকে না।

—আততায়ী যদি তার নিজের বুকের সমতলে রিভলভারটা না ধরে তাহলেও ও-যুক্তি টেঁকে না? কারেক্ট?

—ইয়েস!

—আপনি জানেন যে, আয়রন সেফটায় পৌঁছতে গেলে দুটি ধাপ উঠতে হয়। সেক্ষেত্রে আততায়ী যদি সেই সিঁড়ির উপর থেকে গুলি ছুঁড়ে থাকে তবে বামন হওয়া সত্ত্বেও গুলি ঐ ভাবে মৃতের দেহে ঢুকতে পারত। এ্যাম আই কারেক্ট ?

একটু ইতস্তত করে সাক্ষী বলেন, কারেক্ট !

—তা সত্ত্বেও আপনি মনে করেন আপনার ঐ সিদ্ধান্ত যুক্তি-নির্ভর অনুমান ?

—ও-গুলো তো এক্‌সেপশান কেস !

—এক্‌সেপশান! আপনি তো বিজ্ঞান-শিক্ষিত! পার্মুটেশান কম্বিনেশান অঙ্ক নিশ্চয় কষেছেন! বলুন—দুজন লোক আছে। একজন আততায়ী একজন আহত : তাদের চারটি অবস্থা হতে পারে—শোয়া, বসা, দাঁড়ানো এবং কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো। এক্ষেত্রে দুজনের সমান হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা কত পার্সেণ্ট ?

মাইতি উঠে দাঁড়ান, অবজেকশান য়োর অনার! সাক্ষী একজন শারীর-বিদ্যা বিশারদ। অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত নন! এ প্রশ্ন অবৈধ।

বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে অঙ্কে র‍্যাংলার হবার দরকার নেই। ইণ্টারমিডিয়েটে অঙ্ক না থাকলে ডাক্তারী কলেজে ভর্তি হওয়া যেত না। যে প্রশ্ন আমি করেছি, উনি যখন পাশ করেছেন তখন তা আই. এস. সি-তে কষানো হত। এই রুডিমেণ্টাল অঙ্ক উনি ভুলে গিয়ে না থাকলে ওঁর বলা উচিত, মাত্র 6·25 পার্সেণ্ট !

জাস্টিস্ ভাদুড়ী বলেন, অবজেকশান ওভাররুলড !

সাক্ষী রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললেন, খাতা পেন্সিল ছাড়া ওটা আমি কষে বার করতে পারব না। তবে মনে হয় শতকরা দশ পার্সেণ্টের কম !

—যে পার্সেণ্টেজটা এখন বলছেন, সেটা আপনার আন্দাজ, স্থির সিদ্ধান্ত না যুক্তি-নির্ভর অনুমান ?

—আন্দাজ !

—ঠিক আছে! অঙ্কশাস্ত্র থাক। ডাক্তারী প্রশ্নেরই জবাব দিন! থোরাসিক অথবা ডর্সাল ভার্টিব্রার সংখ্যা বারোটা—এ্যাম আই কারেক্ট ?

—ইয়েস।

—একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রার অবস্থান প্রায় নাভিকুণ্ডের সম-উচ্চতায় ? অ্যাম আই কারেক্ট ?

—আমি তখন একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রার কথা বলিনি, স্পাইনাল-কলমের একাদশতম অস্থির—

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, আনসার মি! একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রার অবস্থান প্রায় নাভিকুণ্ডের সম-উচ্চতায়? ইয়েস আর নো?

—কী আশ্চর্য! আমি তখন—

—আই আস্ক ফর দ্য থার্ড টাইম—একাদশতম থোরাসিক ভার্টিব্রার—প্রশ্নটা শেষ করতে দেন না সাক্ষী। তার আগেই বলেন, ইয়েস।

—আহতের বুকে যেখানে গুলি লেগেছে সেখান থেকে তার একাদশতম থোরাসিক অস্থির অবস্থিতি—সোজা হয়ে দাঁড়ালে—অন্তত এক ফুট নিচে! ঠিক কথা?

—কিন্তু আমি তা—

—বড় বাজে কথা বলছেন আপনি! বলুন—'হ্যাঁ', না 'না'!

—ইয়েস!

—আপনার যুক্তি-নির্ভর থিয়োরি অনুযায়ী—অর্থাৎ ঐ 6·25 পার্সেন্ট সম্ভাবনা যদি কোনক্রমে কার্যকরী হয়, আই মীন দুজনেই যদি খাড়া হয়ে
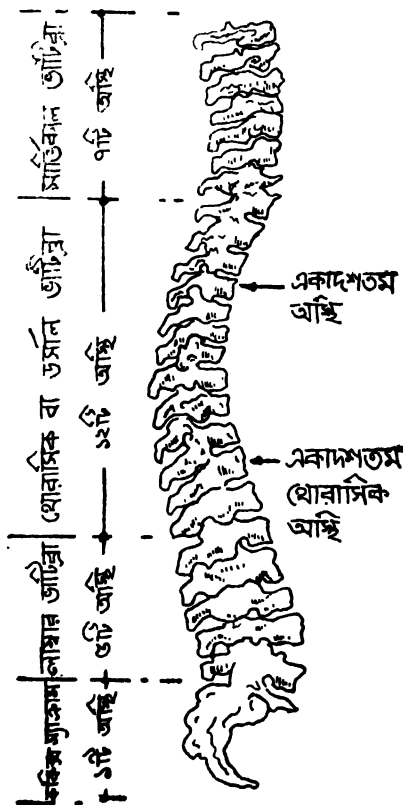
দাঁড়ায় এবং আততায়ী তার বুকের লেভেল থেকে গুলি করে, সে ক্ষেত্রে আততায়ীর উচ্চতা দশ থেকে বারো ফুট হওয়া উচিত? বলুন—'হ্যাঁ', না, 'না', ?

মরিয়া হয়ে সাক্ষী বলেন, আপনি শুধু শুধু ব্যাপারটা গুলিয়ে দিচ্ছেন। আমি একাদশ থোরাসিক ভার্টিব্রার কথা আদৌ বলিনি—

বাসু-সাহেব হাত তুলে সাক্ষীকে থামতে বলেন। জজ-সাহেবকে বলেন, মহামান্য আদালতকে অনুরোধ করছি, সাক্ষীর জবানবন্দীর ঐ অংশ ওঁকে পড়ে শোনানো হোক—ঐ যেখানে উনি সীসার গোলকটা শব-ব্যবচ্ছেদের সময় পেয়েছেন।—বাসুসাহেব বসে পড়েন রুমাল দিয়ে চশমার কাচটা মোছেন

বিচারকের অনুমতি অনুসারে কোর্ট পেশ্‌কার পড়ে শোনায়, "ফলে দক্ষিণ আর্টিয়াম বিদ্ধ হয়, তারপর ঐ সুপিরিয়ার ভেনা কাভাকে ফুটো করে এবং দক্ষিণ পালিমোনারি আর্টারিদ্বয়ের উপর দিকের ধমনীটি বিচ্ছিন্ন করে সীসার গোলকটি পিঠের দিকে চলে যায়। শিরদাঁড়ার একাদশতম থোরাসিক ভার্টি-ব্রাতে আহত হয়ে সেটা হৃৎপিণ্ড অঞ্চলেই আটকে থাকে।"

জবানবন্দী পাঠ শেষ হতেই তড়াক করে উঠে দাঁড়ান বাসু-সাহেব—নাউ আনসার মি! আপনার যুক্তি-নির্ভর অনুমান মতো আততায়ীর উচ্চতা দশ থেকে বারো ফুট হওয়া উচিত?

মাইতি আপত্তি জানান, বলেন, সাক্ষী ইতিপূর্বে একাদশ থোরাসিক ভার্টিব্রার কথা মোটেই বলতে চান নি। শিরদাঁড়ার একাদশতম অস্থির কথা বলতে চেয়েছেন। শিরদাঁড়ার উপর দিকের প্রথম সাতটি অস্থি থোরাসিক নয়।

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বিচারককে বলেন, মাননীয় সহযোগী যদি নিজেকেই বিশেষজ্ঞ হিসাবে দাবী করেন তবে তাঁকেই জেরা করবার অনুমতি চাইছি—**on voir dire**!

কোর্টে একটা হাস্যরোল ওঠে।

জাস্টিস ভাদুড়ী গম্ভীর হয়ে বলেন, আদালত এসব ব্যঙ্গোক্তি পছন্দ করেন না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ডিফেন্স কাউন্সেলের সঙ্গে আমি একমত। সাক্ষী কী বলতে চান তার ব্যাখ্যা আমরা বাদীপক্ষের উকিলের কাছে শুনতে চাই না, বিশেষজ্ঞ হিসাবে তিনি কী বলেছেন তা আমরা শুনেছি। মিস্টার ডিফেন্স কাউন্সেলার, য়ু মে প্রসীড—

—আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। আমি মাননীয় আদালতকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে বলব, যে সাক্ষী শুধু অঙ্কশাস্ত্র নয়, ডাক্তারী শাস্ত্র বিষয়েও বিশেষজ্ঞ হিসাবে দাবী করতে পারেন না। স্পাইনাল কর্ডের একাদশতম অস্থিকে যিনি অষ্টাদশতম অস্থি বলতে পারেন তাঁর পক্ষে ফার্স্ট এম. বি. পাশ করাও অসম্ভব!

জাস্টিস ভাদুড়ী কঠিনস্বরে বলেন, আদালত কোন্ সিদ্ধান্তে আসবেন সেটা আদালতের বিচার্য!

—আই এগ্রি, মি' লর্ড! কিন্তু একথাও আমি আদালতকে ভেবে দেখতে বলব যে, বিশেষজ্ঞ হিসাবে সাক্ষী যে বলেছেন আততায়ীর উচ্চতা পাঁচ ফুটের চেয়ে বেশি তার কোন যুক্তি নেই।

জাস্টিস ভাদুড়ী একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, মিস্টার পি. পি.। আপনার পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকুন।

পরবর্তী সাক্ষী ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট জীতেন বসাক। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, এ. পি জৈনের মৃত্যু হয়েছে যে গুলিতে সেটা ·38 বোর রিভলভারের। জৈনের নিজের রিভলভারটি ছিল ঐ বোরের স্মাক্সবি কোম্পানির; তার নম্বর 759362 এবং আসামীর নামে রিসার্ভকরা ক্যুপে থেকে যে রিভলভারটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটারও ঐ বোর এবং ঐ নম্বর। অর্থাৎ সেটা জৈনের রিভলভার। রিভলভারটি পিপল্‌স্ একজিবিট হিসাবে চিহ্নিত হল।

বাসু-সাহেব তাঁকে কোনও প্রশ্ন করলেন না।

প্রদ্যোত নাথ জনান্তিতে তাঁকে বলে, ব্যালাসটিক এক্সপার্টকে ক্রশ করবেন না?

বাসু নিম্নস্বরে বললেন, পণ্ডশ্রম! লোকটা আদ্যন্ত সত্যি কথা বলছে!

পাশে বসেছিলেন এ. কে. রে। তিনি শুধু বললেন, কারেক্ট!

চতুর্থ সাক্ষী জৈনের কেশিয়ার সুকুমার বসু। মাইতির প্রশ্নে সে নিজের নাম, ধাম, পরিচয় দিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যারাত্রের ঘটনার একটি নিখুঁত বিবরণ দিল। বলল, তিনজন ডাকাতেরই মুখে রুমাল বাঁধা ছিল। তাদের চোখ দেখা যাচ্ছিল। মাইতি প্রশ্ন করেন, যে লোকটা গুলি করেছিল তাকে আপনি দেখেছেন?

—নিশ্চয়ই! আমার চোখের সামনেই তো সে গুলি করল।

—তার আকৃতির একটা বর্ণনা দিন।

সাক্ষী আসামীর দিকে তাকিয়ে বললে, উচ্চতা পাঁচফুট দশ ইঞ্চি হবে; একহারা ফর্সা—

—ওদিকে কি দেখছেন? যিনি প্রশ্ন করছেন তাঁর দিকে তাকান—বাধা দেন বাসু-সাহেব!

সাক্ষী থতমত খেয়ে যায়। আসামীর দিকে আর তাকায় না। বলে, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, বড় বড় জুলফি ছিল, চোখে কালো চশমা—

মাইতি ওকে ভরসা দিয়ে বলেন, আমার দিকে কেন? ওদিকেই তাকিয়ে দেখুন। আপনার কি মনে হয়, আততায়ীর চেহারার সঙ্গে আসামীর চেহারার সাদৃশ্য আছে?

—আছে।

—কি সাদৃশ্য?

—দুজনের উচ্চতা এক, বয়স এক, দুজনেই ফর্সা এবং দুজনেরই বড় বড় জুলফি আছে।

—আপনার কি অনুমান আসামীই সেই আততায়ী?

—অবজেক্‌শান য়োর অনার! সাক্ষী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পারেন। তাঁর অনুমান কোন এভিডেন্স নয়।

মাইতি হেসে বলেন, আচ্ছা আমি প্রশ্নটা অন্যভাবে করছি—আপনি আততায়ীকে প্রত্যক্ষ করেছেন, আসামীকেও প্রত্যক্ষ করছেন। এখন বলুন, দুজনের আকৃতি কি একই রকম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য কোথায় লক্ষ্য করছেন?

—ঐ বড় বড় জুলফি।

—য়ু মে ক্রশ এক্সামিন—বাসুকে অনুমতি দিয়ে আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাসু প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন। সুকুমারবাবু, আপনার নিজের 'হাইট' কত?

প্রথম প্রশ্নেই আপত্তি জানালেন পি. পি। এ প্রশ্ন নাকি অবৈধ। সাক্ষীর উচ্চতার সঙ্গে মামলার কোন সম্পর্ক নাকি নেই। বাসু জজ-সাহেবকে বললেন, য়োর অনার, সাক্ষীকে দিয়ে বলাতে চাইছি যে, তাঁর নিজের উচ্চতাও ঐ পাঁচ-ফুট দশ ইঞ্চির কাছে, তিনিও একহারা, হোয়াইটেক্স মাখলে তিনিও আসামীর মত ফর্সা হয়ে যাবেন এবং তাঁর নিজেরও বড় বড় জুলফি আছে! অর্থাৎ আসামীর মঞ্চে যদি আসামীর পরিবর্তে একটি প্রমাণ সাইজ আয়না থাকত তাহলেও তাঁর জবাব এক রকমই হত! যাই হোক, সহযোগী যখন আপত্তি করছেন তখন আমি না হয় অন্য প্রশ্ন করছি। বলুন, সুকুমারবাবু—আপনি এখনই বলেছেন আসামীকে আততায়ীরূপে চিহ্নিত করবার সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে তার বড় বড় জুলফি। তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই বলেছি।

—আপনি কেন অতবড় জুলফি রেখেছেন?

—অবজেক্‌শান য়োর অনার! ইররেলিভ্যান্ট···

বিচারক বললেন, অবজেক্‌শান সাসটেনড্‌।

বাসু হেসে বলেন, বড় বড় জুলফি রাখা আজকের দিনে একটা ফ্যাসান, তাই নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো দেখতে পাই।

—তাহলে শিকারী বিড়ালকে যেমন গোঁফ দেখে চেনা যায়, মানুষ শিকারীকে তেমনি জুলফি দেখে চেনা যায় না?

মাইতি আজ পান থেকে চুন খসতে দেবেন না। তড়াক করে উঠে দাঁড়ান আবার। আপত্তি জানিয়ে বলেন, সাক্ষী একথা বলেননি যে, গোঁফ দেখে কিছু চেনা যায়।

বাসু গম্ভীর হয়ে বলেন, না, গোঁফ দেখে চেনার কথা সাক্ষী সুকুমার ঘোষ বলেননি, বলেছিলেন সুকুমার রায়।

মাইতি অবাক হয়ে বলেন, মানে! সুকুমার রায়! তিনি কে?

বাসু গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলেন, না, সুকুমার রায়ও নিজে ও কথা বলেননি। বলেছিলেন তাঁর হেড অফিসের বড়বাবু। বড়বাবুর বদলে কেশিয়ার বরং বলছেন: 'জুলফির আমি, জুলফির তুমি—তাই নিয়ে যায় চেনা!'

আদালতে হাস্যরোল ওঠে।

জাস্টিস ভাদুড়ী তাঁর হাতুড়ি পিটিয়ে গণ্ডগোল থামালেন। বাসুকে বললেন, আই অ্যাডভাইস দ্য কাউন্সেল নট্ টু বি ফ্রিভলাস!

বাসু একটি বাও করে বললেন, পার্ডন মি' লর্ড! আমার মনে আছে, এটা তিনশ দুই ধারার মামলা। কিন্তু বর্তমান সাক্ষী তাঁর সাক্ষ্যকে ক্রমশঃ ঐ ফ্রিভলিটির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন,—আমি নাচার। মাননীয় আদালত সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে প্রণিধান করবেন, ঐ বয়সের শতকরা চল্লিশজনের বড় বড় জুলপি আছে।

জাস্টিস ভাদুড়ী শুধু বললেন, য়ু বেটার প্রসীড উইথ য়োর ক্রশ একজামিনেশনস্।

বাসু পুনরায় সাক্ষীকে জেরা শুরু করেন: আসামী যখন হাজতে ছিল তখন পুলিস আপনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে ঐ আসামীকে চিনিয়ে দিয়েছিল। তাই নয়?

—না তো!

—আপনি বলতে চান আপনাকে পুলিস আগে ভাগে ঐ আসামীকে দেখিয়ে দেয়নি? চিনিয়ে দেয়নি?

—আজ্ঞে না, কখনও না!

—কেন বাজে কথা বলছেন? আপনি কি বলতে চান আজ এই আদালতে এসে ঐ কাঠগড়ার লোকটাকে জীবনে প্রথম দেখলেন?

—নিশ্চয়ই!

—তাই বলুন। তার মানে দাঁড়াচ্ছে গত এগারো তারিখ রাত আটটা নাগাদ ঐ আসামীকে আপনি দেখেননি—যেহেতু আজই তাকে জীবনে প্রথম দেখলেন। তাই না!

—না, মানে, আমি সেকথা বলিনি!

—বলেছেন! আপনি যা বলেছেন তা সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে যাচ্ছে। শুনতে চান?

—না, না। আমি যা বলেছি তার মানে হচ্ছে—

—মানে হচ্ছে 'কনক্লুশান'। সেটা আদালত করবেন। আপনি নন।

একটি 'বাও' করে বাসু বলেন, থ্যাঙ্ক মি' লর্ড। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন মাইতি। বলেন, পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকার আগে আমি বর্তমান সাক্ষীকে রি-ডাইরেক্ট-এক্সামিনেশানে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

—করুন।

মাইতি বললেন, সুকুমারবাবু, আপনি এইমাত্র বলেন যে, আসামীকে সুপ্রিয় দাসগুপ্তরূপে আজই জীবনে প্রথম দেখলেন—

—অবজেকশান য়োর অনার! সাক্ষী সে কথা আদৌ বলেননি।

—বাট হি মেণ্ট ইট!—ঘুরে দাঁড়ান মাইতি।

জজসাহেব নিরাসক্ত কণ্ঠে বলেন, আপনার সহযোগী ও-প্রসঙ্গে শেষ কথা বলে দিয়েছেন। সাক্ষী কি বলেছেন আদালত তা শুনেছেন, তার কী অর্থ আদালত তা বুঝে নেবেন। আপনি সরাসরি প্রশ্ন করুন। সাক্ষীর মুখে নিজ অভিপ্রায়মত শব্দ বসাবেন না।

মাইতির মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। সামলে নিয়ে বললেন, সুকুমারবাবু, আপনি কি আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্তের সঙ্গে কখনও টেলিফোনে কথাবার্তা বলেছেন? বলে থাকলে কবে?

—বলেছি। ঘটনার দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, এ বছরের এগারোই এপ্রিল।

—কখন?

—বিকাল পাঁচটায়।

—কী কথা হয়েছিল?

—উনি টেলিফোনে আমার মালিকের খোঁজ করলেন। তিনি গদীতে নেই শুনে উনি নিজের নাম আর পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

—জাস্ট এ মিনিট। নিজ নাম আর পরিচয় বলতে?

—উনি বললেন, উনি সুপ্রিয় দাসগুপ্ত, বোম্বাইয়ের কাপাডিয়া অ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার। আরও বললেন, মালিক ফিরে এলে আমি যেন তাঁকে জানাই যে, সুপ্রিয়বাবু ফোন করেছিলেন, তিনি পরদিন বেলা এগারোটার সময় হুণ্ডিটা নিতে আসবেন।

—আই সী! হুণ্ডিটা! আর কিছু প্রশ্ন করেননি তিনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, করেছিলেন। আমি কেশিয়ার বলে পরিচয় দেবার পর উনি জানতে চান, আমার ক্যাশে তখন কত টাকা আছে!

মাইতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, বলেন কি! আপনার ক্যাশে কত

টাকা আছে তা উনি কেন জানতে চাইছেন তা আপনি জিজ্ঞাসা করেননি?

—করেছিলাম। তাতে উনি বলেন পরদিন গুডফ্রাইডের ছুটি; ব্যাঙ্ক ভল্ট বন্ধ। তাই জানতে চাইছেন?

—তার মানে কি?

—মানে আমি জানি না।

—দ্যাটস্ অল মি' লর্ড।—আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাসু-সাহেব তখন সাক্ষীকে রি-ক্রশ-এক্সামিনেশান শুরু করলেন: আচ্ছা সুকুমারবাবু, টেলিফোনে যে আপনি আসামীর সঙ্গেই কথা বলেছিলেন সেটা কেমন করে বুঝলেন?

—উনিই তো তাঁর নাম, ধাম টেলিফোনে বললেন!

—সে তো টেলিফোনে যে কেউ বলতে পারে। পারে না?

—পারে।

—আপনি বলেছেন, আসামীকে আপনি জীবনে কখনও আজকের আগে দেখেননি, কণ্ঠস্বরও শোনেন নি নিশ্চয়? শুনেছেন?

—আজ্ঞে না।

—তার মানে যে-কেউ আসামীর নাম পরিচয় নিয়ে ও কথা বলতে পারত?

—তা পারত!

—তাহলে কেন হলপ নিয়ে বললেন—আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্তের সঙ্গে আপনি টেলিফোনে কথা বলেছেন?

—স্যার, আমি ভেবেছিলাম—

—ভেবেছিলেন! আই সী!—বসে পড়েন বাসু।

আদালত বেলা আড়াইটা পর্যন্ত বন্ধ রইল। মধ্যাহ্ন বিরতি।

ছয়

কৌশিক আদালতে যায়নি। বাড়িতেই ছিল। বেলা বারোটা নাগাদ একটা টেলিফোন এল বাসু-সাহেবের অফিসে। ব্যারিস্টার সাহেব অনুপস্থিত শুনে লোকটা সুকৌশলীর কৌশিক মিত্রের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। কৌশিকের সঙ্গে তার নিম্নোক্ত কথোপকথন হল—

—আপনি কি সুকৌশলীর মিস্টার কৌশিক মিত্র আছেন?

কৌশিক ওর খাজা বাংলা শুনে বললে, আছি। আপনি কে?

—আমার নাম আছে যদুপতি সিজ্ঞানিয়া। নামটা পহচানতে পারেন?

—পারি। আপনি গত এগারো তারিখে কাপাডিয়া অ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির একটা বাড়ি সাড়ে ছয় লাখ টাকায় কিনেছেন।

—দু-দুটো টেক্‌নিক্যাল গল্‌তি হইয়ে গেল, সুকৌশলী দাদা। সাড়ে ছয় না আছে, সাড়ে চার লাখ ; ঔর বাড়ির মালিক কাপাডিয়া কোম্পানি না আছে। মালিকের খাস সম্পত্তি ছিল। আর শুনেন—যো মামলাটা বাসু-সাহেব হাতে নিয়েছেন, আই মীন সুপ্‌রিও দাসগুপ্তের মামলা—ঐটার বিষয়ে কুছ্‌ জরুরী টিপ্‌স্‌ আমি বাসু-সাহেবকে দিতে চাই। তা বাসু-সাহেব তো দফতরে না-আছেন না? তাই আপনাকে বাৎলিয়ে দিচ্ছি। অগর জরুরৎ হোয় তো ফিন লিখিয়ে নিন—

—কিন্তু আপনিই যে মিস্টার যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া তা আমি বুঝব কি করে? আপনি বাড়ি থেকে বলছেন তো? লাইন কেটে দিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আপনার বাড়িতে ফোন করছি—

টেলিফোনে খুকখুক করে হাসির শব্দ ভেসে এল। লোকটা বললে, সুকৌশলী দাদা। আমি ভি কুছ্‌ কুছ্‌ সুকৌশলী আছি। আমি একটা পাবলিক বুথ থিকে টেলিফোন করছি, ঘর থিকে নয়। লেকিন আমি আপনার বাৎ মানিয়ে নিলম—আমি যে, জেনুইন যদুপতি আছি, সিটা প্রমাণ করার 'ওনাস' আমার আছে। একটা কোড-নাম্বার বাৎলাচ্ছি, লিখে নিন—795630।…লিখেছেন? আমার সঙ্গে বাতচিতের পিছে আপনি হামার বাড়িতে হামার 'ফাদার'কে ফোন করবেন। তিনি ঐ কোড-নম্বরটা বাৎলিয়ে দেবেন। ব্যস! আমার আইডেন্টিটি ইস্ট্যাবলিশ হইয়ে যাবে। সমঝ্‌লেন?

কৌশিক অবাক হয়ে বলে, এমন কাণ্ড করার অর্থ?

লোকটা হেসে বললে, আগর বাসু-সাহেব হলে এ বাৎ পুছ্‌ করতেন না। মঝিয়ে নিতেন। মালুম হল না?…এ মামলার ফয়সালা যবতক না হচ্ছে ব্‌তক্‌ আমি শালা ছিপিয়ে থাকব। আমার পাত্তা মিলে গেলেই বাসু-সাহেব ামাকে 'নেওতা' করে বসবেন—

—নেওতা! মানে নিমন্ত্রণ! কিসের?

—কোর্টের 'সমন', সুকৌশলী দাদা! ব্যস! খতম! শালার আদালতে ঠলেই আমাকে কাবুল খেতে হবে কি আমি দো-লাখ রূপেয়া ব্ল্যাক-মানি পারিও বাবুকে দিয়েছি! কবুল খেলে ইনকাম ট্যাক্সে ফাঁসব, বে-কবুল লেও পার্জারি কেসে ফাঁসব!…হর্নস্‌ অব এ ডাইনামো সমঝেন?

—হর্নস অব এ ডায়নামো!

—জী হাঁ! ডাইনামো ভি চার্জ নিচ্ছে না, ব্যাটারি ভি ডিসচার্জড! আমার

ঐ হালৎ! তাই ছিপিয়ে বসে আছি!

ইংরাজি জ্ঞান যেমনই হ'ক লোকটা যে খলিফা এটা বোঝা গেল। কৌশিক বললে, তাহলে নিজে থেকে টেলিফোন করছেন কেন?

—সিটা কেমন করে আপনাকে সমঝাই সুকৌশলীদাদা? আমার গলায় যে মছলির কাঁটা বিঁধিয়ে গেল। হর্নস্ অব এ ডাইনামো—শালার কাঁটা না নামছে না উগড়াচ্ছে!

—মছলির কাঁটা! সেটা আবার কি?

—আপনি বাংগালি আছেন, ফির 'মাছের কাঁটা' বুঝেন না?···আপনার ক্লায়েন্ট শালা সাচ্চা মাল আছে! এমন ইমানদার বুড়বক আমি জিন্দগিভর দুটি দেখি নাই! শালা যদি খালাস পায় ওর কাপাডিয়া কোম্পানি যদি ওকে বরখাস্ত করে তবে ঐ শালা ইমানদার বুড়বককে আমি দেড়া মাইনা দিয়ে আমার ম্যানেজার বানিয়ে লিব!

কৌশিক হেসে বলে, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি মিস্টার···?

লোকটা গম্ভীরস্বরে বললে, জী নেহি! তাহলে সেই কোথাই শুনাই: মোহনস্বরূপ কাপাডিয়া তাঁর ম্যানেজারকে সিরফ স্পেশাল পাওয়ার অব এ্যাটর্নি দেননি—দরটা ফাইনাল করবার এক্তিয়ারও দিয়েছিলেন। মোহনস্বরূপজী লেনদেনটা খুব গোপন রাখতে চেয়েছিলেন—আমি জানি, চার লাখ টাকাতে তিনি ক্লোজ ডাউন করতেন। লেকিন তা হতে পারেনি ঐ শালা ইমানদার বুড়বকটার জন্য। সে কলকাতা বাজারে যাচাই করে সমঝে নিয়েছিল কি হোয়াইট মানিতে সাত লাখ দর উঠবে। আমি তখন ঐ ম্যানেজারকে সিধা অফার দিয়েছিলাম কি সে যদি ভাও কমিয়ে দেয় তবে টুইন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন দিব। লোকটা এত বড় বুড়বক্ যে, রাজী হল না! আমি দাদা নাকতক্ কালোটাকায় ডুবে আছি, লেকিন ঐসব বুড়বকের জন্য আজও আমি মাথার টুপি খুলি। সমঝলেন?

—বলে যান। আমি শুনছি—

—আদালতে দাঁড়িয়ে আমি এজাহার দিতে সেকবনা; লেকিন ঐ বুড়বকটাকে বাঁচাবার জন্য আমি সবকুছ্ করতে তৈয়ার! কাপাডিয়া কোম্পানি যদি মামলা খরচ না দেয় তবে আমি এ মামলা চালাতে প্রস্তুত—

—কালো টাকায়?

—সে বাৎ পুছিয়ে কেন লজ্জা দিচ্ছেন দাদা? বাসু-সাহেবকে আমার নাম বাতাবেন।

—কিন্তু বাসু-সাহেব আপনার পাত্তা পাবেন কেমন করে?

—ঐ তো মুশ্কিল আছে দাদা ! তো ঠিক হ্যায়, আমি ফিন রাত আট বাজে ফোন করব।

—তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন তো ? প্রথম কথা, গত বৃহস্পতিবার, আই মীন এগারোই এপ্রিল রাত্রে আপনারা তিনজনে মোকাম্বোতে খেয়েছিলেন ?

—তিনজন না আছে দাদা, দু' জন। আমি আর ঐ সুপারিও দাসগুপ্তা। রাত সাড়ে সাত বাজে মোকাম্বোতে ঘুষেছিলাম, সাড়ে নও বাজে নিকলে আসি। জৈনসাব যখন বড়বাজারে ফৌত হল তখন ঐ সুপারিও শালা আমার সামনে বসে মুরগির টেংরি চুষছে ! আপন গড্ !

—সেখানে ঐ কেশিয়ার জীবন বিশ্বাস ছিল না ?

—সুকৌশলীদাদা—

—আমার নাম সুকৌশলী নয়, কৌশিক—

—একই বাৎ আছে দাদা। লেকিন এটা তো মানবেন কি ঐ গদ্ধাকামিজ পিনহেবালা বিশ্ওয়াসবাবুকে নিয়ে আমি মোকাম্বোতে ঘুষবো না ? সে পান খেতে চেয়েছিল, তাকে পান-শ' রূপেয়ার পান খাইয়েছি। পান খাওয়া সমঝেন ?

কৌশিক বলে, আর একটা কথা বলুন তো ? ওরা ঐ বাড়তি দু'লাখ টাকা কী ভাবে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল ?

—কালোটাকার লেন-দেন কি ভাবে হয় আপনি জানেন না সুকৌশলী-দাদা ? হুণ্ডি ! হুণ্ডির চোরা গলিতে। আমি খোদ ইন্তাজাম করে দিয়ে-ছিলাম। জৈনসাব ঐ হুণ্ডি দিত। লেকিন তার আগেই লোকটা ফৌত হইয়ে গেল। ইমানদার বেওকুফটা রোডে সিট-ডাউন হইয়ে গেল !

কৌশিক ধমক দিয়ে ওঠে, বার বার লোকটাকে ইমানদার বেওকুফ বলছেন, সেই ইমানদার লোকটাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস আপনার নেই ?

—দাদা ! দো-লাখ রূপিয়ার ঝামেলা আছে। আমি বিলকুল গড্ডায় গিরে যাব—

—তবে ফোন করছেন কেন ?

—ওহি তো বাতাচ্ছি ! হর্নস অব এ ডাইনামো ! ইদিকে আই. টি. ও. উদিকে মছলির কাঁটা—

কৌশিক উত্তেজিত হয়ে বলে, আপনি কী মশাই ? আপনি…আপনি একটা—

কথাটা তার শেষ হয় না। যদুপতি বলে উঠে, সুকৌশলীদাদা! এখন আপনি আমাকে শালা-বাহানচোৎ শুরু করবেন। আমি লাইন কাটিয়ে দিলাম…

সত্যই সে টেলিফোনের লাইনটা কেটে দিল।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল কৌশিক। যদুপতি সিঙ্ঘানিয়ার চরিত্রটাকে বুঝবার চেষ্টা করল। লোকটা নিজেই স্বীকার করছে তার নাক পর্যন্ত ডুবে আছে কালো টাকায়। তাহলে 'মাছের কাঁটা' বলতে সে কী বোঝাতে চায়? কোথায় বাধছে তার ঐ কাঁটাটা? বিবেক? বিবেক বলে ঐ জাতীয় লোকের সত্যই কিছু থাকে না কি?

একটু পরে সে টেলিফোন ডাইরেক্টারি হাতড়ে ফোন করল যদুপতির বাবা রঘুপতি সিঙ্ঘানিয়াকে। বাপ ছেলের মত বাংলা বলতে পারেন না। কৌশিক যেইমাত্র বলল যে, সে ব্যারিস্টার বাসুর বাড়ি থেকে ফোন করছে, ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ বললেন, তব্ ঠাহ্‌রিয়ে!

মিনিটখানেক টেলিফোনে আর মনুষ্যকণ্ঠ শোনা গেল না। ক্ষীণ স্বরে বিবিধ-ভারতীর হিন্দী প্রোগ্রামের গানের সঙ্গে একটা এ্যালসেশিয়ানের গর্জন ভেসে এল শুধু। তারপর শুনল: অব শুনিয়ে! ময় রঘুপতি সিঙ্ঘানিয়া বোল্‌তা হুঁ। মুঝ্‌কো কহ্‌নে কা মৎলব ইয়ে হ্যায় কি: সেবুন-নাইন-ফাইব-সিক্‌শ্‌-থিরি-ঔর ইয়ে ক্যা হ্যায়? জিরো হোগা সায়েদ্! রাম রাম…

লাইন কেটে দিলেন রঘুপতি।

কিন্তু কৌশিক ছাড়বার পাত্র নয়। পুনরায় ফোন করল সে। এবার বৃদ্ধ সিঙ্ঘানিয়া সিংহমূর্তি ধরলেন। অনর্গল মাতৃভাষায় যে ঝড় বইয়ে দিলেন তার নির্গলিতার্থ: তিনি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানেন না—তাঁর পুত্রের নির্দেশ আছে, ব্যারিস্টার বাসুর ফোন এলে ঐ অদ্ভুত নাম্বারটা তাঁকে শুধু শুনিয়ে দিতে হবে। কেন, কি বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানেন না। ঐ সঙ্গে আরও বললেন —এসব হচ্ছে ঐ 'জিরো-জিরো-সেবুন' মার্কা পিকচারের কুফল! তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বর্তমানে জেম্‌স্ বণ্ডের ভূমিকায় না-পাত্তা হয়ে গেছেন। ফলে তাঁর মন-মেজাজ খারাপ। নিজেকেই গদিতে বসতে হচ্ছে! তাঁকে যেন এ নিয়ে আর বিরক্ত করা না হয়। পুনরায় রাম-নামের দ্বিত্বপ্রয়োগান্তে তিনি দূরভাষণে ক্ষান্ত হলেন।

কৌশিক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল। বেলা বারোটা। এখনই বার হলে মধ্যাহ্ন-অবকাশের মধ্যে বাসু-সাহেবকে খবরগুলো জানানো যায়। সে তৎক্ষণাৎ একটা ট্যাক্সি নিয়ে আদালতের দিকে রওনা দেয়।

সাত

আদালতের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই কৌশিকের সঙ্গে বাসু-সাহেবের দেখা হল। ওর কাছে আদ্যোপান্ত শুনে উনি তখনই গিয়ে দেখা করলেন আসামী সুপ্রিয়র সঙ্গে। বললেন, তুমি কি সখ করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে চাও?

লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

—এগারো তারিখ রাত্রে খোকাখোতে তুমি আর যদুপতি খেতে গিয়েছিলে —তাহলে কেন বললে জীবন বিশ্বাসও তোমাদের সঙ্গে ছিল।

—সুপ্রিয় চোখটা নিচু করে বলল, জীবনই এ পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল, যদুপতি কিছুতেই সাক্ষী দিতে আসবে না। জীবন ছাড়া আর কে আমার অ্যালেবাঈটা প্রতিষ্ঠিত করবে?

—তাই বলে তোমাদের কাউন্সেলকেও তোমরা জানবে না যে, মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছ?

—আমি জানতাম আপনি এতে রাজী হবেন না!

—হব না তো বটেই! জীবনকে নতুন করে তালিম দিতে হবে; তাছাড়া ঐ সুকুমারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলে সেটা এতক্ষণ স্বীকার করনি কেন?

সুপ্রিয় মাথা নিচু করে বসে রইল।

—ওর ক্যাশে কত টাকা আছে তা টেলিফোনে জানতে চেয়েছিলে?

মাথা নেড়ে সায় দিল সুপ্রিয়। অস্ফুটে বলল, পরদিন ছিল গুডফ্রাইডের ছুটি। ব্যাঙ্কের ভল্ট বন্ধ। সেই অজুহাতে দু'-লাখ টাকা নগদ নিতে জৈন-সাহেব রাজী হবে না আমার এই আশঙ্কা ছিল। অথচ ঐ গুডফ্রাইডের রাতের ট্রেনেই আমাদের টিকিট কাটা ছিল। তার উপর যদি জৈন-সাহেবের ক্যাশে আগে থেকেই মোটা টাকা থেকে থাকে তাহলে ছুটির দিন তিনি হয়তো মুশ্‌কিলে পড়বেন। তাই আমি জানতে চেয়েছিলাম।

বাসু-সাহেব ধমকে ওঠেন, বেশ করেছিলে! কিন্তু আমাকে বলনি কেন?

সুপ্রিয় অধোবদনে বসেই রইল।

—বোম্বাইয়ে তোমার স্ত্রীকে চিঠি লিখেছ?

নেতিবাচক শিরশ্চালন করল সুপ্রিয়।

—তোমার স্ত্রী আজ-কালের মধ্যেই আসছে।

একেবারে শিউরে উঠল সুপ্রিয়, সর্বনাশ! তার নাম-ঠিকানা কেমন করে পেলেন আপনি?

—সেটা পরের কথা। সর্বনাশ কেন?

—ও ভয়ানক নার্ভাস! সে আপনি বুঝবেন না। জীবনকে একবার আমার কাছে আনতে পারবেন?

বাসু-সাহেব বললেন, অসম্ভব! তোমার উকিল ছাড়া আর কারও সঙ্গে এ অবস্থায় তোমাকে দেখা করতে দেবে না। তোমার স্ত্রী এলে, হয়তো দিতে পারে।

ঠিক এই সময়েই প্রহরী এসে জানালো—আদালত এবার বসবে। বাসু-সাহেব ফিরে এলেন। কোর্টে গিয়ে বসলেন। প্রদ্যোৎকে বললেন, জীবনকে ডাক তো?

জীবন গরুড়পক্ষীর মত হাত দুটি জোড় করে এসে দাঁড়ায়। বাসু বলেন, তোমাকে এখনই সাক্ষী দিতে ডাকব। মোকাম্বোতে তুমি ঐ রাত্রে সুপ্রিয়র সঙ্গে খেয়েছ এ মিথ্যা কথা বলবে না, বুঝলে?

মাথা চুলকে জীবন বলে, ঐটেই আমাদের একমাত্র ভরসা স্যার! অকাট্য অ্যালিবি!

ধমক দিয়ে ওঠেন বাসু, বেশি পণ্ডিত্যেমি কর না। মিথ্যে সাক্ষী তোমাকে দিতে হবে না।

—কিন্তু স্যার আমি যে থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে বসে আছি।

—সেটা অন্য জিনিস। থানায় মিথ্যে এজাহার দেওয়া, আর আদালতে হলপ নিয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।

জীবনবাবু বলে, আপনি মিছে ডরাচ্ছেন স্যার। ঐ মাইতির বাবার ক্ষমতা হবে না—জেরায় আমাকে কাৎ করে! আমি মোকাম্বোতে ঢুকে সব খুঁটিয়ে দেখে এসেছি কাল সন্ধ্যাবেলায়।

বাসু-সাহেব আর কিছু বলবার সুযোগ পেলেন না। জাস্টিস ভাদুড়ী পুনরায় বিচারারম্ভ ঘোষণা করলেন। বাদীপক্ষের সাক্ষ্য নেওয়া শেষ হয়নি। সাক্ষ্য দিতে উঠলেন ইস্টার্ণ রেলওয়ের স্টাফ—বোম্বাই মেল-এর কণ্ডাকটার-গার্ড হেমন্ত মজুমদার। মাইতি সাহেবের প্রশ্নে তিনি গুডফ্রাইডের সন্ধ্যায় বোম্বাই মেল-এর সি-নং কুপেতে যে ঘটনা ঘটেছিল তার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলেন। সুজাতা ফিরে এসে যা বলেছিল হুবহু তাই।

বাসু তাঁকে কোন জেরা করলেন না।

পরবর্তী সাক্ষী নেপালচন্দ্র বসু। জি. আর. পি.-র ইন্সপেক্টার। তিনিও

তাঁর সাক্ষ্যে ঐ ঘটনার পাদপূরণ করলেন। বাসু-সাহেব তাঁকে ক্রশ এগজামিনে প্রশ্ন করলেন, মিস্টার বোস, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাগটা আপনার ?' আর আসামী বলল, 'হুঁ' তখন সে কি ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল ?

—না, দেখেনি, কিন্তু তার পূর্বমুহূর্তে যখন সুজাতা বললেন, ও ব্যাগটা আমার নয়, তখন সে ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

—আপনার কি মনে হয় সেটা 'ভেকেন্ট লুক'—মানে সে অন্য কথা ভাবতে ভাবতে ঐদিকে তাকিয়ে ছিল।

—অবজেকশান ! সাক্ষী কি মনে করেছিল তা আমরা শুনতে চাই না ! —মাইতির কণ্ঠস্বর।

—অবজেকশান সাসটেণ্ড—জজসাহেবের নির্দেশ।

—বেশ, দ্বিতীয়বার যখন আপনি প্রশ্ন করেন তখন ও অস্বীকার করেছিল ? বলেছিল, ব্যাগটা ওর নয় ?

—হ্যাঁ, তাই বলেছিল।

—তখনও তো আপনি রিভলভারটা ব্যাগ থেকে বার করে দেখাননি ?

—না।

—তার মানে আসামী তখনও জানত না যে, ব্যাগের ভিতর কি আছে ?

—তা কেন ? আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন যে, ব্যাগটা সে নিজেই সঙ্গে করে আনেনি ?

—আপনি কি তাই ধরে নিতে চান ?

—কেন নয় ?

—'কেন নয়', আমার প্রশ্নের জবাব নয়। আমার প্রশ্ন 'আপনি কি তাই ধরে নিতে চান', ইয়েস অর নো।

—ইয়েস !

—আপনি কি এখনই এটা ভাবছেন, না প্রথম থেকেই ওটা ধরে নিয়েছেন।

—প্রথম থেকেই !

—তাই বলুন। তার মানে ব্যাগটা যে আসামীর এই রকম একটা পূর্ব-সিদ্ধান্ত প্রথম থেকে ধরে নিয়ে আপনি সাক্ষী দিতে এসেছেন ? যা দেখেছেন তা বলছেন না, যা আপনার প্রথম থেকে ধরে নেওয়া পূর্ব-সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে যায় তাই সাক্ষী দিচ্ছেন।

—কী আশ্চর্য ! আমি কি তাই বলেছি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ঠিক তাই বলেছেন !—দ্যাটস্ অল্ মি' লর্ড !

সরকার পক্ষের সাক্ষী এখানেই শেষ।

প্রতিবাদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী মিসেস্ সুজাতা মিত্র।

হলপ নিয়ে সাক্ষ্য দিতে উঠল সুজাতা। বাসু-সাহেব প্রশ্নের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন, সুজাতা ঐ সি-চিহ্নিত ফ্ল্যাটে প্রথম প্রবেশ করে। বন্ধ দরজা খুলেই সে দেখতে পায় একজন স্যুটপরা ভদ্রলোককে। তাঁর সঙ্গে সুজাতার কী কথা হয়েছিল তা নথিবদ্ধ করা হল। ভদ্রলোকের চলে যাওয়ার সময় ব্যাগ রেখে যাওয়ার কথাও সুজাতা বলল এবং বলল—সুপ্রিয় কামরায় ঢুকেই প্রথম প্রশ্ন করেছিল, ব্যাগটা আপনার?

মাইতি জেরা করতে উঠলেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন, আপনি কোথায় থাকেন সুজাতা দেবী?

সুজাতা তার ঠিকানা দিল।

—ঐ বাড়িতে এ মামলার প্রতিবাদ ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুও থাকেন না?

—হ্যাঁ, থাকেন।

—আপনি যে ডিটেক্‌টিভ প্রতিষ্ঠানের পার্টনার তার সঙ্গে ঐ ব্যারিস্টার সাহেবের একটা পার্সেণ্টেজ ব্যবস্থা আছে, না? কমিশানের ব্যবস্থা?

—আছে!

—অর্থাৎ এ মামলায় বাসু-সাহেব যা ফি পাবেন তার একটা অংশ আপনারও জুটবে, কেমন?

সুজাতার মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

—বলুন, বলুন, লজ্জা পাচ্ছেন কেন? এ মামলা বাবদ কমিশান পাবেন না?

—পাব।

—তার মানে এ মামলায় বাসু-সাহেব জিতুন এই আপনি চান?

—না। আমি চাই সত্যের জয় হোক!

—চমৎকার। আর্থিক লোকসান করেও?

—ওঁর কেস জেতা-হারার সঙ্গে আমাদের কমিশানের কোনও সম্পর্ক নেই। উনি 'স্পেসিফিক জব' দেন, 'স্পেসিফায়েড ফি' দেন। হারলেও দেন, জিতলেও দেন।

—তাই বুঝি? আচ্ছা সুজাতা দেবী আপনি নিজে কখনও ঐ 320-ধারায় আসামী হয়েছিলেন? খুনের মামলায়?

—না।

—না? কিন্তু আমি যদি প্রমাণ করতে পারি—

—উকিল হিসাবে আপনার জানা উচিত সে-ক্ষেত্রে আপনি আমার বিরুদ্ধে

পার্জারির মামলা আনতে পারেন। যেমন আপনার জানা উচিত আদালতের বাইরে ওকথা বললে আপনার বিরুদ্ধে আমি মানহানির মামলা আনতে পারি।—সুজাতার দৃপ্ত জবাব।

মাইতি চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললেন, রামচন্দ্রপুরের ময়ূরকেতন আগরওয়াল হত্যা-মামলায় আপনি খুনের মামলায় আসামী ছিলেন না?

—না! আমার বিরুদ্ধে কোন চার্জ ফ্রেম করার আগেই প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে। আমার বিরুদ্ধে খুনের মামলা তো ছাড়, আদৌ কোনও চার্জ ফ্রেম করা হয়নি!

—কিন্তু আপনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তো?

—বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ান, এনাফ অব ইট! অবজেকশান য়োর অনার। এ-সব প্রশ্নের সঙ্গে বর্তমান মামলার কোন সম্পর্ক নেই। অনেক আগেই আমি আপত্তি করতাম—করিনি এজন্য যে, ভেবেছিলাম—মাননীয় সহযোগীর যে-কোন মুহূর্তে মনে পড়ে যাবে যে, সে মামলায় প্রকৃত আসামীকে গ্রেপ্তার না করে তিনি ক্রমাগত রাম-শ্যাম-যদুকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। উনি সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'লজ্জা পাচ্ছেন কেন?' তাই ভেবেছিলাম, সে-সব কথা মনে পড়ে গেলে উনি নিজেই লজ্জায় থেমে যাবেন। কিন্তু উনি থামছেন না মি' লর্ড!

জাস্টিস ভাদুড়ী সংক্ষেপে শুধু বলেন, অবজেকশান সাসটেইনড। আপনি অন্য প্রশ্ন করুন।

—আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই—বসে পড়েন নিরঞ্জন মাইতি।

এরপর সাক্ষী দিতে এলেন জীবন বিশ্বাস।

এগারো তারিখের প্রসঙ্গ আসামাত্র সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জানিয়ে দিল ঐ দিন সন্ধ্যায় সে, আসামী এবং তৃতীয় একজনের সঙ্গে মোকাম্বোতে নৈশ-আহার করেছে।

বাসু-সাহেবের মুখচোখ রাগে লাল হয়ে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ সওয়াল বন্ধ করে বললেন, 'দ্যাটস্ অল্ মি' লর্ড।

মাইতি ডাইরেক্ট এভিডেন্সের সূত্রটি তুলে নিয়ে বললেন, জীবনে কতবার মোকাম্বোতে খেয়েছেন, জীবনবাবু?

—ঐ একবারই স্যার।

—ঐ এগারোই তারিখ রাত্রেই, জীবনে একবার?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—তার পরে গতকাল আপনি মোকাম্বোতে যাননি? সন্ধ্যা সাতটা পাঁচে?

জীবনবাবুর চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ে।

—বলুন, বলুন—আমি আপনার টনসিল দেখতে চাইছি না।

কোর্টে হাস্যরোল উঠল।

ঢোক গিলে জীবন বিশ্বাস বলে, গিয়েছিলাম স্যার।

—কেন গিয়েছিলেন? হোটেলের ভিতরটা দেখে আসতে? যাতে জেরায় আপনার ঐ অ্যালেবাইটা ফেঁসে না যায়?

সামলে নিয়েছে জীবন। বললে, আজ্ঞে না, আমি দেখতে গিয়েছিলাম যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া ওখানে আছেন কিনা। সেই মর্মে একটা খবর পেয়েছিলাম।

—তাই বুঝি। তাহলে মিথ্যা কথা বললেন কেন? জীবনে একবার মাত্র মোকাম্বোতে গিয়েছিলেন।

জীবন বলে, আপনি আমার মুখে নিজের ইচ্ছে মত কথা বসাবেন না স্যার।

ভ্রূকুঞ্চিত করে মাইতি বলেন, তার মানে! আপনি ও কথা বলেননি?

জীবন এতক্ষণে বেশ সহজ হয়েছে। বললে, আজ্ঞে না। আপনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'জীবনে কতবার মোকাম্বোতে খেয়েছেন, জীবনবাবু?' তাতে আমি বলেছিলাম, 'ঐ একবারই স্যার'। কাল সন্ধ্যায় আমি মোকাম্বোতে খাইনি কিন্তু!

একটা মোক্ষম আণ্ডারকাট সাক্ষী অতি সুন্দরভাবে এড়িয়ে গেল সেটা এতক্ষণে অনুধাবন করলেন নিরঞ্জন মাইতি. জীবন বিশ্বাসের পিছনে টিকটিকি লাগিয়ে এমন সুন্দর একটা সূত্র আবিষ্কার করলেন, কিন্তু লোকটা পিছলে গেল। জীবন হাসি হাসি মুখে বললে, আমিও স্যার আপনার টনসিল দেখতে চাইছি না। বিশ্বাস না হয় পেশকারবাবুকে শুধোন!

প্রচণ্ড হাস্যরোল উঠল আদালতে।

জোরে হাতুড়িটা ঠুকলেন জাস্টিস্ ভাদুড়ী। দর্শকদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা যদি আদালতের কাজে বাধা দেন তাহলে আমি আদালত ফাঁকা করে দিতে বাধ্য হব।

তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধতা ফিরে এল কোর্ট-রুমে। সাক্ষীর দিকে ফিরে জাস্টিস্ বললেন, আপনি বাজে কথা বলবেন না একদম।

হাত দুটি জোড় করে জীবন বিশ্বাস বললে, টনসিলের কথাটা কিন্তু হুজুর আমি আগে তুলিনি।

—স্টপ ইট! যু মে প্রসীড।

মাইতি পুনরায় শুরু করেন, কি খেয়েছিলেন আপনারা?

—বিরিয়ানি পোলাও, তন্দুরি চিকেন, ফ্রায়েড প্রণ, সুইট অ্যাণ্ড সাওয়ার। ও ভুলে গেছি স্যার—তার আগে আমি খেয়েছিলাম চিকেন স্যুপ আর ডিনার রোল। সব শেষে কুলফি!

—সবাই তাই খেয়েছিলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাগ করে। ওঁরা দুজন স্যুপ খাননি।

—ড্রিংকস্ নেননি?

মাথা চুলকে জীবন বিশ্বাস বললে, আজ্ঞে আমি খাইনি স্যার। ছাঁ-পোষা মানুষ, ওসব আমার পোষায় না। আমি স্যুপ খেয়েছিলাম শুধু।

—আর ওঁরা দুজন?

ওঁরা এক এক পেগ চড়িয়ে ছিলেন!

বাসু-সাহেব দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন, ঈডিয়ট!

মাইতিও স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছেন। বড়শি-ছেঁড়া মাছটা আবার টোপ গিলেছে। এখন খেলিয়ে তুলতে হবে। বললেন, মাত্র এক এক পেগ?

—আজ্ঞে হাঁ স্যার!

—কী খেয়েছিলেন ওঁরা জানেন? না কি মদের নামও জানেন না আপনি?

প্রদ্যোৎ বাসু-সাহেবের কানে কানে বললে—অবজেকশান দিন! মামলার সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক।

বাসু-সাহেব বললেন, ও আমার মক্কেল নয়! লোকটা আত্মহত্যা করছে। করুক, আমার কি?

ব্যারিস্টার রে-সাহেব অস্ফুটে বললেন, ট্রু!

—কেন? বে-ফাঁস কি বলল ও?—প্রশ্ন করে প্রদ্যোৎ।

ব্যারিস্টার রে অস্ফুটে বললেন, ডোণ্ট ফলো ইয়াং ম্যান? ঘটনাটা গুডফ্রাইডের আগের সন্ধ্যা।

প্রদ্যোৎ হালে পানি পায় না। ওদিকে আরও কয়েকটি প্রশ্নোত্তর হয়ে গেছে। মাইতি তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি করে বুঝলেন ইনি ব্ল্যাক-নাইট হুইস্কি খেলেন, আর উনি জিন-উইথ-লাইম? একটু পরখ করে দেখে-ছিলেন নাকি?

জীবন বিশ্বাস একগাল হেসে বললে, আজ্ঞে না স্যার! আমার সামনে অর্ডার দিলেন, বিল মেটালেন, আমি জানব না?

—তা তো বটেই। তাহলে আপনি নিঃসন্দেহ যে, আসামী সে-রাত্রে জিন-উইথ-লাইম আর মিস্টার যদুপতি সিজ্ঞানিয়া ব্ল্যাক-নাইট হুইস্কি খেয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মাইতি হেসে বলেন, এবার বলুন তো বিশ্বাস মশাই, 'পার্জারি' মানে কি ?

—আজ্ঞে, আমি জানি না। জোলাপ নেওয়া বোধহয়।

—কিন্তু এটা তো জানেন যে, সেটা ছিল গুডফ্রাইডের আগের সন্ধ্যা।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। তা জানি বইকি।

—সেদিন কি বার ছিল ?

—বৃহস্পতিবার।

—ক'লকাতার কোন খানদানি দোকানে বৃহস্পতিবার মদ বিক্রি হয় ?

টনসিলের প্রশ্নটা মাইতি আবার তুলতে পারতেন। তা কিন্তু তুললেন না তিনি। বললেন, আপনি আগাগোড়া মিছে কথা বলেছেন! মোকাম্বোতে আপনি ঐ দিন আদৌ যাননি এবং সেখানে ঐ আসামীর সঙ্গে খানা খাননি! বলুন!, স্বীকার করুন!

জীবন হাত দুটি জোড় করে বললে, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি যাইনি। কিন্তু ওঁরা দুজন গিয়েছিলেন! ঐ সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ওঁরা ওখানে ছিলেন!

—দ্যাটস্ অল মি' লর্ড!—মাইতি আসন গ্রহণ করেন। তৎক্ষণাৎ একজন সাব ইন্সপেক্টার তাঁর কানে কানে কি যেন বলে। উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন মাইতি। উঠে দাঁড়িয়ে জজ-সাহেবকে একটি সাড়ম্বর 'বাও' করে বলেন, আদালত যদি অনুমতি করেন, তবে আমি একটি নিবেদন করতে চাই। এই মাত্র ইনভেস্টিগেটিং অফিসার আমাকে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ পেশ করেছেন—যা এই মামলায় সত্য নির্ধারণে প্রভূতভাবে সাহায্য করবে। বস্তুত গত এক সপ্তাহ ধরেই আমরা অনুসন্ধান কার্য চালাচ্ছিলাম—চূড়ান্ত তথ্য এইমাত্র জানা গেছে। আদালত অনুমতি করলে আমি আর একজন সাক্ষীকে প্রসিকিউশানের তরফে সাক্ষ্য দিতে ডাকতে পারি।

জজ সাহেব বলেন, আদালত এটা পছন্দ করেন না। বাদীপক্ষ সম্পূর্ণ-ভাবে প্রস্তুত না হয়ে মামলায় 'ডেট' নিলেন কেন? বিবাদী পক্ষের সাক্ষী নেওয়া হয়ে গেছে, এখন, ওয়েল—আমি রুলিং দেবার আগে জানতে চাই এ বিষয়ে প্রতিবাদীর কাউন্সেল কি বলেন ?

বাসু বলেন, সত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ক এটাই আমরা চাই। আমাদের আপত্তি নেই।

মাইতির আহ্বানে অতঃপর সাক্ষ্য দিতে উঠে দাঁড়ালেন সি. বি. আই.-এর ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্ট মিস্টার এম. পাণ্ডে। মাইতি খুশিতে ডগমগ। প্রশ্ন

করেন, মিস্টার পাণ্ডে, আপনি ফিঙ্গার-প্রিন্ট এক্সপার্ট হিসাবে কোথায় ট্রেনিং নিয়েছেন? কতদিনের?

—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। দু' বছরের।

—আপনাকে গত বারই এপ্রিল আসামীর একটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট দিয়ে অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছিল কি?

—হয়েছিল।

আসামীর সেই ফিঙ্গার-প্রিন্টটি কি আপনি দয়া করে আমাদের দেখাবেন?

সাক্ষী তাঁর ব্যাগ খুলে নম্বর দেওয়া একটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট বার করে দিলেন। মাইতি সেটি আদালতে নথিভুক্ত করলেন—"এফ-পি-ওয়ান" রূপে। তারপর বললেন, এবার আপনার তদন্তের ফলাফল বলুন।

সাক্ষী জবাবে বললেন যে, তিনি লালবাজার ফিঙ্গার-প্রিন্ট লাইব্রেরীতে বসে গত চার-পাঁচদিন ঐটা মেলাবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যান। গত পনের তারিখে তাঁর সন্দেহ হয়, একজন দাগী আসামীর সঙ্গে ফিঙ্গার-প্রিন্টটি মিলে যাচ্ছে। দাগী আসামীর নাম লালু, ওরফে খোকন। সে বহরমপুরের একটি ডাকাতি কেসে ইতিপূর্বে ধরা পড়েছিল আরও সাতজনের সঙ্গে। তাদের ভিতর পাঁচ জনের মেয়াদ হয়—দুজন যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে ছাড়া পায়। সেই দুজনের ভিতর একজন ঐ খোকন ওরফে লালু। ঘটনা ছয় মাস আগেকার। সাক্ষী ঐ দিনই বহরমপুরে চলে যান। সেখানকার থানায় রাখা ফিঙ্গার-প্রিন্ট-এর সঙ্গে ঐ 'এফ-পি ওয়ান' ছাপটি মিলিয়ে দেখেন। দেখে নিঃসন্দেহ হন যে, বর্তমান মামলার আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্ত আর খোকন ওরফে লালু অভিন্ন ব্যক্তি!

মাইতি প্রশ্ন করেন, বহরমপুর থানা থেকে কী খবর পেলেন? সেই লালু ওরফে খোকন বর্তমানে কোথায়?

—ওঁরা তা বলতে পারলেন না। আজ ছয় সাতমাস সে বহরমপুর যায়নি।

—তাহলে আপনি নিঃসন্দেহ যে, খোকন ওরফে লালুই হচ্ছে ঐ আসামী সুপ্রিয়?

—হ্যাঁ, আমি নিঃসন্দেহ!

—আচ্ছা এমনও হতে পারে যে দুটো ফিঙ্গার-প্রিন্ট হুবহু মিলে গেল, অথচ পরে দেখা গেল সে দুটো বিভিন্ন লোকের?

—না, তা হতে পারে না!

—এমন রেকর্ড কোথাও নেই?

—না নেই।

—কিন্তু 'আনব্রোকন রেকর্ড'ও ক্ষেত্র বিশেষে তো 'ব্রোকন' হয়?

—সাক্ষী ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন, আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না?

—পারছেন না? আচ্ছা, আমি একটা উদাহরণ দিই,—হয়তো বুঝবেন কি বলতে চাইছি—ধরুন আজ আমি বিশ বছর ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে প্র্যাকটিস করছি এবং এই বিশ বছরের ভিতর আমার কোনও মক্কেলের কখনও 'কনভিকশন' হয়নি। তখন হয়তো আমি বড়াই করে বলতে পারি, এটা হচ্ছে 'আনব্রোকন রেকর্ড'! এ রেকর্ড কখনও ভাঙা যায়নি, ভাঙা যাবে না!

পাণ্ডে সাহেব ক'লকাতার লোক নন। প্রশ্নটার তীব্র ব্যঙ্গের মর্মোদ্ধার করতে পারলেন না। সহজভাবে বলে ওঠেন, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই! সমস্ত দুনিয়া মেনে নিয়েছে দুটি মানুষের কখনও হুবহু এক রকম ফিঙ্গার-প্রিণ্ট হতে পারে না।

প্রদ্যোৎ লক্ষ্য করে দেখে বাসু-সাহেব একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আসামীর দিকে! যে লোকটাকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছেন, এখন যেন তাকেই খুন করতে চান উনি! তার পরেই প্রদ্যোতের নজর পড়ল বাসু-সাহেবের পাশের চেয়ারখানায়। সেটা ফাঁকা। বৃদ্ধ ব্যারিস্টার এ. কে. রে কখন নিঃশব্দে উঠে চলে গেছেন।

মাইতি একেবারে বিনয়ের অবতার। ঝুঁকে পড়ে বাসুকে বলেন, য়ু মে ক্রশ এক্সামিন হিম, ইফ য়ু প্লীজ!

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। আদালত কর্ণময়। বার এ্যাসোসিয়েশানের অনেকেই এসেছে আজ। এমন অবস্থায় বাসু-সাহেবকে কেউ কখনও দেখেনি। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। বাসু-সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, সহযোগী পাবলিক প্রসিকিউটার যে বারো তারিখ থেকে এ জাতীয় অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন সে খবরটা তিনি এতাবৎকাল আদালতকে জানাননি। বস্তুত তদন্ত শেষ না করে মামলায় উপস্থিত হওয়াই যে তাঁর পক্ষে উচিত হয়নি একথা মহামান্য আদালত ইতিপূর্বেই বলেছেন। সে যাই হোক, আমরা এ তথ্য এইমাত্র শুনলাম। তাই প্রতিবাদী পক্ষ আদালতের কাছে কিছু সময় চাইছেন।

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত। প্রতিবাদী আগামী কাল জেরা করবেন।

নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই আদালত বন্ধ হয়ে গেল।

বাসু-সাহেবের গরম লাগছিল। গাউনটা খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিলেন। চকিতে তাকিয়ে দেখলেন পাশের চেয়ারখানার দিকে। সেটা ফাঁকা। ধীর পদে আদালত ছেড়ে বার হয়ে এলেন। পিছন পিছন এল সুজাতা। প্রদ্যোৎ ক্ষ

বলে পারল না—সুপ্রিয়র সঙ্গে একবার দেখা করবেন না স্যার ?

—নো ! হি ইজ্ এ ডাউন-রাইট ড্যামনেড্ লায়ার ! এক নম্বর মিথ্যাবাদী !

—কিন্তু যদুপতি সিঙ্ঘানিয়া তাহলে কেন ওকে—

—যদুপতি কিছু যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা নয় ! একটা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার ! এমনও হতে পারে ঐ খোকন ওরফে লালু—অর্থাৎ সুপ্রিয়, ওর পোষা গুণ্ডা ! পাপের সাথী !

কোর্ট থেকে ফিরে এলেন ওঁরা।

আট

বাড়িতে যখন এসে পৌছালেন তখন বিকাল সাড়ে পাঁচটা। গাড়ি থেকে নেমে উনি ধীরে ধীরে ঢুকে গেলেন নিজের চেম্বারে। অন্যদিন সচরাচর প্রথমেই গিয়ে রানীর সঙ্গে দেখা করেন। দু-চারটে খোশ-গল্প করতে-করতেই এক কাপ কফি খান। তারপর স্নান করেন, এবং তারপর নিজের চেম্বারে গিয়ে বসেন। পিছনে থাক-দেওয়া আইনের বই—নিচেকার লকারে থাকে লিকার-গ্লাস। বিশু রেখে যায় বরফের কুচির প্লেট। রাত নটায় ডিনার। কিন্তু তারপর আবার শুরু হয় পড়াশুনা। আবার গিয়ে বসেন চেম্বারে—তখন আর মদ্যপান করেন না। কচিৎ কোনদিন হয়তো একটা ড্রাই মার্টিনী খেলেন—সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কখন শুতে যাবেন সেটা নির্ভর করে পরদিনের মামলাটার গুরুত্বের উপর—অথবা হয়তো নির্ভর করে কতক্ষণে একটা চাকা দেওয়া চেয়ার এসে থামবে ঐ চেম্বারের দ্বারপথে। শোনা যাবে প্রশ্ন, রাত অনেক হল যে, শোবে না ?

আজ তার ব্যতিক্রম হল। বাসু স্নান করলেন না, কফি খেলেন না। রানী দেবীর সঙ্গে দুটো হাল্কা-রসিকতাও করলেন না। এমনকি জামা জুতো পর্যন্ত ছাড়লেন না। ঢুকে গেলেন চেম্বারে।

মিনিট দশেক পরে ইণ্টারকমটা সাড়া দিয়ে উঠল। কাচের গব্‌লেটটা সরিয়ে রেখে বাসু সুইচ টিপে বললেন, বল, শুনছি।

—কফি খাবে না ? ভিতরে আসবে না ?

—আসব রাণু—ভিতরে আসব বই কি। একটু পরে—

—শোন, ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার হয়েছে। একটু আগে সুবর্ণ এসেছে—

চম্‌কে উঠলেন বাসু। অস্বাভাবিকভাবে। হয়তো আনমনা ছিলেন, কিম্বা অত্যন্ত দ্রুত মদটা খাচ্ছিলেন—প্রায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, কে ? কে এসেছে বললে ?

—ঐ সুপ্রিয়ের স্ত্রী। যাকে আসতে বলেছিলে তুমি—

—হ্যাঁ, কিন্তু কী নাম বললে তার ?

বেদনাহত কণ্ঠ ভেসে এল রানী দেবীর, হ্যাঁ, ঐ নামই ! আশ্চর্য কোয়েন্সিডেন্স নয় ?

দুজনেই নীরব। প্রায় আধ মিনিট। শেষে রানী বললেন, আমি ও-ঘরে আসব ?

—তাই এস। আমি ঐ মেয়েটার সামনে দাঁড়াতে ··তুমি চলে এস—

নিতান্ত কাকতালীয় ব্যাপার। বছর সাতেক আগে ম্যাসানজোর বাঁধ দেখতে গিয়ে পথ-দুর্ঘটনায় বাসু-সাহেবের যে মেয়েটি মারা যায় তার নাম এবং ঐ দাগী আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্তের স্ত্রীর নাম অভিন্ন। দুজনেই সুবর্ণ!

একটু পরে চেম্বারের দরজাটা খুলে গেল। চাকা-দেওয়া চেয়ারে এসে উপস্থিত হলেন মিসেস বাসু। বললেন, সুজাতার কাছে সব শুনলাম। আজকে মামলার খবর।—একটু থেমে আবার বলেন, ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না, নয় ?

অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন বাসুসাহেব।

দুজনেই কিছুটা নীরব। তারপর বাসু বললেন, তুমি যা ভাবছ তা নয় রাণু। আমার আনব্রোকন রেকর্ড আজ ভেঙে যাচ্ছে বলে ভেঙে পড়িনি আমি। আফটার অল, হোয়াট্স দ্যাট আনব্রোকন রেকর্ড ? মীয়ার চান্স! আমি বরাবর জিতেছি। কেন জিতেছি ? আমার বাকপটুতার জন্যে ? বুদ্ধির জন্যে ? আইন জ্ঞানের জন্যে ? না! নিতান্ত কোয়েন্সিডেন্স। ঘটনাচক্রে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সত্য ছিল আমার পক্ষে। আমি যাদের হয়ে লড়েছি তারা প্রতি ক্ষেত্রেই ছিল নির্দোষ ! হ্যাঁ, একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে—তোমার মনে আছে নিশ্চয়। সেই মারোয়াড়ি ছেলেটার কেস—যে তার বাপকে খুন করেছিল। কিন্তু আমি যখন তার কেস লড়েছিলাম তখন আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলাম তার কথায়—যে, সে নির্দোষ! সেও বেকসুর খালাস হয়েছিল। খালাস পাবার পর আনন্দের আতিশয্যে সে এসে আমার কাছে স্বীকার করেছিল—সে নিজেই তার বাপকে খুন করেছে !

রানী বললেন, মনে আছে আমার। তারপরে বহুদিন তুমি কোর্টে যাওনি।

—সেবার তবু একটা সান্ত্বনা ছিল রানী—আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলাম যে, ছেলেটা নির্দোষ! বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার ছিলাম। কিন্তু এবার ? এবার যে আমি নিজেই বুঝতে পারছি লোকটা একটা পাকা ক্রিমিনাল!

—সন্দেহের কোন অবকাশ নেই ?

—থাকলে এভাবে ভেঙে পড়ি আমি ? আগামীকাল জীবনে প্রথম কোর্ট থেকে হেরে ফিরব—সেজন্য আমার কোন দুঃখ নেই। অতটা আত্মকেন্দ্রিক নই আমি। কোর্ট থেকে ফেরার কথা ভাবছি না আমি। কোর্টে যাবার কথাই ভাবছি। লোকটা দোষী জেনেও কেমন করে তার পক্ষে সওয়াল করব ? সেখানেই যে আমার সত্যিকারের আনব্রোকন রেকর্ড সজ্ঞানে ভাঙব আমি।

—উপায় কি বল ? এ অবস্থায় কি তুমি আইনত ওর পক্ষ ত্যাগ করতে পার ?

—পারি ! আইনত পারি—প্রফেশনাল এথিক্সে পারি না। সমস্ত বার-এ্যাসোসিয়েশান একবাক্যে বলবে—নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে বাসু-সাহেব পালিয়ে গেল !

—ওরা আসল কথাটা বুঝবে না ?

—কেমন করে বুঝবে রাণু ? তুমি ওদের সাইকলজিটা দেখছ না ? ওদের সবারই একবার না একবার লেজ কাটা গেছে ! দল-ছুট এই লাঙ্গুল-যুক্ত শৃগালটিকে কেমন করে ওরা ক্ষমা করতে পারবে ? আর তাছাড়া কথাটাও তো ঠিক ! নিশ্চিত পরাজয় এড়াতে সবাই যদি এমনভাবে সরে দাঁড়ায় তবে মক্কেলরা কোথায় দাঁড়াবে ?

—মিঠুর সঙ্গে দেখা করবে না ?

—মিঠু !—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান বাসু-সাহেব !

অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে যান রানী দেবী, না, না। ওটা আমারই ভুল ! ওর নাম মিঠু নয়। ওর···ওর ডাক নাম আমি জানি না ! আমার···আমার···

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই মুখে আঁচল চাপা দিলেন রানী বাসু।

অনেক অনেক দিন পর ঐ দুটো নাম—'সুবর্ণ' আর 'মিঠু' এ বাড়িতে উচ্চারিত হল। বাসু-সাহেব বুঝতে পারেন—রানী অজান্তে ঐ নামের সাযুজ্য ধরে অজানা অচেনা মেয়েটাকে আপন করে নিয়েছে। তাই সুপ্রিয় দাসগুপ্তের স্ত্রী সুবর্ণ হঠাৎ 'মিঠু'ও হয়ে গেছে তাঁর কাছে। বাসু উঠে এসে ওঁর পিঠে একটা হাত রাখেন। রানী ততক্ষণে সামলেছেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চল, ভিতরে যাই।

সুপ্রিয় বলেছিল তার স্ত্রী নার্ভাস প্রকৃতির। কিন্তু তেমন কিছু নার্ভাস প্রকৃতির বলে মনে হল না বাসু-সাহেবের। এমন দুঃসংবাদ আচমকা পেলে সবাই কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়ে। তার বেশি কিছু নয়। সে নিজেই চলে

এসেছে। প্লেনে নয়, ট্রেনেই। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে একেবারে নিউ আলিপুরে। বাসু-সাহেব ওকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিলেন। ওঁদের মেয়ে সুবর্ণ মারা গেছে সাত বছর আগে। তখন তার বয়স ছিল আট-নয়—অর্থাৎ থাকলে আজ সেই সুবর্ণের বয়স হত ষোলো। এ মেয়েটি ষোড়শী নয়। বছর বাইশ বয়স ওর। দুই সুবর্ণের আকৃতিগত পার্থক্যও যথেষ্ট। সে ছিল ফর্সা, এ শ্যামলা। সে ছিল রোগা একহারা, এ দোহারা, স্বাস্থ্যবতী। একমাত্র নাম-সাযুজ্য ছাড়া আর কোনও সাদৃশ্য নেই!

না! ভুল হল! আর একটা সাদৃশ্য আছে! সেই সুবর্ণের মাথা লক্ষ্য করে যখন এক নিষ্ঠুর অলক্ষ্যচারী বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন তখন বাসু-সাহেব বুক পেতে দিয়েও তাকে রক্ষা করতে পারেননি। ওঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিপত্তি, অর্থ সব কিছু নিষ্ফল হয়ে গিয়েছিল সেই অসহায় ছোট্ট মেয়েটার শেষ-সংগ্রামে। আজ এই সুবর্ণের অবস্থাও তাই। ওঁর বিদ্যা-বুদ্ধি-আইনজ্ঞান কোন কিছুই ঐ আশ্রিতা মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারবে না!

—কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের?—প্রশ্ন করলেন বাসু।

—দু' বছর।

—বাচ্চা-টাচ্চা হয়নি?

মেয়েটি মুখ নিচু করল। রানী দেবী পাশ থেকে বলে ওঠেন, পেটে এসেছিল, থাকেনি।

—বাবা-মা আছেন? বাপের বাড়ি কোথায়?

মেয়েটি মুখ তুলল না। টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল কোলের উপর।

রানী দেবীই জবাব দিলেন এ প্রশ্নের। বললেন—বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি কোথাও ওকে নেবে না। এ্যারেঞ্জড ম্যারেজ নয়—অসবর্ণ বিয়ে। ওরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল।

কোথায় এ রোমান্টিক সংবাদে খুশিয়াল হয়ে উঠবেন আধুনিকমনা ব্যারিস্টার-সাহেব, তা নয় খিঁচিয়ে ওঠেন উনি, প্রেম করে বিয়ে! তা প্রেম করার আগে ওর ফিঙ্গার-প্রিন্টটা নিয়ে যাচাই করাওনি?—চেয়ার ছেড়ে উঠে পদচারণা শুরু করেন।

বেদনাহত জলভরা দু-চোখ তুলে মেয়েটি বললে, ও খুন করেনি! আপনি বিশ্বাস করুন!

বাসু-সাহেব বাঁ-হাতের তালুতে ডান হাত দিয়ে একটা মুষ্টাঘাত করলেন শুধু।

—ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়েছে···আপনি···আপনি ওকে বাঁচান !—

মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে চায়। ওঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ত—কিম্বা—

বাসু-সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন : সিট ডাউন !

থতমত খেয়ে মেয়েটি আবার চেয়ারে বসে পড়ে।

—আজ থেকে ছ'মাস আগে—ধর, গত বছর অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বরে সুপ্রিয় বোম্বাই থেকে ক'লকাতা এসেছিল ?

সুবর্ণ মনে মনে কি হিসাব করে বলল, হ্যাঁ, অফিসের কাজে। মাস খানেকের জন্য। কেন ?

—'কেন' সে-কথা থাক। তুমি কি কোনদিন এমন আশঙ্কা করনি যে, ওর কোনও 'শেডি-পাস্ট' থাকতে পারে ?

—ওর কোনও শেডি-পাস্ট নেই !

—কাকে কি বলছ সুবর্ণ ? মায়ের কাছে মাসীর গল্প ?

রানী দেবী এবার প্রতিবাদ করে ওঠেন, তুমি কথায় কথায় ওকে অমন ধমক দেবে না কিন্তু—

বাসু-সাহেব একবার সুবর্ণের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। শ্রাগ করলেন। গিয়ে বসলেন তাঁর ইজিচেয়ারে। পাইপটা ধরালেন।

সুবর্ণ বললে, আমি ওর সঙ্গে দেখা করব।

—তাতো করবেই। কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাব।

ঠিক তখনই বিশু এনে দিল একটা ওভার-সীজ টেলিগ্রাফ। খামটা খুলে বাসু দেখলেন তারবার্তাটা আসছে ব্যাঙ্কক থেকে। তাতে লেখা :

"সুপ্রিয় দাসগুপ্তকে ডিফেণ্ড করুন এএএ তার সততা এবং কর্মদক্ষতা সন্দেহের অতীত এএএ যাবতীয় খরচ আমার এএএ আকাশ হচ্ছে খরচের ঊর্ধ্বসীমা এএএ রবিবারে দমদম পৌঁছাব এএএ মোহনস্বরূপ কাপাডিয়া।"

বাসু-সাহেব টেলিগ্রাফখানা বাড়িয়ে ধরলেন সুবর্ণের দিকে। বললেন, আই নাউ বেগ য়োর পার্ডন, সুবর্ণ ! আমি অন্যায় কথা বলেছিলাম। তুমি প্রেমে পড়ে যে ভুল করেছ তোমার স্বামীর এমপ্লয়ার ধুরন্ধর কোটীপতি হওয়া সত্ত্বেও সেই একই ভুল করেছেন !

নিজের ঘরে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলেন বাসু। পার্ক-হোটেলের নাম্বার চাইলেন। অপারেটারকে বললেন, রুম নম্বর 78 প্লীজ।

একটু পরে রিঙিং টোন শোনা গেল। ওপ্রান্ত বলল, হ্যালো, জীবন বিশ্বাস বলছি—

—আমাকে না বলে কোর্ট ছেড়ে চলে এলে কেন ?

—আপনি কে? বাসু-সাহেব?

—হ্যাঁ, আমি। কোর্ট থেকে পালিয়ে এলে কেন?

—পালিয়ে তো আসিনি স্যার। কেন, কোন দরকার আছে।

—আছে! তুমি ইচ্ছে করে তোমার বন্ধুকে ফাঁসাচ্ছ!

—কী যে বলেন স্যার! আমি কেন ফাঁসাব? আমি তো তার জন্যে পার্জারির কেসে ফাঁসতে পর্যন্ত রাজী হয়েছিলাম?

বাসু-সাহেব একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, তুমি ঘণ্টাখানেক হোটেল ছেড়ে বের হয়ো না। তোমাকে একটা জরুরী খবর দেব। বুঝলে

—আজ্ঞে আচ্ছা!

বাসু-সাহেব টেলিফোনটা রেখে টানা-ড্রয়ারটা খুললেন। বার করে নিলে আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র। সুজাতা এসে দাঁড়ালো দরজায়। বললে, বে হচ্ছেন নাকি আবার?

—হ্যাঁ, সুজাতা! আবার এক মিস্টিরিয়াস্ ব্যাপার। পার্ক-হোটেলে ফো করে এইমাত্র জীবন বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বললাম। লোকটা জীবন বিশ্বা নয়। আই মাস্ট ফাইণ্ড আউট—লোকটা কে!

—সে কি! লোকটা বলল যে, সে জীবন বিশ্বাস?

—তাই সে বলল। গলাটা নকল করবার চেষ্টাও করছিল—কি পারেনি।

গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন উনি। একাই।

আধঘণ্টা পরে পার্ক হোটেলের নিচে গাড়িটা রেখে এগিয়ে গেলে রিসেপশান কাউণ্টারের দিকে। জীবন বিশ্বাসের রুম নম্বর জেনে নিয়ে লিফ ধরে উপরে উঠলেন। চিহ্নিত দরজায় যখন বাঁ-হাতে টোকা মারলেন তং তাঁর ডান হাতটা ছিল পকেটে—যে পকেটে আছে তাঁর আত্মরক্ষার অস্ত্রটা।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে কৌশিক।

—তুমি! তুমিই তখন ফোন ধরেছিলে?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যে বললেন আবার ফোন করবেন?

বাসু-সাহেব দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। হাসতে হাসতে গিয়ে বসলে একটা চেয়ারে। বললেন, টিকটিকিগিরি ভালই করছ। কিন্তু একটা ভু হয়েছিল তোমার। তুমি ভুলে গিয়েছিলে জীবন বিশ্বাসের কাছে 'পার্জারি অর্থ জোলাপ নেওয়া।

এবার কৌশিকও হেসে ওঠে উচ্চকণ্ঠে। বলে, আয়াম সরি!

কৌশিক তার এই অদ্ভুত আচরণের কৈফিয়ৎ দিল—

মিথ্যা-সাক্ষী ধরা পড়ার পরেই জীবন আদালত ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কৌশিকের সন্দেহ হয় যে, সে আত্মগোপন করতে চাইছে। সে পিছন পিছন বেরিয়ে আসে। জীবন একটি ফ্লাইং ট্যাক্সি ধরে রওনা দেয়। দ্বিতীয় ট্যাক্সি পেতে প্রায় মিনিট দশেক দেরী হয়ে যায় তার। দুর্ভাগ্যক্রমে পথে একটা মিছিলে পড়ে আরও দশ মিনিট দেরী হয়ে যায়। কৌশিক এসে পৌঁছায় পার্ক-হোটেলে। রুম বেহারা হরিমোহনের খোঁজ পেতে বিলম্ব হয় না। তার মাধ্যমে রিসেপশান কাউন্টারে খবর নিয়ে জানতে পারে, মিনিট পাঁচেক আগে জীবন বিশ্বাস চেক আউট করে বেরিয়ে গেছে। ও তার রুম নাম্বারটা জেনে নেয় এবং জে. বিশ্বাস নামে তখনই ঘরটা বুক করে।

—কেন?

—আমি একটা চান্স নিলাম স্যার, আর অদ্ভুত ফল ফলেছে তাতে!

—কি রকম?

কৌশিক নাকি ঘরে এসেই টেলিফোনটা তুলে নিয়েছিল। অপারেটারকে বলে, রুম নম্বর 78 থেকে মিস্টার বিশ্বাস বলছি—আমার কোন ট্রাংক কল এসেছিল ইতিমধ্যে?

মেয়েটি বললে, না স্যার। কাল বিকালে সেই যে ট্রাংক কল এসেছিল তারপর তো আসেনি।

কৌশিক বলেছিল, আচ্ছা কালকে আমি যে কলটা রিসিভ করেছিলাম সেটা বর্ধমান থেকে, না দুর্গাপুর থেকে? মনে আছে আপনার?

—আপনার মনে নেই? আসানসোল থেকে। কলার-এর নাম্বারটা চান?

—আছে আপনার কাছে? আমাকে উনি বলেছিলেন, লিখেও রেখেছি; কিন্তু কোথায় যে ফেললাম।

—এক মিনিট। আপনি লাইনটা ছেড়ে দিন। এখুনি জানাব আপনাকে। সমস্ত ইন-কামিং আর আউট-গোয়িং ট্রাংক কল লেখা থাকে একটা রেজিস্টারে।

—তাই নাকি? তা তো জানতাম না।

—নাহলে এত চার্জ আপনারা দেন কেন পার্ক-হোটেলে?

কৌশিক টেলিফোনটা নামিয়ে রাখল। সে মনে মনে হাসছিল—মেয়েটা ধরতে পারেনি যে, রুম নম্বর 78-এর বাসিন্দা গত দশ মিনিটের ভিতর বদলে গেছে। 'বিশ্বাস' উপাধিটাই কি ওর বিশ্বাস উৎপাদন করল? মেয়েটিও তখন ও-প্রান্তে মনে মনে হাসছিল—রুম 78-এর ভদ্রলোকের কাছে হোটেলের বিজ্ঞাপনটা যে ভালই করেছে। সে জানে এ ব্যবস্থার জন্য আসলে দায়ী

কলকাতার পুলিশ কমিশনার! খানদানী হোটেলেই খানদানী ষড়যন্ত্রকারীরা ওঠে। তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্যই এই আদেশ দিয়েছে আরক্ষা বিভাগ।

এক মিনিট পরে মেয়েটি ফোন করে জানাল, কাল আপনার কলার ছিলেন আসানসোল…

—থ্যাঙ্কু। আপনি আর কতক্ষণ বোর্ডে আছেন?

—কেন বলুন তো? কোন ইন্সট্রাকশান থাকলে আমার সাক্সেসারকে বলে যাব।

—সে জন্য নয়। কারণটা না জানালে বলতে আপত্তি আছে?

—না না, তা কেন? আমার এখনই ডিউটি শেষ হল। আবার কাল বেলা দশটায় আসব আমি। এবার বলুন, কেন জানতে চাইছিলেন।

কৌশিক অম্লান বদনে বললে, তাহলে কাল দশটার সময় আবার আপনাকে বিরক্ত করব। আপনার কণ্ঠস্বরটা আমার খুব ভাল লাগছে। ডোণ্ট টেক ইট আদার-ওয়াইজ—আমার এক নিকট আত্মীয়া, আত্মীয়া ঠিক নয় বান্ধবীর সঙ্গে আপনার কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত মিল।

মেয়েটির হাসির জলতরঙ্গ ভেসে এসেছিল টেলিফোনে। বলেছিল, গুড নাইট স্যার। সুইট ড্রিম্‌স!

—সেম টু য়ু।—লাইন কেটে দিয়েছিল কৌশিক।

তারপর আধঘণ্টা অপেক্ষা করে সে আবার ফোনটা তুলেছিল। এবার কণ্ঠস্বর অনেক ভারী, অনেক ভরাট। কৌশিক বর্ধমান সদর থানার ও. সি.-কে একটা পি. পি. কল বুক করে। লাইটনিং কল। তৎক্ষণাৎ লাইন পায়। সে নৃপেন ঘোষালকে জানায় যে, বাসু-সাহেব যে মিস ডিক্রুজাকে খুঁজছেন সে আসানসোলের 'অমুক' নম্বর থেকে গতকাল ফোন করেছিল। নৃপেন ওকে বলে—এরপর যদি মেয়েটাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাকড়াও করতে না পারি তবে আমার নামটা পালটে রাখবেন।

কৌশিকের এতবড় কৃতিত্বেও কিন্তু বাসু-সাহেবের কোন ভাবান্তর হল না। তিনি স্থির হয়ে বসে আছেন। যেন ধ্যানস্থ। এতক্ষণ শুনছিলেন কিনা তাই বোঝা গেল না। কৌশিক বুঝতে পারে উনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। সে কোন সাড়াশব্দ দেয় না। পুরো পাঁচ মিনিট কি চিন্তা করে হঠাৎ নড়ে চড়ে বসলেন উনি। বলেন, কৌশিক, আমি কোন চান্স নেব না! মনে হচ্ছে সমাধান হয়ে গেছে। এখনও দু-চারটে ছোট ছোট অসঙ্গতি রয়েছে বটে, কিন্তু মূল সমস্যাটার মীমাংসা হয়ে গেছে।

—কী বুঝেছেন আপনি ?

—দুই আর দুইয়ে চার !

—তার মানে ?

—তার মানে তুমি এখান থেকেই আমার এই গাড়িটা নিয়ে আসানসোল চলে যাও। এখন সন্ধ্যা সাতটা। রাত দশটা নাগাদ তুমি বর্ধমানে পৌছাবে। সেখানে যদি নৃপেনের দেখা পাও ভাল, না পাও প্রসীড টু আসানসোল। রাত একটা নাগাদ সেখানে পৌছাবে। সোজা কোতোয়ালিতে চলে যাবে। সেখানে আমার পরবর্তী নির্দেশ পাবে।

—কার কাছে ?

—ডিউটি অফিসারের কাছে। আমি বাড়ি ফিরে এ. ডি. এম্ আসানসোল, ডি. এস. পি. অথবা এস. ডি. ও. সদর যাকে কনট্যাক্ট করতে পারব তাঁকে ব্যাপারটা জানাব। মার্ডার-কেস। ওরা তোমাকে সাহায্য করবেই।

কৌশিক বলে, আর যে-সে মার্ডার নয়! লক্ষপতি এস, পি, জৈনের মার্ডার-কেস !

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওর কাঁধে একখানা হাত রেখে বলেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ কৌশিক। আমি হত্যা তদন্তের কথা বলছি না—হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে চাইছি! আজ রাত্রেই আসানসোলে দ্বিতীয় একটা মার্ডার হবার আশঙ্কা আছে।

কৌশিক স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

বাসু-সাহেব পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে ওর হাতে দেন, ধর !

—সে কি ! এর লাইসেন্স যে আপনার নামে !

—সে দায়িত্ব আমার, কৌশিক। কিন্তু মৃত্যুর মুখে তোমাকে তো আমি নিরস্ত্র যেতে বলতে পারি না। আমি নিজে যেতে পারছি না। কাল দশটায় আমার কেস আবার উঠবে। আশা করছি, তার আগেই ভোররাত্রে তোমার একটা ফোন পাব। আমার অনুমান যদি সত্যি হয় মিঠুকে এবার বাঁচাতে পারব !

কৌশিক অবাক বিস্ময়ে বলে, মিঠু কে ?

ম্লান হাসলেন বাসু। নিজেকেই বললেন যেন, আই বেগ য়োর পার্ডন ! মিসেস্ সুপ্রিয় দাসগুপ্ত। সে এসে উঠেছে আমার বাড়িতে।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে আলিপুর কোর্ট। গাড়িতে যেতে দুই থেকে তিন মিনিট লাগার কথা। কিন্তু ওঁদের লাগল আধঘণ্টা। সাড়ে ন'টায় ট্যাক্সি নিয়ে বার হয়েছিলেন জেলখানার ফটক থেকে, আর আদালতের সামনে এসে যখন উপস্থিত হলেন তখন ঠিক দশটা। কারণ ছিল। জেলখানা থেকে ট্যাক্সিটা নিয়ে ওঁরা চলে এসেছিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। গাড়িটা বাগানের ধারে রেখে ড্রাইভারের পাশে বসা বাসু-সাহেব পিছন ফিরে বলেছিলেন, একটু নেমে এস, ঐ গাছতলায় বসে কয়েকটা কথা বলব।

পিছনের দিক থেকে সুজাতা আর সুবর্ণ নেমে পড়েছিল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে, আমাকে ছেড়ে দিন স্যার—

মানিব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বাসু বলেন, এটা তোমার মিটারের উপর। আধঘণ্টা দাঁড়াতে হবে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বুদ্ধিমান। তৎক্ষণাৎ বুঝে নেয়, মালদার শাঁসালো প্যাসেঞ্জার জুটেছে আজ তার বরাতে। সে কৃতার্থ হয়ে বলে, ঠিক আছে স্যার।

ঘাসের উপর ওঁরা তিনজন বসলেন। বাসু বললেন, সুবর্ণ, বুঝতে পারছি সুপ্রিয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী না হওয়াতে তুমি মর্মাহত হয়েছ—কিন্তু এতে তোমার দুঃখ করার কিছু নেই, এতে তোমার আনন্দিত হওয়ার কথা।

সুজাতা অবাক হয়ে তাকায়। আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্ত হাজতে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে না-চাওয়াটা বোম্বাই থেকে ছুটে আসা তার হতভাগ্য স্ত্রীর কাছে কোন্ যুক্তিতে আনন্দের হতে পারে এটা তার মাথায় ঢোকে না। বাসু-সাহেব বলে চলেন, কাল যখন কোর্ট থেকে ফিরে এসেছিলাম, তখন আমার জয়ের সম্ভাবনা ছিল শূন্য—কেসটা হারার আশঙ্কা ছিল হাণ্ড্রেড-পার্সেণ্ট। তারপর সন্ধ্যা সাতটার সময় কৌশিক একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করে বসল। এক লাফে আমার জেতার সম্ভাবনাটা হয়ে গেল শতকরা পঁচিশ ভাগ! আজ দুরু দুরু বুকে তোমাকে নিয়ে আলিপুর জেলে এসেছিলাম। তুমি হয়তো শুনলে রাগ করবে, আমি মনে মনে ভগবানকে বলছিলাম—হে ঈশ্বর! সুপ্রিয় যেন তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে রাজী না হয়! শেষ পর্যন্ত দয়াময় আমার প্রার্থনাতে কর্ণপাত করেছেন। আয়াম হ্যাপি টু সে—ঠিক এই মুহূর্তে আমার জয়ের সম্ভাবনা সেভেণ্টিফাইভ পার্সেণ্ট!

স্বর্ণ তার অশ্রুধৌত চোখ জোড়া তুলে তাকায়। কথা বলে না।

সুজাতা কিন্তু স্থির থাকতে পারে না। বলে, কী বলছেন আপনি! সুপ্রিয়বাবু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী না হওয়ায় আপনার এ মামলা জেতার সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গেল?

—ইফ নট মোর!

—কেন?

—সেটা আমি এখন বলব না। বলতে পারি না। স্বর্ণকে আমি আশা দিয়ে হতাশ করতে চাই না। কিন্তু একটা কথা বলব স্বর্ণ, মন দিয়ে শোন—

—বলুন?

—আদালতে মনকে খুব শক্ত করে রেখ! যত বড় মানসিক আঘাতই আসুক তুমি ভেঙে পড়বে না! পারবে?

স্বর্ণের চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠল। বললে, আমাকে পারতেই হবে।

—ধর যদি আসামীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাও হয়, ভেঙে পড়বে না?

স্বর্ণ দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে নির্বাক বসে রইল।

বাসু-সাহেব বললেন, তোমাকে সাক্ষী দেবার জন্য ডাকব আমি। পাঁচ সাতটা প্রশ্ন করব। কিন্তু জেরায় বিপক্ষের উকিল তোমাকে খুব নাকাল করাকে চাইবে। তুমি খুব শক্ত হয়ে থাকবে আর জবাবে যা বলবে তাতে নির্জং থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। পারবে? উত্তরে তোমার স্বামীর ভাল কি মন্দ হবে তা বিবেচনা করবে না—আদ্যন্ত সত্য কথা বলবে!

—তাই বলব! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—কোর্টে যত বড় আঘাতই আসুক না কেন আমি অটল থাকব।

—দ্যাট্‌স এ গুড গার্ল। কিন্তু তারও আগে হয়তো একটা শক পাবে তুমি। কোর্ট বসার আগে, মানে তোমাকে সাক্ষী দিতে ডাকার আগে তোমার কানে কানে একটা প্রশ্ন করব আমি। তুমি আমার কানে কানে তার সত্য জবাব দেবে। এগ্রীড?

সুজাতা বলল, এখনই সে উত্তরটা জেনে নিন না?

—সব জিনিসেরই একটা নিজস্ব সময় আছে সুজাতা। এগ্রীড?

—হ্যাঁ!

—তবে ওঠ, চল, সময় হয়ে গেছে।

আদালত-প্রাঙ্গণে ওঁরা প্রবেশ করলেন দশটায়। সেখানে বাসু-সাহেবের

অন্ত দুটি বিস্ময় ইতিপূর্বেই উপস্থিত। প্রথমত তাঁর পাশের চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ ব্যারিস্টার এ. কে. রে। প্রবেশপথেই দেখতে পেলেন বাসু-সাহেব। উনি ভেবেছিলেন, ব্যারিস্টার রে আজ আসবেন না। দ্বিতীয়ত প্রবেশপথেই দাঁড়িয়ে ছিল কৌশিক।

—কি খবর?

কৌশিক ওঁকে হাত ধরে বারান্দার একান্তে নিয়ে গেল। নিজের হাতঘড়িতে সময়টা দেখল। দশটা বেজে এক। বললে, ভোর সাড়ে চারটের আসানসোল থেকে রওনা হয়েছি। মিনিট দশেক আগে এখানে পৌচেছি। শুনুন—জীবন বিশ্বাস ফেরার, তার এক লাখ টাকা সমেত—

—আই নো। নেক্সট?

—মিস্ ডি. সিল্‌ভার আস্তানা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম, কিন্তু সেও ভেগেছে!

—লেট হার গো টু হেল্। তার ভাই? বিকৃত মস্তিষ্ক ছেলেটা?

—তাকে উদ্ধার করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। কোর্টে বসিয়েছি, দর্শকদের গ্যালারিতে—কিন্তু সে পাগল নয় মোটেই।

কৌশিক থেমে পড়ল। কে একজন এগিয়ে এসে বললেন, জজসাহেব এসে ছেন।

বাসু বলেন, চলুন আমি যাচ্ছি—

কৌশিক বললে, আসল কথাটাই আমার বলা হয়নি—

—আসল কথাটা আমি জানি কৌশিক! তুমি মিস্টার ডি. সিল্‌ভার কাছে যাও। বেচারি অনেক ধকল সয়েছে এ-কদিন। ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

একজন কোর্ট পেয়াদা ছুটতে ছুটতে এসে বললে, স্যার!

—ঠিক আছে। চল।

দ্রুত পায়ে বাসু এসে প্রবেশ করলেন। নিজ আসনের কাছে এসে জজ-সাহেবকে বাও করে বললেন, আয়াম সরি!

জাস্টিস ভাদুড়ী বললেন, য়ু অট টু বি! আমাদের প্রতিটি মিনিট হচ্ছে পাবলিক টাইম। এনি ওয়ে। আর উই অল রেডি নাউ?

বাদীপক্ষে নিরঞ্জন মাইতি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমরা তো অনেকক্ষণ আগে থেকেই প্রস্তুত!

—তাহলে আদালত বসছে। গতকাল মিস্টার পাণ্ডের ক্রশ একজামিনেশনের আগেই অধিবেশন শেষ হয়েছিল। মিস্টার পাণ্ডে! টেক ইয়োর স্ট্যাণ্ড প্লীজ।

সি. বি. আই অফিসার মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালেন।

জাষ্টিস ভাদুড়ী বললেন, প্লিজ রিমেম্বার, য়ু আর আণ্ডার ওথ ওভার-নাইট!

ফিঙ্গার-প্রিণ্ট এক্সপার্ট অভিবাদন করে বলেন, আই নো মি' লর্ড!

বাসু-সাহেবকে ইঙ্গিত করলেন বিচারক, প্লীজ প্রসীড!

এতক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হচ্ছিল গুরু-শিষ্যে। ব্যারিস্টার রে সাহেব বলেছিলেন, সেজন্য কাল আসি উঠে চলে যাইনি বাসু। আমার শরীরটা খারাপ লাগছিল বলে চলে গিয়েছিলাম। হার জিত নিয়েই জীবন! ইফ্ য়ু ক্যান টেক দ্য পাঞ্চ, কাণ্ট আই সোয়ালো ইট এ্যাজ ওয়েল?

জজ সাহেব 'প্লীজ প্রসীড' বলার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যালাপ অসমাপ্ত রেখে বাসু উঠে দাঁড়ালেন। সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন, মিস্টার পাণ্ডে, আপনি কাল আপনার সাক্ষ্যে বলেছেন যে, দুটি ভিন্ন লোকের ফিঙ্গারপ্রিণ্ট কোন অবস্থাতেই হুবহু এক হতে পারে না। তাই না?

—তাই বলেছি।

—যেহেতু 'এফ. পি-ওয়ান' আর বহরমপুর থানায় রক্ষিত ফিঙ্গারপ্রিণ্ট দুটি হুবহু এক, তাই আপনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত এবং খোকন ওরফে লালু অভিন্ন ব্যক্তি? ইয়েস অর নো?

—ইয়েস!

—আপনার দু' বছর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড-এর ট্রেনিং এই সিদ্ধান্তে অপনাকে পৌঁছে দিয়েছে?

—হ্যাঁ তাই!

—কিন্তু ঐ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইতিহাসে কি এমন নজির নেই যে, হায়েস্ট অথরিটি অন দ্য সাবজেক্ট বলেছেন, দুটি ফিঙ্গার-প্রিণ্ট হুবহু মিলে গেছে অথচ পরে প্রমাণিত হয়েছে সে দুটি বিভিন্ন লোকের ফিঙ্গার-প্রিণ্ট?

—আমি এমন কেস একটিও জানি না।

—আপনি কি 'চেজ এ ক্রুকেড শ্যাডো' ফিল্মটা দেখেছেন?

—অবজেক্‌শান য়োর অনার। দ্য কোশ্চান ইস ইররেলিভ্যাণ্ট, ইমপার্টিন্যাণ্ট এবং বর্তমান মামলার সঙ্গে সম্পর্ক বিমুক্ত।

জাষ্টিস্ ভাদুড়ী একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন, অবজেকশান সাসটেইনড! বাট্...একটু থেমে বললেন, বিষয়টা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। প্রতিবাদী কাউন্সেলকে আমি রিসেস্ পিরিয়ডে এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে অনুরোধ করছি। আমি ঐ ফিল্মটা দেখিনি, কিন্তু—ওয়েল, য়ু মে প্রসীড...

বাসু-সাহেব একটা বাও করে বললেন, 'চেজ এ ক্রুকেড শ্যাডো' ফিল্মটা বর্তমান মামলায় অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু সহযোগী তাঁর ডাইরেক্ট এভিডেন্সে রামচন্দ্রপুরের আগরওয়াল হত্যা মামলার প্রসঙ্গ এনেছিলেন। সে মামলায় বর্তমান বিচারকই বিচার করেছিলেন, এবং আমার সহযোগী আইনজীবীই পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন। আশা করি আপনাদের মনে আছে, সেখানেও দুটি ফিঙ্গার-প্রিন্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষ হুবহু এক বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছিল সে দুটি ভিন্ন ব্যক্তির!

নিরঞ্জন মাইতি বলেন, সেটা ছিল অন্য ব্যাপার। তাতে ফিঙ্গার-প্রিন্ট সায়েন্সটা ভুল প্রমাণিত হয়নি।

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, আমি বাদীর সঙ্গে একমত। যাই হোক, আপনি জেরা চালিয়ে যান।

বাসু-সাহেব বলেন, মিস্টার পাণ্ডে আজ যদি আমি প্রমাণ করি আসামী সুপ্রিয় দাসগুপ্ত খোকন ওরফে লালু নয়, তবে কি আপনি মেনে নেবেন ফিঙ্গার-প্রিন্ট সায়েন্সটা ভুল?

—এটা আপনার পক্ষে প্রমাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

—ওটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়। সে, ইয়েস অর নো!

—ইয়েস!

বাসু হেসে বলেন, য়ু শুড বেটার হ্যাড সেড 'নো'! তাই কিন্তু প্রমাণ করব আমি!

মাইতি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রতিবাদ জানাতে। তার আগেই বাসু বলেন, দ্যাটস্ অল মি' লর্ড!

তারপর মহামান্য বিচারককে সম্বোধন করে বলেন, আদালত অনুমতি করলে আমি আমার পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকতে পারি!

মাইতি একটা স্বগতোক্তি করেন, এর পরেও!

জাস্টিস্ ভাদুড়ী তাঁর দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করলেন; বাসুকে বলেন, ইয়েস প্রসীড!

—আমার পরবর্তী সাক্ষী মিসেস সুবর্ণ দাসগুপ্তা।

—মিসেস সুবর্ণ দাসগুপ্তা হাজির?

সুবর্ণ সুজাতার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো সাক্ষীর মঞ্চে। অচঞ্চল দীপশিখার মত।

—আপনার নাম?

—মিসেস সুবর্ণ দাসগুপ্তা।

—স্বামীর নাম?

—মিস্টার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত।

—আপনার স্বামী কী কাজ করেন?

—বোম্বাইয়ের কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার।

—কতদিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

—দু' বছর।

—হিন্দু-ম্যারেজ না রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ?

—রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ।

—আপনার স্বামী বর্তমানে কোথায় আছেন?

—আমি জানি না।

—অবজেক্‌শান য়োর অনার! জানেন না মানে কী?—লাফিয়ে ওঠেন মাইতি।

জাস্টিস্‌ ভাদুড়ী ভ্রূকুটি করেন। একবার সাক্ষী একবার বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখেন। বাসুকে কিছু বলতে যান, তারপর মনস্থির করে মাইতিকেই বলেন, অবজেকশান অন হোয়াট গ্রাউণ্ডস্‌?

—ওঁর স্বামী জলজ্যান্ত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আর উনি বলছেন 'জানি না!'

জাস্টিস্‌ ভাদুড়ী বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি কিছু বলবেন?

—আমি কী বলব? আমি তো শুনছি এখন। আমি সাক্ষীকে প্রশ্ন করেছি, তিনি জবাব দিয়েছেন। সহযোগী 'অবজেকশান' দিয়েছেন, তার কারণ দেখাচ্ছেন না। এখন কী বলতে পারি আমি?

—য়ু আর পারফেক্টলি রাইট টেকনিকালি—জজসাহেব মাইতির দিকে ফিরে বলেন, কী আপত্তি এ প্রশ্নোত্তরে তা তো বলবেন?

—এ তো ডাহা মিথ্যে কথা—ফুঁসে ওঠেন মাইতি!

—সো হোয়াট! সেটা জেরায় প্রমাণ করবেন। মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য সাক্ষীর বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারেন, অনেক কিছু করতে পারেন; কিন্তু বর্তমান মামলায় বাধা দিচ্ছেন কোন অধিকারে?

মাইতি অসহায়ভাবে বসে পড়েন।

বাসুর পরবর্তী প্রশ্ন, এই কোর্ট রুমে আপনার স্বামী উপস্থিত আছেন?

সাক্ষী দর্শকমণ্ডলীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বলেন, আমি জানি না। দেখতে পাচ্ছি না।

মাইতি উঠে দাঁড়ান। আবার বসে পড়েন।

বাসু তাঁর বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বলেন, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঐ লোকটাকে ভালভাবে দেখুন···বলুন, ঐ লোকটাকে আপনি ইতিপূর্বে জীবনে কখনও দেখেছেন ?

—না !

মুহুর্মুহু হাতুড়ির আঘাত সত্ত্বেও কোর্টরুমে নিস্তব্ধতা ফিরে আসতে পুরো একটি মিনিট লাগল। জাস্টিস্ ভাদুড়ী এবার কিন্তু কাউকে ধমকালেন না।

বাসুর পরবর্তী প্রশ্ন, কাঠগড়ার ঐ লোকটা আপনার দু-বছরের বিয়ে করা স্বামী, কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত, এম. এ. নয় ?

—না !

মাইতি আর আত্মসম্বরণ করতে পারেন না। লাফিয়ে ওঠেন, দিস ইস্ প্রিপস্টারাস মি' লর্ড ! এসব ওঁর অতি নাটকীয় প্যাচ !

বাসু একধাপ এগিয়ে এসে উচ্চকণ্ঠে বলেন, মাননীয় আদালতের কাছে আমার একটি আর্জি আছে ! যেহেতু এ পর্যন্ত বিচার আমার মক্কেল সুপ্রিয় দাসগুপ্তের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছে তাই আমি এ মামলার আদ্যন্ত নাকচ করবার প্রার্থনা জানাচ্ছি !

বিচারকক্ষে পুনরায় গণ্ডগোলের সূত্রপাত হতেই জাস্টিস্ ভাদুড়ী একবার জোরে হাতুড়ির আঘাত করেন। স্তব্ধতা ফিরে আসে। বিচারক বলেন, যেহেতু এখনও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়নি যে, আপনার মক্কেলের অনুপস্থিতিতে এ মামলার অধিবেশন হয়েছে তাই আপনার প্রার্থনা এখনই মঞ্জুর করা যাচ্ছে না ! য়ু মে প্রসীড !

—দ্যাটস্ অল মি' লর্ড !—বাসু মাইতিকে বলেন, য়ু মে ক্রশ এক্সামিন হার।

আহত সিংহের মত লাফ দিয়ে ওঠেন মাইতি। নাটকীয়ভাবে সাক্ষীর সামনে এগিয়ে এসে বলেন, আপনি বললেন যে, ঐ লোকটা আপনার স্বামী নয় ?

—তাই বলছি !

—তাহলে আপনার স্বামী কে ?

—সুপ্রিয় দাসগুপ্ত !

—ঐ উনিই তো সুপ্রিয় দাসগুপ্ত !

—হতে পারে ওঁরও তাই নাম, কিন্তু উনি আমার স্বামী নন !

মাইতি অসহায়ভাবে মাথা নাড়েন। বলেন, রাতারাতি কোথা থেকে

আমদানি হলেন আপনি ?

—অবজেকশান য়োর অনার ! সহযোগীর প্রশ্নের ভাষায় আমার আপত্তি।

—অবজেকশান সাসটেইণ্ড ! আপনি সংযত ভাষায় প্রশ্ন করুন।

—আপনার কটা বিয়ে ?

—অবজেকশান ! সহযোগী আদালতের নির্দেশ মানছেন না। তাঁর ভাষা এখনও অশালীন !

জাস্টিস ভাদুড়ী মাইতিকে ধমক দেন, আপনি আপনার ভাষাকে সংযত করুন, না হলে ব্যাপারটা আমি আপনাদের বার-এ্যাসোসিয়েশানকে জানাতে বাধ্য হব !

মাইতি কিছু বলতে গেলেন। পারলেন না। মরিয়া হয়ে বললেন, আমি সময় চাইছি মি' লর্ড। এ মেয়েছেলেটা কে, সে খবরটা—

—অবজেকশান। 'এই ভদ্রমহিলাকে' বলুন !

মাইতি প্রায় তোৎলা হয়ে গেলেন।

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, আপনারা দু-পক্ষ যদি রাজী থাকেন তাহলে আমি দশ মিনিটের জন্য কোর্ট স্থগিত রেখে আমার চেম্বারে আপনাদের দুজনের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করতে চাই। আফটার অল, আমাদের উদ্দেশ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা।

বাসু বলেন, আমি রাজী, কিন্তু তার আগে আমি একটা কাজ করতে চাই। আমি জানি, ঐ ভদ্রমহিলার স্বামী এই আদালতে উপস্থিত আছেন। তাঁর জীবন সংশয়। তাঁকে সনাক্ত করে সর্বপ্রথম পুলিসের জিম্বায় দেওয়ার প্রয়োজন। আপনি কি ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দেবেন ?

—ইয়েস ! ডু এ্যাস্ য়ু প্লীজ !

বাসু-সাহেব দর্শকমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস্টার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত, ম্যানেজার, কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানি, যদি এ আদালতে উপস্থিত থাকেন তবে দয়া করে উঠে দাঁড়ান।

দেখা গেল ভীড়ের মধ্যে একজন একহারা ফর্সা ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরও বড় বড় জুলফি আছে। কিন্তু কোন মূর্খই তাঁকে আসামীর যমজ-ভাই বলে ভুল করবে না—চেহারার সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও।

—আপনি এগিয়ে আসুন !

ধীর পদবিক্ষেপে ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন।

—আপনিই সুপ্রিয় দাসগুপ্ত—ম্যানেজার, কাপাডিয়া এ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানি ?—প্রশ্ন করেন বাসু।

—হ্যাঁ!

—সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়ানো ঐ সুবর্ণ দাসগুপ্তা আপনার স্ত্রী?

লোকটা মুখ তুলে তাকালো। দেখলো চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো মেয়েটি। সে কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বললে, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী!

মাইতি বললেন, কিন্তু এটা আমরা মেনে নিতে রাজী নই। এরা দুজনেই জাল হতে পারে! সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মেলোড্রামাটিক হচ্‌পচ্‌ হতে পারে।

জাষ্টিস্ ভাদুড়ী বললেন, মিস্টার বাসু, আপনি কি কোন পথ দেখাতে পারেন যাতে প্রমাণ করা যায়—এঁরা দুজন সত্যি কথা বলছেন, অর্থাৎ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ঐ লোকটা সুপ্রিয় দাসগুপ্ত নয়?

—কিছু সময় পেলে নিশ্চয় পারব, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই সেটা কেমন করে সম্ভব?

—ভুল বললে বাসু! এই মুহূর্তেই সেটা প্রমাণ করা সম্ভব।

সকলের দৃষ্টি গেল ডিফেন্স কাউন্সেলারদের চিহ্নিত কোণাটায়। উঠে দাঁড়িয়েছেন অশীতিপর বৃদ্ধ ব্যারিস্টার এ. কে. রে। তিনি একটি বাও করে বলেন, আদালত যদি আমাকে অনুমতি দেন—আমি পাঁচ মিনিটের ভিতর চূড়ান্তভাবে সমাধান করে দেব সমস্যাটা—

জাষ্টিস্ ভাদুড়ী বলেন, ইয়েস! ডু ইট প্লীজ!

—মিস্টার পাণ্ডে এখানে উপস্থিত। তিনি এই দু-জনের ফিঙ্গার-প্রিন্ট নিন। এখনই! তারপর ঐ নথিটা দিন। পিপলস্ এক্সিবিট নম্বর সেভেন। ওটা হচ্ছে সাদার্ণ এ্যাভিন্যুর একটা বাড়ির বিক্রয়-কোবলা। বিক্রেতা—পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি হোল্ডার সুপ্রিয় দাসগুপ্ত। সাড়ে চার লাখ টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করতে হলে সই ছাড়া টিপছাপও দিতে হয়। মিস্টার পাণ্ডে ওটা দেখে পাঁচ মিনিটের ভিতর সনাক্তকরণ চূড়ান্তভাবে করে দিতে পারবেন!

আধঘণ্টার জন্য কোর্ট এ্যাডজোর্ন করে জজ-সাহেব তাঁর খাস কামরায় চলে গেলেন। সেখানে ডাক পড়ল বাসু, মাইতি এবং এ. কে. রে-র। ইতিমধ্যে পাণ্ডে-সাহেব তাঁর পরীক্ষাকার্য করে জানিয়েছেন, আসামী আর যেই হোক মোহনস্বরূপ কাপাডিয়ার ওকালতনামাধারী সুপ্রিয় দাসগুপ্ত নয়। দর্শকের আসন থেকে যে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনিই তাই।

জাষ্টিস্ ভাদুড়ী বলেন, মিস্টার বাসু, আপনি যদি ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেন, তাহলে মামলাটার—অবশ্য মামলার নিষ্পত্তি তো হয়েই গেছে। আপনার মক্কেলের অনুপস্থিতিতে—

মাইতি বলেন, তা কেন! ওঁর মক্কেল তো ঐ আসামী! তার অপরাধ তো প্রমাণিত হয়েছে—

—না হয়নি!—বাধা দিয়ে বলেন এ. কে. রে—মামলায় তাকে অসংখ্য-বার ম্যানেজার, কাপাডিয়া অ্যাণ্ড কাপাডিয়া কোম্পানি বলে আপনি উল্লেখ করেছেন। সে তা নয়। সে পুনর্বিচার দাবী করতে পারে আইনত।

বাসু-সাহেব বলেন, সে সব কথা পরে। আপাততঃ এই নিন আমার দরখাস্ত। বর্তমান মামলার আসামী খোকন ওরফে লালু আমার মক্কেল নয়। স্টেট-ভার্সেস সুপ্রিয় দাসগুপ্তের মামলা ডিস্‌মিস্ হয়েছে জানলেই আমার ছুটি!

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, মামলা তো ডিস্‌মিস্ হয়েই গেছে। শুধু আমার অ্যানাউন্স করা বাকি। কিন্তু রহস্যটা যে কিছুই পরিষ্কার হল না বাসু-সাহেব।

বাসু হাত দুটি জোড় করে বলেন, আমার এক অনুগত ভক্ত আছে। সে গোয়েন্দা গল্প লেখে। কিছুদিনের মধ্যেই তার লেখা ছাপা বই বাজারে বেরুবে। আপনাকে না হয় এক কপি কমপ্লিমেণ্টারি পাঠিয়ে দিতে বলব।

উঠে দাঁড়ান তিনি।

এ. কে. রে মাইতির দিকে ফিরে বললেন, আপনার নিমন্ত্রণে এসেছিলাম। আই এঞ্জয়েড ইট থরোলি! আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ।

মাইতির মুখটা কালো হয়ে গেল। তবু কাষ্ঠ-হাসি হেসে শুধু বললেন, হেঁ হেঁ!

জাস্টিস ভাদুড়ী বললেন, অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম রে-সাহেব! শরীর ভাল তো?

—ভাল না থাকলে পর পর দুদিন অ্যাটেণ্ড করি?

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, বারওয়েল অ্যণ্ড সেকেণ্ড রিটায়ার করায় কলকাতার 'বার' কিন্তু কানা হয়ে গেছে রে-সাহেব।

রে বললেন, আই বেগ টু ডিফার! নূতন সূর্যের উদয় হয়েছে কলকাতার বারে—'পিয়্যারী-ম্যাসন অফ দি ঈস্ট!' অর্থাৎ সাদাবাংলায়: পূর্বাঞ্চলের 'মেরে পেয়ারী বাস্তকার'।

দশ

কোর্ট-ফেরত সবাই এসে বসেছেন বাসু-সাহেবের বাড়ির সামনের লনে। বৈশাখী সন্ধ্যা, ঘরের চেয়ে বাইরেই আরামপ্রদ। তার উপর চাঁদনী রাত। গোল হয়ে বসেছেন বাসু, রানী, কৌশিক, সুজাতা, সুপ্রিয়, সুবর্ণ,

আর এ. কে. রে। বৃদ্ধ ব্যারিস্টার এখনও বাড়ি যান নি। ব্যাপারটা সব জেনে না গেলে নাকি তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত হবে।

সুজাতা বললে, এবার বলুন বাসু-মামু। কী করে কী হল।

কৌশিক বাধা দিয়ে বললে, আমি কিন্তু ইন্টারেস্টেড জানতে, আপনি কোন্ পর্যায়ে কতটা বুঝতে পেরেছিলেন, কোন্ কোন্ ক্লুয়ের সাহায্যে এবং কখন সবটা বুঝলেন।

এ. কে. রে. বলেন, অর্থাৎ আমাদের কাছে এটা আড্ডা। তোমার কাছে ট্রেনিং ক্লাস।

রানী বললেন, তা তো হবেই। এ. কে. রে-র পতাকা তুলে নিয়েছিলেন পি. কে. বাসু—ভবিষ্যতে সেটাই তো বহন করবেন কে. মিত্র।

কৌশিক বললে, ভবিষ্যৎ পড়ে মরুক। আপাততঃ আমি হচ্ছি পিয়্যারি মেসনের সাকরেদ—পল ড্রেক। কিন্তু আর দেরী নয়। শুরু করুন আপনি।

বিশু খাবারের ট্রে নিয়ে এসে পরিবেশন শুরু করল।

বাসু বললেন, শুরু আমি করব না, সুপ্রিয় বলে যাও তোমার অভিজ্ঞতা—

—আমি সুবর্ণকে বলে এসেছিলাম, সাতদিনের জন্য কলকাতা যাচ্ছি কেন যাচ্ছি, তা ও জানত না। মিস্টার কাপাডিয়ার নির্দেশে আমি ব্যাপারটা ওর কাছেও গোপন করি। কলকাতায় এসে পার্ক হোটেলে উঠি। আমি আর জীবনবাবু। গুডফ্রাইডের আগের দিন এগারোই বাড়িটা বিক্রি হল যদুপতি নগদ দু-লক্ষ টাকা আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল, এগারোই সকালে। সেটা হোটেলের ভল্টে রেখে আমরা রেজিস্ট্রেশান অফিসে যাই।

—হোটেলে আপনারা কত নম্বর ঘরে উঠেছিলেন?

—39 নম্বরে। ডবল্ বেড রুম। একসঙ্গেই ছিলাম। যাই হোক রেজিস্ট্রেশান হয়ে গেলে জীবনবাবু যদুপতিকে বললেন, স্যার আমাদের মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবেন না? যদুপতি ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে আমাকে বলল, আজ রাত্রে আপনাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করছি মোকাম্বোতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। আমি রাজী হই। আমি আর যদুপতি রাত ন'টা পর্যন্ত মোকাম্বোতে ছিলাম। তারপর ফিরে আসি হোটেলে রাত দশটায় জীবন ফিরে আসে। সারাদিনের ধকলে আর কলকাতার গরমে আমার ভীষণ মাথা ধরেছিল। বেয়ারাটাকে ডেকে আমি সারিডন আনতে দিচ্ছিলাম। জীবন বললে, আনাতে হবে না, তার কাছেই আছে সে আমাকে একটা ট্যাবলেট দেয়। আমি খেয়ে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ি

তার পরের কথা আর কিছু জানি না আমি। যখন জ্ঞান হয়, দেখি, আমি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কোন অজানা জায়গায় পড়ে আছি। মাঝে মাঝে একটি অচেনা স্ত্রীলোককে দেখেছি। জ্ঞান হলেই সে আমাকে একটা পানীয় খেতে দিত। প্রচণ্ড তেষ্টায় আমি সেটা ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলতাম। এখন হিসাব করে দেখছি, এভাবে সাতদিন আমি ঘুমিয়েছি। তারপর গতকাল শেষ রাত্রে কৌশিকবাবু আমাকে উদ্ধার করেন আসানসোল থেকে। এ-ছাড়া আমি কিছুই জানি না।

বাসু-সাহেব ওর সূত্র তুলে নিয়ে বললেন, সমস্ত ব্যাপারটার মূল পরিকল্পনা হচ্ছে জীবন বিশ্বাসের। লোকটার সঙ্গে আণ্ডার ওয়ার্ল্ড-এর দু-একজনের জানা শোনা ছিল। মাস কতক আগে থেকেই সে জানতে পারে যে, মোহন-স্বরূপ কাপাডিয়া এভাবে বাড়িটা বিক্রি করবেন। তখন থেকেই সে সক্রিয় হয়। খোকন বা লালুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। খোকন মিস্ ডি-সিল্‌ভার মাধ্যমে এই পরিকল্পনাটা ছকে। ডি. সিল্‌ভার এক ভাই রাঁচি উন্মাদাশ্রমে ছিল। সে তাকে নয় তারিখে ওখান থেকে খালাস করে এনে পার্ক-হোটেলে তোলে এবং নয়-দশ তারিখ বারে বারে তাকে গাড়ি করে নিয়ে বার হয়। ওর ভাই ছিল জড়ভরত প্রকৃতির পাগল। তাই এতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। দশ তারিখে সে তাকে কলকাতার কোন প্রাইভেট উন্মাদাগারে ভর্তি করে দিয়ে একাই ফিরে আসে। হোটেলের সবাই জানত ভাইটি হোটেলেই আছে। এগারোই রাত্রে বড়বাজারে জৈনের গদিতে ডাকাতি করে খোকন এসে আশ্রয় নেয় ডি. সিল্‌ভার ঘরে। মধ্যরাত্রে সুপ্রিয় অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে ধরাধরি করে পাশের ঘরে আনা হয় এবং খোকন সুপ্রিয়র সীটে চলে যায়। বারো তারিখ সকাল থেকে সে সুপ্রিয়র ভূমিকা নেয়। বারো তারিখ সকালেই ডি. সিলভা একটা অ্যাম্বাসাডারে করে বর্ধমান চলে যায় সঙ্গে যায় অজ্ঞান অবস্থায় আসল সুপ্রিয়, তার ভায়ের পরিচয়ে।

কৌশিক বলে, আমি ব্যাপারটা বুঝলাম না। সুপ্রিয়বাবু, আপনি কী জীবনবাবুকে বম্বে মেলে তিনখানা টিকিট কাটতে বলেননি।

—আদৌ না। আমার প্লেনে ফেরার কথা ছিল। টিকিটও কাটা ছিল।

—তাহলে?

বাসু-সাহেব বলেন, জীবন বিশ্বাসের পরিকল্পনাটা তুমি বুঝতে পারনি কৌশিক। তার প্ল্যান ছিল—বম্বে মেলে ওরা দু'জন, জীবন আর খোকন, রওনা হবে। রেলওয়ে রেকর্ড-এ থাকবে—কুপেতে ছিলেন মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস দাশগুপ্ত আর তার পাশের কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছিলেন জীবন বিশ্বাস।

গাড়ি বর্ধমানে পৌছালে মিস্ ডি. সিল্ভা তার তথাকথিত অসুস্থ ভা
অর্থাৎ সুপ্রিয় দাসগুপ্তকে নিয়ে বিনা টিকিটে কামরায় উঠবে। সে
আসল সুপ্রিয় দাসগুপ্তকে শুইয়ে দেওয়া হবে ক্যুপের লোয়ার বার্থে
তারপর খোকন আর ডি. সিল্ভা বর্ধমানেই নেমে যাবে দু-লাখ টা
সমেত। রাত ভোর হলে জীবন এ কামরায় এসে চীৎকার চেঁচামেচি জু
দেবে। দেখা যাবে, সুপ্রিয় বিষ খেয়ে মারা গেছে এবং তার দুটি স্যুটকে
নেই। জীবন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে নেই। সে তার ম্যানেজারের নির্দে
তিনখানা টিকিট কেটেছে। ম্যানেজার সুপ্রিয় কোথা থেকে একা
অসচ্চরিত্রের মেয়েছেলে জুটিয়ে এনেছিল তা সে কেমন করে জানবে
তার সন্দেহ হয়েছিল কিনা?—হ্যাঁ হয়েছিল। তাই ঘটনার অনেক আ
সে ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার বাসু-সাহেবকে তার আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল
বিশ্বাস না হয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

সুজাতা বলে, চমৎকার প্ল্যান!

কৌশিক বলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও! তাহলে ঐ জৈন-সাহেবের রিভ
ভারটা ও কামরায় এল কেমন করে?

বাসু হেসে বলেন, সেটা জীবনের পরিকল্পনা অনুযায়ী নয়। খোকনে
পরিকল্পনা অনুযায়ী, ঐ ডি. সিল্ভার সঙ্গে যৌথভাবে। ওরা দু-জনে হ
বর্ন-ক্রিমিনাল। দু-লাখ টাকা তিনভাগ করার চেয়ে তারা দু-জনে সেটা
দু-ভাগ করতে চাইল। যাকে বলে ডবল্-ক্রশ। ব্যবস্থা করা হল—ট্রে
ছাড়ার আগে ওদের দলের একজন একটা লোডেড-রিভলভার খোকনে
পৌছে দেবে। রুদ্ধদ্বার সি-ক্যুপেতে অতি অনায়াসে খোকন জীবনকে হ
করত। ট্রেন বর্ধমানে পৌছালে জীবনের মৃতদেহকেও ঐ ক্যুপেতে রে
তারা সুযোগমত বর্ধমানে বা আসানসোলে নেমে যেত। পরদিন জোড়া
আবিষ্কৃত হত ঐ ক্যুপেতে। কেউ জানতে পারত না—কে খুন করে টাকা
নিয়ে ভেগেছে!

রানী বলেন, তাহলে জৈনকে কে খুন করেছিল?

—খুব সম্ভব খোকন নিজেই। সুকুমার বোস-এর এভিডেন্স থেকে ত
মনে হয়। আপনি কি বলেন?—বাসু-সাহেব প্রশ্ন করেন এ. কে. রে-কে।

—আই বেগ টু ডিফার!—বললেন এ. কে. রে। একহারা চেহা
ফর্সা রঙ আর বড় বড় জুলফি ছাড়া আর কোন যুক্তি নেই।

—কিন্তু বিরুদ্ধ যুক্তিও কিছু নেই।—বললেন বাসু-সাহেব।

—আছে। প্রকাণ্ড একটা বিরুদ্ধ যুক্তি আছে। তাই যদি হত, তাহ

জনের রিভালভারটা এগারোই রাত্রে খোকনের কাছে থাকারই সম্ভাবনা। স-ক্ষেত্রে ট্রেনে অন্ত কেউ তাকে ঐ রিভলভারটা পৌছে দিতে আসত না। এগারোই তারিখ থেকে তার পকেটে থাকত একটা রিভলভার, যার নম্বর 159362।

সুজাতা অবাক হয়ে বললে, নম্বরটা মুখস্ত আছে এখনও!

—বাঃ! কোর্টে স্বকর্ণে শুনলাম যে!

কৌশিক বললে, সে তো আমরাও শুনেছি। ভুলে মেরে দিয়েছি।

এ. কে. রে বললেন, তাহলে কোনদিন 'পল-ড্রেক অব দ্য ঈস্ট' হতে পারবে না তুমি! কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও পরিষ্কার হয়নি। সুপ্রিয়বাবু—তুমি কি এগারোই সকালে লেট ল্যামেণ্টেড মিস্টার জৈনের বাড়িতে ফোন করেছিলে?

—না তো! ফোন করব কেন?

—ধর, ঐ হুণ্ডির ব্যবস্থা পাকা করতে?

—সে কথা তো হয়েই ছিল তাঁর সঙ্গে। নেহাৎ তিনি রাজী না হলে আমি অন্য কারও দ্বারস্থ হতাম। কাপাডিয়া কোম্পানির ম্যানেজার হিসাবে আমি কলকাতার অনেক ধনী ব্যবসায়ীকে চিনি। আর কাউকে না পেলে যদুপতির কাছ থেকেই হুণ্ডি নিতাম।

—যদুপতি রাজী না হলে—

—অ্যাট লিস্ট দু-লাখ টাকা স্যুটকেশে নিয়ে বোম্বাই মেলে যেতাম না। হয় কোন ব্যাঙ্ক ভল্টে রাখতাম—নেহাৎ না হয় প্লেনে নিয়ে যেতাম টাকাটা!

কৌশিক বলে, এবার আপনি বলুন স্যার, কেমন করে আন্দাজ করলেন ব্যাপারটা।

বাসু-সাহেব বুঝিয়ে বলেন, আমার প্রথম সন্দেহ জাগে জীবন ঠিক যে মুহূর্তে প্রথমবার আমার কক্ষে ঢোকে। কিন্তু সেটা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। সেটা একটা অনুভূতি। আমার সন্দেহ জাগে। জীবন যে সন্দেহজনক ব্যক্তি এ আশঙ্কা তোমাদের সকলেরই হয়েছিল। আমার খটকা লাগল মোহনস্বরূপ কাপাডিয়ার টেলিগ্রামের একটি শব্দে। উনি লিখেছেন, 'হিজ ইন্টিগ্রিটি অ্যাণ্ড এফিসিয়েন্সি ইজ বিয়ণ্ড কোশ্চেন' অর্থাৎ তার সততা আর কর্মদক্ষতা সন্দেহের অতীত। ঐ 'কর্মদক্ষতা' শব্দটায় খটকা লাগল আমার। মোহনস্বরূপ একজন কোটিপতি—তাঁর ম্যানেজারের 'কর্মদক্ষতার' বিষয়ে এতবড় সার্টিফিকেট তিনি কেন দিলেন? অমন দক্ষ ম্যানেজার বোম্বাই মেল-এ স্যুটকেশে করে পাচার করা ছাড়া আর কোন রাস্তা খুঁজে

গেল না। দু-লাখ টাকা। দ্বিতীয়ত এতবড় কোম্পানির ম্যানেজার খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়ল অথচ বোম্বাই থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই কেন? মালিক না হয় বিদেশে—কিন্তু আর সবাই তো আছে—

—কিন্তু ওরা দু-জন তো গোপনে সম্পত্তিটা বেচতে এসেছিল। আর কেউ হয়ত জানে না—

—মানলাম। কিন্তু স্বাভাবিক কি হত? এক্ষেত্রে জীবন নিজেই ট্রাঙ্ক কল করে হেড অফিসে জানাতো, কোন একটা কাজে মালিকের নির্দেশে কলকাতা এসে ওরা ভীষণ বিপদে পড়েছে!

—তা ঠিক!

—তৃতীয়ত, খুনের মামলায় যে লোকটা ফাঁসি যেতে বসেছে সে তার উকিলের মাধ্যমে বাবা-দাদা-স্ত্রী-বন্ধু কাউকে খবরটা জানাবে না? সাহায্য চাইবে না? চতুর্থত, স্ত্রীর আগমন আশঙ্কায় সে অমন শিউরে উঠল কেন? আর সবচেয়ে বড় কণ্ট্রাডিক্‌শান হচ্ছে সুপ্রিয় দাসগুপ্তের চরিত্র-চিত্রণ! পাণ্ডে সাহেবের আঁকা ছবির সঙ্গে মোহনস্বরূপের আঁকা ছবিখানার আশ্‌মান-জমীন ফারাক! আমার মনে হল—দুটো লোক আলাদা। সেটা নিঃসন্দেহ হলাম যখন আলিপুরের হাজতে আসামী তার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করল। তার আগেই অবশ্য আমার সন্দেহ হয়েছিল—ডি. সিল্‌ভার হেপাজতেই আছে আসল সুপ্রিয়। আসামী যদি সুপ্রিয় না হয় তাহলে কখন সে সুপ্রিয়ের চরিত্রে অভিনয় শুরু করেছে? নিঃসন্দেহে এগারোই দুপুরের পরে। কারণ দলিলে নিশ্চয় আসল সুপ্রিয় সই করেছে? সেটা সন্দেহাতীতরূপে দেখে নেবে যদুপতি। অথচ যদুপতি বলছে রাত ন'টা পর্যন্ত সে আসল সুপ্রিয়কে দেখেছে। যদুপতির মিথ্যাভাষণের কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই। সে আসল সুপ্রিয়কে নিশ্চিত চেনে, যেহেতু রেজিস্ট্রেশান অফিসে তাকে সনাক্ত হতে দেখেছে। তাহলে এগারোই রাত ন'টার পর এবং বারই বেলা দশটার আগে—

—কেন, বারই বেলা দশটার আগে কেন?—প্রশ্ন করে সুজাতা।

—যেহেতু বারো তারিখ বেলা দশটায় কৌশিক পার্ক হোটেল থেকে টেলিফোনে জানায় সে সুপ্রিয়কে দেখেছে, যে-সুপ্রিয়কে সে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দেখেছে। ফলে ঐ রাত্রেই মানুষটার বদল হয়েছে। ঐ পার্ক হোটেল থেকেই। অথচ দেখা যাচ্ছে, ঐ বারো তারিখেই বেলা নয়টার সময় ওদের পাশের ঘর থেকে মিস্‌ ডি. সিল্‌ভা তার পাগল ভাইকে নিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে যায়। বাই রোড—দিল্লী রোড ধরে। বাকিটা দুইয়ে দুইয়ে চার···

ঠিক সেই সময়েই একটা প্রকাণ্ড গাড়ি এসে থামল পোর্চে। নেমে এলেন
।কজন সুসজ্জিত যুবক। তাঁকে দেখে সুপ্রিয় উঠে দাঁড়ায়, হ্যালো! আপনি?

ভদ্রলোক গরুড়পক্ষীর মত হাত দুটি জোড় করে বলেন, ছমা মাংতে
।সেছি! ঔর ছিপিয়ে থাকার জরুরৎ না আছে!

সুপ্রিয় বলে, আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি
চ্ছেন…

বাধা দিয়ে কৌশিক বলে, প্রয়োজন হবে না। ওঁর ভাষাতেই আমাদের
ালুম হয়েছে!

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলেন, আমিও আপনাকে পহ্‌চানতে পেরেছি
ুকৌশলীদাদা!

কৌশিক বলে, আপনার গাড়ির ডায়নামো ঠিক হয়ে গেছে?

—বিলকুল!

—আর সেই মাছের কাঁটাটা?

—না পাত্তা!—তারপর হঠাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে কৌশিকের সামনে
াথাটা নিচু করে যোগ করেন, মাথা পাতিয়ে দিলম সুকৌশলীদাদা!
দগর চাহেন তো এক ঝাপ্‌পড় মারুন! লেকিন শালা-বাহানচোৎ করবেন
া।

—বলেই পান-জর্দায় লাল আধ-হাত জিব বার করেন। দুটি হাত কানে
ইয়ে যোগ করেন, সীয়ারাম! বিলকুল নজর হোয় নাই। লেডিস্‌রা আছেন
খানে!

পথের কাঁটা

ইণ্টারকমটায় ভেসে এল মিসেস্ বাসুর কণ্ঠস্বর, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চান—একজন নয়, দুজন—মিস্ নীলিমা সেন আর মিস্টার জয়দীপ রায়। পাঠিয়ে দেব ?

বাসু-সাহেব একটা আইনের বইয়ে ডুবে ছিলেন। সেটা বন্ধ করে বলেন, মক্কেল কে ? মিস্ সেন, না মিস্টার রায় ?

—এখনও বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত যৌথ। জিজ্ঞাসা করব ?

—না থাক। পাঠিয়ে দাও। যুগলেই—

মিস্টার পি কে. বাসু বার-এ্যাট-লকে যাঁরা চেনেন না তাঁদের কাছে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হয়। প্রসন্ন কুমার বাসু একজন অত্যন্ত নাম করা ক্রিমিন্যাল সাইডের ব্যারিস্টার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্রথম যৌবনে প্রভূত উপার্জন করেছেন—ফাঁসীর দড়ি আল্গা করে বহুবার খুনের আসামীকে আদালত থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। তারপর বছর আষ্টেক আগে একটি পথ দুর্ঘটনায় ওঁদের একমাত্র কন্যাটি মারা যায়, মিসেস্ রানী বাসু সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে পড়েন। এ জন্য প্র্যাক্টিস ছেড়ে দিয়েছিলেন বাসু-সাহেব। প্রায় দু-বছর পঙ্গু স্ত্রীকে সাহচর্য দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। তারপর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একদিন অনুভব করলেন—এভাবে বাকি জীবন অতিবাহিত করার কোন অর্থ হয় না। সম্প্রতি বাসু-সাহেব আবার প্র্যাক্টিস শুরু করেছেন। চেম্বারটা তাঁর নিউ-আলিপুরের বসতবাড়ির এক তলায়। তার অপর অংশে, ঐ এক তলাতেই, 'সুকৌশলী'র অফিস। 'সুকৌশলী' একটি প্রাইভেট ডিটেক্টিভ-এজেন্সি। পার্টনারশিপ বিজনেস্। ওঁরাও স্বামী-স্ত্রী মিস্টার কৌশিক মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী সুজাতা। সদ্যবিবাহিত। যাঁরা 'নাগচম্পা' উপন্যাস পড়েছেন অথবা 'যদি জানতেম' ছায়াছবি দেখেছেন তাঁরা জানেন এই কৌশিক আর সুজাতা কী-ভাবে বাসু দম্পতির স্নেহভাজন হয়ে পড়ে। পুনর্মূষিক হবার পর থেকেই ওঁদের জীবন 'কণ্টকাকীর্ণ' হয়ে পড়েছে 'সোনার কাঁটা' বা 'মাছের কাঁটা'র সংবাদ যদি আপনারা না রেখে থাকেন তাহলে আমি নাচার।

দীর্ঘদিন পূর্বে বাসু-সাহেব ব্যারিস্টার এ. কে. রে-র জুনিয়র হি
প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। কলকাতা বারের ঐ প্রবীণতম অবসর...এ
ব্যারিস্টারের কথা 'মাছের কাঁটায়' বলা হয়েছে। তিনিই আদর করে তাঁর
শিষ্যের নামকরণ করেছিলেন : পিয়ারি ম্যাসন অব দ্য ঈস্ট!

যাঁরা ইংরাজি গোয়েন্দা গল্প পড়েন তাঁরা সহজেই বুঝবেন এ নামকরণের পিছনে ইঙ্গিতটা কোথায়। ব্যারিস্টার বাসুর কর্মপদ্ধতি, সওয়াল-জবাব —বস্তুত অভিযুক্তের মুশকিল-আসানের প্রচেষ্টা ঐ পিয়ারি ম্যাসনের ছাঁচে ঢালা। জুনিয়ার কেস সাজিয়ে দেবে, আর আদালতে গিয়ে 'মিলর্ড' বলে 'বাও' করে বক্তৃতা করে কর্তব্য শেষ করার মানুষ তিনি নন। বস্তুতঃ দেখা গেছে অভিযুক্তকে মুক্ত করেই তিনি ক্ষান্ত হন না, প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করতেও উদ্যত হন। সে কাজটা যে ব্যারিস্টারের নয় এ-কথা তাঁকে কে বোঝাবে? সে হিসেবে কৌশিক মিত্রের ভূমিকাটা হচ্ছে 'পল ড্রেক'-এর। আর 'ডেলা স্ট্রীট' এক্ষেত্রে বাসু সাহেবের সেক্রেটারী নন, কৌশিক মিত্রের মিত্রাণী সুজাতা। ওদের গোয়েন্দা অফিসের নামকরণটাও বাসু-সাহেবের করা—নামটায় স্ত্রী ও স্বামীর নামের আদ্য-অক্ষর সুকৌশলে লুকানো আছে। বস্তুতঃ অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে নয়—উত্তেজনাময় জীবনের মাধ্যমে অতীতকে ভুলে থাকা এবং স্ত্রীকে ভুলিয়ে রাখার জন্যই বাসু-সাহেব এই নূতন জীবন শুরু করেছেন। সুকৌশলীর 'সু' এবং 'কৌ' ঐ বাড়িরই দ্বিতলে থাকে—রীতিমত ভাড়া দিয়ে। কিন্তু দুটি পরিবারের হাঁড়ি-হেঁসেল এক। মিসেস রানী বাসুর একমাত্র সন্তানটির মৃত্যু হবার পর এ বাড়িটা খাঁ-খাঁ করত। এই কায়দায় বাসু-সাহেব বাড়িটাকে কলমুখর করে তুলতে চেয়েছেন।

অল্প পরে আগন্তুকদ্বয় প্রবেশ করল বাসু-সাহেবের চেম্বারে। বাসু পাইপটা দিয়ে ওদের সামনের চেয়ার দুটিকে নীরবে দেখিয়ে দিলেন। নমস্কার করে ওরা পাশাপাশি বসল। মেয়েটির বয়স ত্রিশের কোঠায়—শ্যামলা রঙ, গড়নটি চমৎকার। চোখ দুটি বড় বড়—বেশ-বাস ছিমছাম। ছেলেটি দু চার বছরের বড় হতে পারে। অত্যন্ত সুদর্শন এবং সুগঠিত শরীর। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং চোখ-মুখে বুদ্ধিদীপ্ত একটা সপ্রতিভ ভাব। দেখলে মনে হয় সে দু-ঘা দিতে পারে, দু-ঘা নিতেও পারে।

মেয়েটিই প্রথম কথা বলল, আমার নাম—

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বললেন, দু-জনের নামই আমি জানি। প্রয়োজনটা বলুন।

প্রথম কথাতেই বাধা পেয়ে মেয়েটি যেন কিছু ক্ষুব্ধ হয়। তার সঙ্গীর

তাকিয়ে বলে, তুমি বল।

ছেলেটি নড়ে চড়ে বসে। বলে, নীলিমার দাদু মিস্টার জগদানন্দ সেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। বয়স আশীর কাছাকাছি—এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছেন। নীলিমাই তাঁর একমাত্র—কী বলব, ওয়ারিশ। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটেছে···মানে নীলিমা মনে করছে···তার দাদু,

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব প্রশ্ন করেন, আপনি জগদানন্দবাবুর কে হন ?

—আমি ? না আমি কেউই হই না। আমি নীলিমার পাণিপ্রার্থী।

—আই সি। তার মানে সমস্যাটা বর্তমানে একমাত্র নীলিমা দেবীরই ? কেমন ?

—আইনত তা বলতে পারেন আপনি।

—সেক্ষেত্রে—কিছু মনে করবেন না—সমস্যাটা আমি শুধু ওঁর মুখ থেকেই শুনতে চাই।

—আই ডোণ্ড মাইণ্ড ! বল নীলিমা।

মেয়েটি নড়ে চড়ে বসে। সে কিছু বলবার আগেই বাসু-সাহেব বলেন, আই রিপীট—কিছু মনে করবেন না, সমস্যাটা আমি ওঁর মুখ থেকে জনান্তিকেই শুনতে চাই।

ছেলেটি অপ্রতিভ হল না একটুও। হেসে বললে, আই অলসো রিপীট—আই ডোণ্ট মাইণ্ড। আমি বরং বাইরে গিয়ে বসি—

—না বাইরে নয়, ওখানে রদ্দুর। আপনি আমার ল-লাইব্রেরীতে গিয়ে বসুন বরং। টেবিলে অনেক ম্যাগাজিন আছে—সময় কেটে যাবে।

বাসু-সাহেব ইলেকট্রিক বেলটা টিপলেন টেবিলের তলায় হাত চালিয়ে। এসে দাঁড়াল বিশু—ওঁর ছোকরা চাকর। তাকে নির্দেশ দিলেন ঐ ভদ্রলোককে ল-লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে বসাতে এবং ফ্যানটা খুলে দিতে।

জয়দীপের প্রস্থানের পরে বাসু-সাহেব মেয়েটার দিকে তাকালেন। তার মুখটা থমথম করছে। বাসু-সাহেব প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়স কত ?

চোখ তুলে মেয়েটি তাকায়। একটু রূঢ় স্বরে বললে, জয়দীপকে এভাবে তাড়ানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না। তার কাছে আমার গোপন করার কিছু থাকলে তাকে আমি এ-ভাবে সঙ্গে করে এখানে আনতাম না।

বাসু-সাহেব পাইপটা ধরালেন। বিচিত্র হেসে বললেন, তাই বুঝি ? আমি ভেবেছিলাম, আমার প্রথম প্রশ্নের জবাবটাই হয়তো তুমি ওর কাছ থেকে গোপন করতে চাও ! আমার প্রশ্নটার জবাব তুমি এখনও দাও নি। তোমার বয়স কত ?

—চৌত্রিশ।

—কিছু হাতে রেখে বলছ না তো?

মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি শুনেছিলাম আপনি রূঢ়ভাষী; কিন্তু কোর্টে সওয়াল করতে করতে যে ওটা আপনার এমনই বদ-অভ্যাস হয়ে গেছে তা আমি আশঙ্কা করি নি। আচ্ছা চলি, নমস্কার!

বাসু পাইপটা দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, বস! অত রাগ করা ভাল নয়। তোমার মুখ চোখ বলে দিচ্ছে তুমি একটা বিপদের মধ্যে পড়েছ। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। বস! অল রাইট! আই উইথড্র। তোমার বয়স বত্রিশ। মেনে নিলাম। এবার বল।

মেয়েটি বসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে, না বত্রিশ নয়, চৌত্রিশ। দু-বছর আপনাকেও হাতে রাখতে হবে না। আর আমার বয়সটা সঠিক কত তা জয়দীপ জানে!

—ভেরি গুড। এবার বল তোমার দাদুর কথা। তোমার সমস্যার কথা। বস। কি খাবে বল, চা না কফি?

মেয়েটি বসে। বলে, ধন্যবাদ। আপ্যায়ন করতে হবে না। আমি আপনার কাছে সৌজন্য সাক্ষাতে আসিনি, এসেছি ক্লায়েন্ট হিসাবে। সেটুকু মর্যাদা পেলেই আমি খুশি।

—রাগ পড়ে নি তাহলে? আচ্ছা না হয় আমি ক্ষমাই চাইছি।

—ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। ঠিক আছে শুনুন—

নীলিমা সেন যা বলল তা সংক্ষেপে এই:

জগদানন্দ সেনের সমস্ত সম্পত্তি স্বোপার্জিত। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি ছেড়ে যখন পালিয়ে যান তখন তাঁর বয়স আঠারো উনিশ। সে বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে। উনি পালিয়ে যান বর্মা মুলুকে। দীর্ঘ দশ বারো বছর ছিলেন প্রবাসে। ব্যবসায় বেশ কিছু জমিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন উনিশ শ' পঁচিশে। বর্মা থেকে সেগুন কাঠ আসত আর উনি কলকাতার বাজারে তা বেচতেন। রেঙ্গুনে ছিল ওঁর ব্রাঞ্চ অফিস। সেটা দেখা শোনা করতেন একজন বিশ্বস্ত ম্যানেজার—তিনি বর্মী, য়ু সিয়াঙ। তিনিই ওখান থেকে জাহাজে করে সেগুন কাঠ চেরাই করে পাঠাতেন। এভাবেই কেটে গেল আরও বছর পনের। তারপর জাপান বিশ্বযুদ্ধে নেমে পড়ার ঠিক আগে থেকে বর্মা-সেগুন আসা বন্ধ হল; কিন্তু ধুরন্ধর ব্যবসায়ী জগদানন্দ সময়েই সতর্ক হয়েছিলেন। তিনি ঐ সময়ে কাঠের ব্যবসা ছেড়ে ধরলেন লোহার ব্যবসা—হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট। যুদ্ধের ক'বছর শুধু পেরেক আর

কাটাতায় বেচে তিনি বেশ কয়েক লক্ষ টাকা কামিয়ে ফেলেন। বর্মায় থাকতেই একজন স্বজাতের বাঙালী মেয়েকে জগদানন্দ বিবাহ করেছিল। একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল—পুত্র সন্তান, নীলিমার বাবা। তার পরেই ওঁর স্ত্রী মারা যান। জাপান বিশ্বযুদ্ধে নেমে পড়ার বছর খানেক আগে জগদানন্দ তাঁর একমাত্র পুত্রকে বর্মা মুলুকে পাঠিয়ে দেন। সেখানকার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বেচে দেবার জন্য পুত্র সদানন্দকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দেন। সদানন্দ সমস্ত কিছু বিক্রয় করে ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে ফিরে আসে ভারতবর্ষে। কিন্তু সে গিয়েছিল একা, ফিরল যুগলে। ইতিমধ্যে সে রেঙ্গুনে একটি বর্মী মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছে! জগদানন্দ পুত্রকে বাড়িতে ঢুকতে দেন নি। ত্যাজ্যপুত্রই করতে চেয়েছিলেন একমাত্র সন্তানকে। বছর দুই সদানন্দ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। তারপর মহেন্দ্রবাবুর প্রচেষ্টায় পিতাপুত্রে একটা মিলন হয়।

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলেন, মহেন্দ্রবাবুটা কে?

—মহেন্দ্রনাথ বসু। দাদুর কলকাতা অফিসের ম্যানেজার। তিনি আমার বাবার বয়সী। তাঁকেও দাদু প্রায় ছেলের মতই মানুষ করে ছিলেন। ঐ দু বছরের মধ্যে আমার জন্ম হয়েছে এবং আমার জন্মের সময়েই আমার মা মারা যান। বাবার আর্থিক অবস্থা তখন খুব খারাপ। মহেন্দ্রবাবুই একদিন আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন দাদুর কাছে। আমাকে দেখেই দাদুর রাগ জল হয়ে গেল।

—বুঝলাম। এখন তোমার সমস্যার কথাটা বল। এতক্ষণ তো পূর্বকথন শোনাচ্ছিলে।

—পূর্বকথন আরও কিছুটা শোনাতে হবে। না হলে বর্তমান সমস্যার পারম্পর্যটা আপনি ধরতে পারবেন না। শুনুন—

সদানন্দ মারা যান আরও বছর পাঁচেক পরে। নীলিমা তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। বাবার মৃত্যুর কথা অল্প অল্প মনে আছে তার—কিন্তু তার পরের কথা আরও স্পষ্টভাবে মনে আছে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন জগদানন্দ। ব্যবসা-পত্র নিজে কিছুই দেখতে পারেন না। নাতনিকে নিয়েই তাঁর দিন কাটে। এভাবেই কাটল আরও দু-বছর। তারপর কি-একটা কারণে জগদানন্দের সন্দেহ হল। একদিন তিনি খাতাপত্র দেখতে বসলেন। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, ইতিমধ্যে মহেন্দ্র যেন বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে ফেলেছে ব্যবসায় থেকে। হিসাব মেলাতে পারলেন না মহেন্দ্রবাবু। আইনতঃ কিছু করবার অধিকার ছিল না জগদানন্দের—কারণ পুত্রের মৃত্যুর

পর শোকাহত জগদানন্দ তাঁর ম্যানেজারকে জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে রেখেছিলেন। মহেন্দ্র কৌশলী লোক—খাতাপত্রে সে লোকসানও দেখিয়ে গেছে আইন মোতাবেক, কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে, সেটা ওর কারসাজি। তহবিল তচরুপের মামলা আনলেন না জগদানন্দ। তৎক্ষণাৎ অপমান করে তাঁর বিশ্বস্ত ম্যানেজারকে বিদায় করে দিলেন। মহেন্দ্র প্রতিশোধ নেবে বলে শাসিয়ে চলে যায়, আর ফেরে নি। এর পর গত পঁচিশ বছর তার কোন খবর ছিল না। হঠাৎ গত সপ্তাহে তার নাটকীয় আবির্ভাব ঘটে। নীলিমা তাকে চিনতেই পারেনি—না চেনাই স্বাভাবিক। মহেন্দ্রবাবু এ পরিবার ছেড়ে যখন চলে যান তখন নীলিমার বয়স মাত্র আট নয় বছর। এমন কি জগদানন্দও এই ষাট বছরের বৃদ্ধের ভিতর তাঁর সেই যুবক ম্যানেজারকে খুঁজে পান নি। মহেন্দ্র তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল, বুড়ো কর্তা, আপনি আমাকে চিনতেই পারলেন না? কিন্তু আমি যাবার দিনে তো বলে গিয়েছিলাম আবার আমি ফিরে আসব! আমি মহেন্দ্র!

এর পরের ইতিহাস নীলিমা বিস্তারিত জানে না। এটুকু দেখেছে মহেন্দ্র সেই যে এসে ঢুকেছেন, আর বাড়ির বার হন নি। আরও দেখেছে—ঐ ঘটনার পর থেকে দাদু যেন কী, একটা আতঙ্কে একেবারে কাঁটা হয়ে আছেন। ব্যাপারটা কী, তা সে জানে না—কিন্তু বুঝতে পারছে যে, বৃদ্ধ জগদানন্দ একটা প্রচণ্ড আতঙ্কের তাড়নায় একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছেন। এইটাই নীলিমার সমস্যা।

—কী জাতীয় সাহায্য তুমি চাও আমার কাছে?

—দাদু হঠাৎ এমন বদলে গেছেন কেন সেই রহস্যটা উদ্ধার করতে চাই আপনার সাহায্যে।

বাসু বললেন, আমি গোয়েন্দা নই, আমি হচ্ছি ক্রিমিনাল উকিল। এ-ক্ষেত্রে আমার সাহায্য তো তুমি আশা করতে পার না। তবে আন্দাজে বলতে পারি, ঐ মহেন্দ্র বোস তোমার দাদুকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে। তোমার দাদুর অতীত জীবনের কোনও ঘটনার কথা সে প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখাচ্ছে।

—তাহলে গত পঁচিশ বছর সে সেটা দেখায় নি কেন?

—আমার ধারণা, সেই গোপন ঘটনার কথা যে মহেন্দ্র জানে এটা জানা ছিল তোমার দাদুর—কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল মহেন্দ্র সেটা প্রমাণ করতে পারবে না। মহেন্দ্র নিশ্চয়ই অতি সম্প্রতি সেই গোপন ব্যাপারের কোন অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। সেই নথীপত্র নিয়ে এসে হাজির হয়েছে তোমার দাদুর কাছে।

—আমারও তাই অনুমান; কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে? পঁচিশ

বছর পরে সবকিছুই তো তামাদি হয়ে যায়।

—তা যায় না। ধর একটা মার্ডার কেস। পঁচিশ বছরে সে অপরাধ তামাদি হয়ে যায় না!

—আপনি কি বলতে চান আমার দাদু মানুষ খুন করেছিলেন?

—ডিড আই সে দ্যাট? তবে ঐ জাতীয় এমন কিছু তিনি করেছিলেন যে অপরাধ পঁচিশ বছরে তামাদি হয়ে যায় না। তোমাকে আগেই বলেছি, এক্ষেত্রে আমি তোমাকে খুব বেশি কিছু সাহায্য করতে পারব না—কিন্তু তোমার এক্ষেত্রে কী করণীয় তা সাজেস্ট করতে পারি। দাদুকে ঐ আতঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিতে তোমার কোন প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। সে খুঁজে বার করবে গোপন রহস্যটা কী, কেমন করে মহেন্দ্র সেটা সংগ্রহ করেছে—এবং হয়তো সে তোমাকে পরামর্শও দিতে পারবে কেমন করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

—কলকাতায় এমন প্রাইভেট গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান আছে নাকি? আপনি সন্ধান দিতে পারেন?

—পারি। এই বাড়িরই অপর উইং-এ আছে 'সুকৌশলী'র অফিস। সেখানে কৌশিক মিত্র এবং সুজাতা মিত্র পার্টনারশিপ বিজনেসে এ জাতীয় কাজ করে। ওরা আমারই লোক। তুমি যদি চাও, তাহলে আমি যোগাযোগ করে দিতে পারি।

—প্লীজ স্যার—

বাসু-সাহেব ইন্টারকমের মাধ্যমে কৌশিককে সংবাদটা জানিয়ে দিলেন। মেয়েটি নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেই বললেন, আর একটা কথা আছে। আমাকে যেসব কথা বললে তা ঐ জয়দীপ ছেলেটি জানে?

—জানে।

—তোমার দাদু জানেন তোমাদের দু-জনের সম্পর্ক?

—জানেন – তিনি রাজী হচ্ছেন না বলেই ব্যাপারটা পিছিয়ে যাচ্ছে।

—রাজী হচ্ছেন না? কেন?

বিচিত্র হাসল মেয়েটি। তারপর বললে, যে কারণে কানা খোঁড়া না হওয়া সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি থুবড়ি হয়ে আছি!

—বুঝলাম না।

—যার সঙ্গেই আমার বিয়ের কথা হয়, দাদু ভেবে বসেন যে, সে আমাকে শুধু টাকার জন্য বিয়ে করতে চাইছে। আমার মনে হয়, দাদুর জীবদ্দশায় আমাদের বিয়েটা আদৌ হবে না। এটা ওঁর একটা, কী বলব? ম্যানিয়া!

—অর্থাৎ তোমার দাদুর বিশ্বাস যে, জয়দীপও শুধুমাত্র টাকার লোভে তোমাকে বিবাহ করতে চাইছে ?

—হ্যাঁ তাই।

—ও কী করে ? কে আছে ওর পরিবারে ?

—ও মোটামুটি একাই। বাবা-মা নেই। এক দাদা আছেন, এক বোনও আছে। দাদা পৃথক সংসার করেন, বোনও বিবাহিত। ও বিজনেস করে। মোটামুটি সচ্ছল। তবে আদর্শের বাতিক আছে। ঘুষ-ঘাসের মধ্যে যেতে চায় না। তাই ব্যবসায় উন্নতি করতে পারছে না।

—তোমার সঙ্গে কতদিনের আলাপ ?

—তা বছর তিনেকের হবে।

—একটা কথা। জয়দীপ কী ঘরজামাই হয়ে তোমাদের বাড়িতে থাকতে রাজী হতে পারে ?

নীলিমা আবার বসে পড়ে। বলে, হঠাৎ এ কথা কেন ?

—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে তোমার দাদু তোমার বিয়ে দিতে রাজী হচ্ছেন না—তোমাকে হারাবার ভয়ে। তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে বাড়িতে তিনি একেবারে একা হয়ে পড়বেন।

নীলিমা মাথা নাড়ল। বললে, না। তা নয়। ঐ ম্যানিয়ার জন্যই। তাছাড়া আমাদের বাড়ি ফাঁকা নয়। আমার এক সম্পর্কে কাকা আছেন। তাঁর এক শ্যালিকা-পুত্রও ঐ বাড়িতে থাকে। বাড়ি আমাদের ফাঁকা নয়।

—আই সী !

ইতিমধ্যে ছোকরা চাকরটা জয়দীপকে লাইব্রেরী থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে। বাসু-সাহেব বললেন, আপনাকে একা বসিয়ে রেখেছি বলে দুঃখিত। এটা আমার প্রফেশনাল এথিক্স !

জয়দীপ নমস্কার করে বললে, আমার কোনই অসুবিধা হয় নি। লাইফ ম্যাগাজিনে একটা ভাল প্রবন্ধ পড়া গেল।

দুই

দিন তিনেক পরে কৌশিক এসে বাসু-সাহেবকে বলল, বরাতে নেই কো ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কী ? আপনি এমন একটি শাঁসালো মক্কেল পাঠালেন আমার কাছে, অথচ সেটা বুমেরাঙের মত আবার আপনার হাতেই ফিরে এল।

—কী হল আবার ? কোন্ কেসটা ?

—ঐ যে লোহার দালাল জগদানন্দের ব্ল্যাকমেলের কেসটা। নীলিমা

দেবী দিন তিনেক আগে আমাকে এনগেজ করলেন। সবে ভাঁকিয়ে তদন্ত শুরু করেছি, আজ এসে বলছেন ওটা স্থগিত রাখতে।

—কেন? সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে?

—তাই অনুমান করা যাচ্ছে। এবার ওঁরা এসেছেন আপনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে। জগদানন্দ একটি দলিল তৈরী করতে চান আপনার পরামর্শ মত। আন্দাজ করছি—ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে টাকায় খেসারত দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চান।

—এবারও কী ওরা যুগলে এসেছে? কোথায়?

—আমার অফিসে বসিয়ে রেখে এসেছি, দু'জনকেই।

—ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও—না, সঙ্গে করে নিয়ে এস।

একটু পরে কৌশিক ওদের দু-জনকে নিয়ে ঢুকল। জয়দীপ নমস্কার করে বলল, আপনার লাইব্রেরী ঘরটা খোলা আছে নিশ্চয়?

বাসু-সাহেব বললেন, এবার আর তার দরকার হবে না। সেবার কেসটা জানতাম না। তাই আমার ক্লায়েন্টের স্বার্থে আপনাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম; কিন্তু আমার ক্লায়েন্ট তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে জানিয়েছেন যে, আপনি তাঁর কাছের মানুষ! বসুন আপনিও।

নীলিমা চেয়ারে গুছিয়ে নিয়ে বসে। বলে, আজ কিন্তু আমি আপনার ক্লায়েন্ট নই। আমি ক্লায়েন্টের তরফে কথা বলতে এসেছি। আমি দূতমাত্র। ফলে আজ নিশ্চয়ই আপনার বাক্যবাণে বিদ্ধ হব না। দূত মাত্রেই অবধ্য!

বাসু হেসে বলেন, হ্যাঁ, দূত মাত্রেই অবাধ্য! সেদিন অত করে অনুরোধ করলাম, তবু আজও রাগ পুষে বসে আছ। যাই হোক বল, কী খবর?

—আপনার নিমন্ত্রণ! আজ সন্ধ্যা সাতটা পাঁচের পর থেকে সাতটা পঁয়তাল্লিশ, কিম্বা আগামীকাল বেলা এগারোটা সতের গতে—

—এ হপ্তায় এ-দুটিই বিবাহের লগ্ন আছে বুঝি?

—বিবাহ! কার?

—তবে এগারোটা সতের গতে কিসের নিমন্ত্রণ?

বুঝিয়ে বলে নীলিমা। জগদানন্দ পঞ্জিকা মেনে চলেন। ঐ দুটি সময় হচ্ছে তাঁর ঠিকুজি-কুষ্ঠি অনুসারে শুভ লগ্ন। ঐ সময়েই তিনি একটি জরুরী দলিলে সই দিতে চান। তার পূর্বে পি. কে. বাসু বার. অ্যাট. ল. যদি অনুগ্রহ করে দলিলটা দেখে দেন, তবে জগদানন্দ কৃতকৃতার্থ থাকবেন। শুধু দলিলের যাথার্থ্য নয়, উকিল হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যই নয়—ঐ সঙ্গে তিনি কিছু আইন-ঘটিত পরামর্শও নিতে চান। জগদানন্দ ঊন-আশী বছরের বৃদ্ধ হলেও

এখনও কিছু চলচ্ছক্তিহীন নন—তিনি নিজে আসতে পারেন। তবে বাসু-সাহেব তাঁর বাড়িতে গেলেই উনি খুশি হবেন।

সব শুনে বাসু-সাহেব বলেন, দলিলটা কিসের তা আন্দাজ করতে পারছ ?

—না। তবে বাড়িতে আরও একজন অতিথি বেড়েছেন। উকিল বিশ্বম্ভর রায়। তিনি মহেন্দ্রবাবুরই অতিথি। ফলে আমাদেরও।

—এত উকিল থাকতে হঠাৎ আমাকে কেন ? তোমরা 'সাজেস্ট' করেছিলে ?

—না। দাদুর সলিসিটার ছিলেন ব্যারিস্টার এ. কে. রে-র এ্যাটর্নি-ফার্ম। রে-সাহেব অবসর নিয়েছেন। উনিই নাকি আপনার নাম দাদুকে বলেছেন।

—ঠিক আছে। আমি আজই সন্ধ্যার পর যাব। কৌশিকও থাকবে আমার সঙ্গে। তোমাদের ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে যাও।

—তা দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু ঘূণাক্ষরেও তাঁকে জানাবেন না যে, আমরা ইতিপূর্বে আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আজই আপনাদের সঙ্গে আমাদের দু-জনের পরিচয়। পূর্বকথা আপনি কিছুই জানেন না।

—বুঝলাম। আচ্ছা তোমার দাদু বোধহয় হাঁচি-টিকটিকি পাঁজিপুঁথি মেনে চলেন ?

—তা চলেন। এজন্য মাহিনা-করা একজন গ্রহাচার্যও আছেন তাঁর। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের জন্মপত্রিকায় বাঁধা।

সন্ধ্যার পর বাসু-সাহেব নিজেই ড্রাইভ করে কৌশিককে নিয়ে এলেন। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা দ্বিতল বাড়ি। সাবেক ডিজাইন। দু-খানি ঘর বর্তমানে দখল করেছেন মহেন্দ্র-কাম-বিশ্বম্ভর পার্টি। দ্বিতলে দক্ষিণের বড় ঘরখানা কর্তামশায়ের। ঠিক তার বিপরীতে নীলিমার ঘর।

গাড়িটা পোর্চে এসে দাঁড়াতেই নেমে এল নীলিমা। বললে, আসুন। দাদু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। গাড়ি থেকে নামতেই কৌশিকের নজর হল দ্বিতলের একটি ঘরের বন্ধ-জানালার খড়খড়ি হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠল। না দেখলেও তার ওপাশে দু-জোড়া কৌতূহলী চোখ যে তীব্র আগ্রহ নিয়ে ওদের লক্ষ্য করছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না কৌশিকের। মার্বেল পাথরে বাঁধানো চওড়া করিডর, প্রশস্ত সিঁড়ি। জানালা-দরজা, সিঁড়ির হাতল সবই পালিশ করা বর্মা সেগুনের। তা তো হবেই। বাড়িটি যে-আমলের তখন

কাঁটা-

বুড়ো কর্তা ছিলেন বর্মা-টীকের রাজা।

জগদানন্দের দ্বিতলের ঘরটি প্রকাণ্ড। ইটালিয়ান-মার্বেলের সাদা-কালো চৌখুপিকাটা মেজে। ঘরের আসবাবপত্র মধ্য ভিক্টোরিয় যুগের। সবই পালিশ-করা বর্মা সেগুন। ঘরের একদিকে ডবল বেড খাট। এ পাশে শ্বেতপাথরের নিচু টেবিল ঘিরে সোফা-সেট। ও পাশে আয়না-বসানো কাঠের আলমারি, বইয়ের র‍্যাক। এত আসবাবেও ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে—মাপে সেটা এতই বড়।

পর্দা সরিয়ে ওঁরা প্রবেশ করতেই যুক্তকরে ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন গৃহস্বামী। দেখলে মনে হয় না তাঁর বয়স উন-আশি। বরং ষাটের ঘরে বলে মনে হয়। মাথার চুল ধপধপে সাদা, গালে খাঁজও পড়েছে—কিন্তু একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন। ঘরের ভিতর চলাফেরা করছেন বিনা লাঠিতে। ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি সামারকুল গেঞ্জি, পরনে কোঁচানো ধুতি। বাঁ-হাতে একাধিক কবচ ও মাদুলি। দু হাতে সর্বসমেত গোটা-পাঁচেক আংটি প্রবাল, পোকরাজ, নীলা—একটা বোধহয় হীরাও। অলঙ্করণের গূঢ় উদ্দেশ্য অবশ্য গ্রহশান্তির প্রয়োজনে।

আপ্যায়ন করে গৃহস্বামী ওঁদের বসালেন। তাঁর নির্দেশে নীলিমা একটি সৌখিন কাজ-করা কাঠের বাক্স এনে রাখল শ্বেত পাথরের টেবিলে। ডালাটা খুলে দেওয়ায় দেখা গেল তার ভিতর আছে চুরুট, সিগারেট, দেশলাই এবং ভাজা-মশলা—বিভিন্ন খোপে।

বাসু-সাহেব বললেন, ধন্যবাদ। আমি পাইপ খাই।

গৃহস্বামী বললেন, আপনার নাম আমার জানা ছিল। কাগজে কয়েকটি বিচিত্র ফৌজদারী মামলায় আপনার নাম দেখেছি! পরিচয় ছিল না। আমার আইনঘটিত পরামর্শ এককালে দিতেন ব্যারিস্টার এ. কে. রে। গত বিশ বছরের ভিতর আর আইন-ঘটিত কোন পরামর্শ নেবার প্রয়োজনই হয় নি। রে-সাহেব আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়ই হবেন। কিন্তু বুড়িয়েছেন আমার চেয়ে অনেক বেশী। তিনিই আপনার নাম করলেন, কিন্তু এঁকে তো—

—ও আমার সহকারী। নাম কৌশিক মিত্র। আমার কনফিডেন্সিয়াল কাজকর্ম ওই দেখা শোনা করে। আমার সামনে যা বলতে পারেন, তা ওর সামনেও বলতে পারেন।

—না না, গোপন ব্যাপার তেমন কিছু নয়। একটা সাদা-মাটা দলিল আচ্ছা নীলুদিদি—তুমি একটু জলখাবারের আয়োজন কর—আমি ততক্ষণ এঁকে বৈষয়িক ব্যাপারটা বোঝাই।

বাসু-সাহেব আপত্তি জানান, না না, জলখাবারের প্রয়োজন নেই—

গৃহস্বামী যুক্তকরে বলেন, প্রয়োজনটা আপনার নয়, আমার। াতিথি যদি মুখে কুটোটি না কাটেন গ্রহ কুপিত হন। গৃহস্থের ়কল্যাণ হয়!

বাসু-সাহেব গ্রাগ করলেন। নীলিমা চলে গেল।

জগদানন্দ একটি চেয়ারে ঘনিয়ে এসে বসলেন। বললেন, ব্যাপারটা ামান্য। অনেক অনেকদিন আগে আমি আমার একজন ম্যানেজারকে কর্ম-্যুত করেছিলাম। তা ধরুন পঁচিশ বছর আগে। চাকরি থেকে বরখাস্ত চরার কারণটা হচ্ছে এই যে, আমি মনে করেছিলাম তিনি তহবিল তছরূপ চরেছেন। তাঁকে আমার জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া ছিল। মামার অজ্ঞাতে তিনি কিছু সম্পত্তি বেচে দেন এবং টাকাটা আমার অ্যাকাউন্টে ঠক মত জমা দেন না। সেটা যখন আমি টের পেলাম তখন তাঁকে ডেকে টার কৈফিয়ৎ তলব করলাম। উনি সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পেশ করতে পারেন নি। ফলে তাঁকে বরখাস্ত করি। আজ পঁচিশ বছর পরে তিনি ফিরে এসে প্রমাণ দাখিল করছেন যে, তিনি আদৌ কোনও তহবিল তছরূপ করেন না। তাঁর কৈফিয়ৎ এখন আমি মিলিয়ে দেখেছি—বুঝেছি আমারই অন্যায় হয়েছিল। এজন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবী করেছেন। আমি সেটা তাঁকে দিতে রাজী হয়েছি। এই ক্ষতিপূরণটা একটা লেখাপড়ার মাধ্যমে আমি করতে চাই—যাতে ঐ দাবী নিয়ে ম্যানেজার ভদ্রলোক আবার না পরে একদিন এসে হাজির হন। আপনাকে তার একটা ড্রাফট করে দিতে হবে। নিজে উপস্থিত থেকে এবং মধ্যস্থ হয়ে এই ব্যাপারটা চুকিয়ে দিতে হবে।

—বুঝলাম। এবার একটু বিস্তারিত করে বলুন।

জগদানন্দ যেটুকু বিস্তার করলেন তাতে প্রকাশ পেল—দাবীদারের নাম. বোঝা গেল তিনি এ বাড়িতেই বর্তমানে আছেন। একা নন, স-উকিল। এর বেশি কিছু ভাঙলেন না তিনি।

বাসু বলেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

—না, যাচ্ছে না। উনি যখন বরখাস্ত হন তখন ওঁর মাসিক বেতন ছিল চারশ' টাকা; বয়স ছিল চৌত্রিশ। উনি যদি ঐ বেতনেই পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে চাকরি করতেন তবে তাঁর নেট পাওনা হত পৌনে একলাখ টাকা। অ্যানুইটির হিসাব করলে আজ পঁচিশ বছরে তাঁর লোকসানটা হয়তো লাখ দুই টাকা দাঁড়াবে।

বাসু বলেন, তা হতে পারে। কিন্তু তিনি তো কাজ করেন নি আপনার ম্যানেজার হিসাবে। আপনার ঐ ফর্মুলা অনুসারে হিসাব করলে দেখতে হবে চারশ' টাকার মাইনের চাকরি হারিয়ে বাস্তবে উনি কত রোজগার করেছিলেন। ধরুন যদি তিনি তখনই একটা তিনশ' টাকা মাইনের চাকরি ধরেন, তাহলে তাঁর মাসিক লোকসান হয়েছে একশ'। আপনার হিসাবমত তাঁর ক্ষতির নেট পরিমাণ প্রায় বিশ হাজার টাকায় নেমে আসে।

জগদানন্দ একটি চুরুট ধরিয়ে বললেন, টাকাটা যখন আমি দিতে রাজী তখন আর আপনার আপত্তি কিসের ?

—আপত্তি এইজন্য যে, আমার মনে হচ্ছে আপনি সব কথা বলছেন না—বেশ কিছু গোপন করছেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জগদানন্দ বলেন, ধরা যাক, আপনার কথাই সত্য। তাতেই বা আপনার আপত্তি কি ? আপনি তো ক্ষতিপূরণের একটা দলিলের মুশাবিদা করে দেবেন শুধু।

বাসু-সাহেব বললেন, সে-ক্ষেত্রে আপনি রাম-শ্যাম-যদুকেই বা ডেকে পাঠালেন না কেন ? এমন মামুলি দলিল তো যে-কোন উকিল তৈরী করে দিতে পারে আপনাকে। তার জন্য ব্যারিস্টার এ. কে. রে-র সাগরেদকে এগিয়ে আসতে হবে কেন ?

জগদানন্দ চোখ বুজে মিনিট খানেক কি-যেন ভেবে নেন। তারপর বলেন, ডাক্তারের কাছে রোগ আর সলিসিটারের কাছে আইনের ফাঁক গোপন করতে নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে বলেই না নিয়মটাকে নিয়ম বলে মানি। এখানে আমাকে কিছু গোপন করে যেতে হচ্ছে—আমি স্বীকার করছি—কিন্তু কী গোপন করছি তা আমি স্বীকার করতে পারি না। না, আপনার কাছেও নয়।

বাসু পাইপটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, অর্থাৎ প্রকারান্তরে আপনি স্বীকার করলেন ঐ মহেন্দ্র এসেছে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে—এবং আপনি তার হাত থেকে রেহাই পেতে চান ?

—ধরুন তাই।

—এ-ক্ষেত্রে আপনি স্বতঃই চাইবেন, ক্ষতিপূরণের দলিলটা এমনভাবে প্রস্তুত হ'ক যাতে ঐ লোকটা টাকা পাওয়ার পরেও যেন আপনাকে এ শোষণ করতে না পারে। কেমন তো ?

—স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত।

—সে-ক্ষেত্রে আপনার গোপন তথ্যটা কী, তা না জানলে আমি কেমন

করে আপনাকে রক্ষা করব ?

—মাপ করবেন—সেটা আমি বলব না, বলতে পারি না।

—ধরুন আপনি যৌবনে একটা খুন করেছিলেন—আজ পঁচিশ বছর পরে মহেন্দ্র এসেছে সেই খুনের একটা অকাট্য প্রমাণ নিয়ে। আপনি ক্ষতিপূরণ দিয়ে তো মার্ডার-চার্জ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন না।

জগদানন্দ হেসে বলেন, আপনার উদাহরণটা ভুল। যৌবনে আমি কোন খুন করি নি—তার অকাট্য প্রমাণ নিয়েও আসে নি মহেন্দ্র। কিন্তু এটা তো নিশ্চিত—ক্ষতিপূরণটা দেবার সময় আমি ঐ অকাট্য প্রমাণটাও নিয়ে নেব—মানে যদি আপনার উদাহরণটাই সত্য হয়।

—কারেক্ট! কিন্তু তার একটা ফটোস্ট্যাট কপি ওর কাছে থেকে যেতে পারে!

ভ্রূকুঞ্চিত হয় জগদানন্দের। অনেকক্ষণ নীরবে ধূমপান করেন তিনি। তারপর মনস্থির করে বলেন, না। সে রিস্‌ক আমিই নেব। আপনাকে বলা যাবে না।

—এ-ক্ষেত্রে আমি আপনার কেসটা নিতে পারি না।

জগদানন্দ বিচিত্র হেসে বললেন, তাহলে এ আলোচনার এখানেই শেষ। আমি অন্য কোন উকিলের সন্ধানই করব। আপনার ভিজিটটা এনে দিই। আর আমার যুক্তকর নিবেদন—জলখাবারটা আপনাদের খেয়ে যেতে হবে।

জগদানন্দ উঠে গেলেন। আলমারি খুলে একটি চেকবই বার করে আনলেন। বাসু বলেন, দাঁড়ান। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি আগে। জবাব না দিতে চান দেবেন না, কিন্তু জবাবে যেটুকু বলবেন তা সত্য করেই বলবেন।

কৌতুক উপচে পড়ল জগদানন্দের দু-চোখে। বলল, সওয়াল-জবাবের মাধ্যমে রহস্য উদ্ঘাটন! বেশ! করে দেখুন; কিন্তু সেটা পণ্ডশ্রম হবে মিস্টার বাসু! আমি ঘাঘু ব্যবসায়ী। এই করে চুল পাকিয়েছি। ও-ভাবে আমার পেটের কথা আপনি বার করতে পারবেন না।

বাসু-সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, আপনি বর্মা থেকে শেষ কবে ফিরে এসেছিলেন?

—ওরে বাবা! সে তো বহু-বহুদিন আগে। উনিশ শ' পঁচিশে। তখন—মানে নীলুর বাবা তখন দু-বছরের। তারপর আমি আর বর্মায় যাই নি।

—সদানন্দবাবুই বড় হয়ে বর্মার কাজ দেখাশোনা করতে যেতেন?

—না। বর্মার কাজ দেখাশোনা করতেন আমার সেখানকার ম্যানেজার

য় সিয়াঙ। সদানন্দ একবারই মাত্র বর্মায় যায়, মানে তার সেই ছেলেবেলার কথা বাদ দিলে। ওর জন্ম ওখানেই।

—একবারই যান, মানে ঐ বিজনেস গুটিয়ে নিতে—সবকিছু বেচে দিয়ে আসতে ?

—হ্যাঁ। জাপান বিশ্বযুদ্ধে নেমে পড়ার আগেই আমার আশঙ্কা হয় এমন একটা কিছু ঘটতে পারে। ঐ সময়ে লোহার ব্যবসায়ে আমার টাকারও প্রয়োজন ছিল প্রচুর। তাই সদুকে স্পেশাল পাওয়ার-অফ্ অ্যাটর্নি দিয়ে বর্মায় পাঠিয়ে দিই, মাসখানেক সে ওখানে ছিল। সবকিছু বিক্রি করে ব্যাঙ্ক ড্রাফট নিয়ে সে ফিরে আসে।

—কত টাকায় বর্মার সম্পত্তি বিক্রি হয় ?

—ঘর-বাড়ি, স্টক এবং গুড-উইল সমেত প্রায় সত্তর হাজার টাকায়।

—ব্যাঙ্ক-ড্রাফটের নাম্বারটা আমায় দিতে পারেন ?

—কি হবে সে নম্বর দিয়ে ?

বাসু মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, এমন সর্ত তো ছিল না সেন-মশাই। আপনার কোন প্রতিপ্রশ্ন করার অধিকার নেই। হয় সত্য জবাব দেবেন, অথবা জবাব দিতে অস্বীকার করবেন।

জগদানন্দ হাসলেন। বললেন, ঠিক কথা। ব্যাঙ্ক ড্রাফট-এর নম্বরটা আপনাকে দিতে পারি। এখনই চান ?

—ইয়েস।

জগদানন্দ তাঁর কাঠের আলমারিটা খুললেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পুরাতন ইনকাম-ট্যাক্স ফাইল হাতড়ে নম্বরটা দাখিল করলেন। ব্যাঙ্ক অফ বার্মা ড্রাফট্ দিচ্ছেন কলকাতার লয়েডস্-ব্যাঙ্কের উপর। টাকার অঙ্ক একাত্তর হাজার পাঁচশ বত্রিশ টাকা তিন আনা। তারিখ আঠারই মে, 1940। বাসু সাহেব নোটবুকে টুকে নিলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। আমি আপনার কাজটা করবার দায়িত্ব নিচ্ছি। ড্রাফট আমি করে দেব। এবার বরং মহেন্দ্রবাবু এবং বিশ্বম্ভরবাবুকে ডেকে পাঠান।

জগদানন্দ বললেন, গোপন তথ্যটা না জেনেই রাজী হলেন ?

—ওটা তো কালকেই জানতে পারব। ব্যাঙ্ক খুললেই।

হো হো করে হেসে উঠলেন জগদানন্দ। বললেন, আপনার আশা যে মহেন্দ্র আমাকে কী সূত্রে ব্ল্যাকমেল করছে তা আপনাকে জানিয়ে দেবে লয়েডস ব্যাঙ্ক ?

বাসু কঠিন স্বরে বললেন, আগামী কাল এই সময় এসে সেটা অন্ততঃ আমি

আপনাকে জানিয়ে যাব। এবার ডাকুন ওঁদের।

জগদানন্দ স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টে দেখতে থাকেন বাসু-সাহেবকে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, অসম্ভব বাসু-সাহেব! আই এ্যাকসেপ্ট য়োর চ্যালেঞ্জ! পঁচিশ বছর সময় লেগেছে মহেন্দ্রর—তাও সে আমার নাড়ি-নক্ষত্র জানত। আপনার পক্ষে এটা অসম্ভব!

বাসু-সাহেব ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

অল্প পরেই এলেন মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভরবাবু।

মহেন্দ্রবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি। এক মাথা কাঁচা-পাকা কদম-ছাঁট চুল। ঝোলা গোঁফ, আর ঘন ভ্রূ। চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় লোকটা ধূর্ত এবং সাবধানী। অপর পক্ষে বিশ্বম্ভরের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রীতিমত হৃষ্টপুষ্ট--মোটাই বলা চলে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। কাপড়-জামায় দেহের যেটুকু ঢাকা পড়ে নি সেখানে মেদের বাহুল্য নজরে পড়ে। জগদানন্দ ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মহেন্দ্র হাত তুলে নমস্কার করল। বিশ্বম্ভর একটা কাগজে নিবদ্ধ দৃষ্টি থাকার অজুহাতে নমস্কার করার হাত এড়ালো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁরা আলোচনায় ডুবে গেলেন।

কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হওয়া গেল না। মতদ্বৈধ দেখা দিল। বিশ্বম্ভর একটি ড্রাফট্ করে এনেছিলেন—সেটাই হল আলোচনার মূল সূত্র। বাসু-সাহেব বললেন, না, ঐ সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুকে বলতে হবে তিনি জগদানন্দের ওয়া-রিশদেরও ভবিষ্যতে ঐ দাবী নিয়ে বিব্রত করতে পারবেন না।

বিশ্বম্ভর বললেন, মামলা হচ্ছে এমপ্লয়ার আর এমপ্লয়ীর মধ্যে---এর ভিতর ওয়ারিশদের প্রসঙ্গ আসবে কী করে?

—সেটা আমাদের বিবেচ্য। ওঁকে দ্বিতীয়তঃ লিখে দিতে হবে---কোন অজুহাতেই তিনি জগদানন্দ অথবা তাঁর ওয়ারিশদের কাছে কোন দাবী নিয়ে কোনদিন উপস্থিত হবেন না।

বিশ্বম্ভর চটে উঠে বললে, এ যে অন্যায় দাবী করছেন মশাই! অতীতে আমার মক্কেলের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে এখন তারই ফয়শালা করছি আমরা। ভবিষ্যতে জগদানন্দবাবু যদি আমার মক্কেলের প্রতি নতুন কোন অন্যায় করেন, তবে তাঁকে মুখ বুঁজে সয়ে যেতে হবে?

বাসু-সাহেব বললেন, তৃতীয়তঃ ওঁকে আরও স্বীকার করতে হবে যে, ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানে যদি পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, আমার মক্কেল জগদানন্দ বুঝতে পারেন আপনার মক্কেল মহেন্দ্রবাবু সত্যই তহবিল তছরূপ করেছিলেন তাহলে তদানীন্তন ব্যাঙ্ক-রেট সুদ সমেত ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা মহেন্দ্রবাবু প্রত্যর্পণের

জন্য বাধ্য থাকবেন !

বিশ্বম্ভর উঠে দাঁড়ান চেয়ার ছেড়ে। বাসু-সাহেবকে ডিঙিয়ে জগদানন্দকে বলেন, আপনি যদি ফয়শালা করতে না চান সেটা সম্পূর্ণ পৃথক কথা। আমরা অন্য পন্থার আশ্রয় নিতে বাধ্য হব। ইনি যা দাবী করছেন তা অযৌক্তিক। অন্ততঃ গতকাল এসব ফ্যাকড়া আপনি তোলেন নি।

জগদানন্দ বলেন, আচ্ছা আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আমি ওঁকে বুঝিয়ে বলছি।

বাসু-সাহেবকে নিয়ে জগদানন্দ চলে গেলেন পাশের ঘরে। বললেন, এসব ফ্যাকড়া তুলছেন কেন ?

—স্বাভাবিক কারণে। ধরুন যদি খেসারতের টাকাটি নিয়ে ও আবার আসে। আপনার যে গোপন ব্যাপারটা আছে সেটা প্রকাশ করে দেয়—প্রমাণ নাই করতে পারুক, স্ক্যাণ্ডেল ছড়াবার চেষ্টা করে তখন একটা 'শো-ডাউন' অনিবার্য হয়ে পড়বে। তখন মামলা করে ওর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি দাবী করতে পারবেন। সে-টাকা আদায় হবে না, কিন্তু সেই ভয়ে ও স্ক্যাণ্ডালটাও ছড়াতে সাহস পাবে না।

জগদানন্দ ব্যাপারটা ভেবে দেখেন। একটু পরে বলেন, আপনার যুক্তি ঠিক ; কিন্তু এসব সর্ত তো আমি আগে আরোপ করি নি, এখন ওরা শুনতে চাইবে কেন ?

—এক কাজ করুন। ওদের কাছে একদিন সময় চেয়ে নিন। কাল এসে এটার ফয়শালা করা যাবে। কাল সন্ধ্যায়, এই একই সময়ে।

জগদানন্দ বিচিত্র হেসে বললেন, কেন বলুন তো ? আপনি কি সত্যিই আশা রাখেন যে, কাল সন্ধ্যার মধ্যেই লয়েডস্ ব্যাঙ্ক থেকে জেনে আসবেন রহস্যের সন্ধান ?

—তাই আশা করছি। মোট কথা একদিন সময় আপনি চেয়ে নিন শুধু।

তাই নেওয়া হল। বিশ্বম্ভর গজ গজ করতে করতে উঠে গেল।

মহেন্দ্র কিন্তু যাবার সময় সবিনয় নমস্কার করে গেল তার প্রাক্তন মনিবকে এবং তাঁর সলিসিটারকে।

জলখাবার খেতে বসে শুরু হল খোশ গল্প। বাসু-সাহেব বলেন, সেন-মশাই, আপনার নাতনিটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ তেজী মেয়ে।

নীলিমা দাঁড়িয়েছিল সামনেই। জগদানন্দ তার পিঠে একটা স্নেহের চাপড় মেরে বলেন, হবেই তো ! ওর জন্ম যে সিংহরাশিতে !

—তাই নাকি! সিংহরাশিতে জন্ম হলে বুঝি খুব তেজী হয়?

হা-হা করে হেসে ওঠেন জগদানন্দ। বলেন, না, জ্যোতিষচর্চা অত সহজ নয়; ওটা একটা রসিকতা করছিলাম। তবে নীলু-মা একটি ক্ষণজন্মা মেয়ে—যাকে বলে লগন-চাঁদা! ওর লগ্নে রবিও আছেন কিনা! মুশ্‌কিল হয়েছে ওর নবমে শনি রয়েছেন—

তারপর হঠাৎ বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি জ্যোতিষ মানেন?

বাসু বলেন, গণিত-জ্যোতিষ মানি, ফলিত-জ্যোতিষ মানি না।

—আপনার কী রাশি?

—আমি নিজেই তা জানি না। ও সব রাশিচক্র তিথি-নক্ষত্র আমি বুঝিই না।

জলখাবার খেয়ে বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওঁরা নিচে নেমে এলেন। নীলিমা ওঁদের গাড়িতে তুলে দিতে এল। বাসু-সাহেব হঠাৎ প্রশ্ন করেন, নীলিমা, তোমার জন্মবারটা কী বলতো?

—জন্মবার দিয়ে কী হবে? সোমবার!

বাসু বলেন, এমনিই কৌতূহল হল জানতে! আচ্ছা চলি!

তিন

পরদিন সন্ধ্যায় বুড়ো-কর্তার নিভৃত-কক্ষে যখন আবার ওঁরা দু-জন মুখোমুখি বসলেন তখন জগদানন্দ বললেন, ব্যারিস্টার-সাহেব, আজ আপনার জন্যে আমি একটি 'সারপ্রাইজ' নিয়ে বসে আছি! সেটা দেখলে আপনি চমকে উঠবেন।

বাসু উৎসাহ দেখিয়ে বলেন, চমকিত হওয়া একটা দুর্লভ সৌভাগ্য! তাহলে আগে সেটাই দেখি। কাজের কথা পরে হবে।

ছোট ছেলের মত মাথা দুলিয়ে জগদানন্দ বলেন, ওটি হচ্ছে না। চমকিত হওয়া যখন দুর্লভ সৌভাগ্য তখন প্রতিশ্রুতিমত আপনি আগে আমাকে চমকিত করুন! কথা ছিল, আজ সন্ধ্যায় আপনি আমাকে জানাবেন রহস্যটা কী! মানে আমার রহস্যটা।

বাসু-সাহেব বলেন, সে-সব কথা থাক!

—তাহলে তো হবে না ব্যারিস্টার সাহেব। সে-ক্ষেত্রে আগে হার স্বীকার করুন।

—করলাম!

খুশিয়াল হয়ে ওঠেন জগদানন্দ। বলেন, লয়েডস্‌ ব্যাঙ্ক কোন খবর দিতে পারল না!

—লয়েডস্ ব্যাঙ্কে আমি আদৌ যাই নি।

—তাহলে আপনি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করছেন, মহেন্দ্র কী ব্যাপারে আমাকে ব্ল্যাকমেল করছে তা আপনি জানতে পারেন নি?

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, একই কথা আমাকে দিয়ে বারে বারে কেন বলাচ্ছেন মিঃ সেন?

জগদানন্দ ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলেন, কিছু মনে করবেন না বাসু-সাহেব। এতে আপনার লজ্জিত হবার কিছু নেই। যে খবর বার করতে মহেন্দ্রের পঁচিশ বছর লাগল তা যে আপনি চব্বিশ ঘণ্টায় জানতে পারবেন না তা আমিও জানতাম। তবে আপনাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে হচ্ছে একটি বিশেষ কারণে। এই নিয়ে ইতিমধ্যে আমি বাজি ধরে বসে আছি কিনা! আপনার অসাফল্যে আমি একশ টাকা বাজি জিতলাম!

বাসু-সাহেব পাইপে অগ্নি সংযোগ করছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়ে বলেন, মানে? এ নিয়ে বাজি ধরেছেন? কার সঙ্গে? নাতনি?

—না! আপনার গুরু ব্যারিস্টার এ. কে. রে!

বাসু-সাহেবের হাতে দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে গেল। মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বলেন, সেটা কি রকম?

—কাল আপনি চলে যাবার পরেই আমি রে-সাহেবকে টেলিফোন করে-ছিলাম। ওঁকে বললাম, আপনি বলেছেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার একটা রহস্য উদ্ঘাটন করে দেবেন। শুনে রে সাহেব বললেন—বাসু যদি কথা দিয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই করবে! তারপর যা হয়ে থাকে। দুই বুড়োয় কথা কাটাকাটি! শেষ-মেশ একশ' টাকার বাজি!

বাসু এবার দেশলাই থেকে দ্বিতীয় একটি কাঠি বার করে পাইপটা ধরালেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, সে-ক্ষেত্রে, সেন-মশাই, আমার উক্তি আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। গুরুর আর্থিক লোকসান আমি হতে দিতে পারি না। আপনার রহস্য আমি উদ্ঘাটন করেছি!

জগদানন্দ মিটি মিটি হাসছেন। বলেন, বটে! তবে সেটাই শোনান আগে।

বাসু ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। ঘরে ওঁরা তিনজনই মাত্র আছেন। জগদানন্দ, তিনি আর কৌশিক। তবু উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। বললেন, সেন-মশাই, কথাটা অপ্রিয়, তাই সব জেনে শুনেও আমি হার স্বীকার করছিলাম। বিশ্বাস করুন, আমি ব্যাপারটা জানি।

জগদানন্দ ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন। বলেন, ও ভাবে ফাঁকি দিতে পারবেন না!

বসু যেন নিরুপায় হয়ে ঝুঁকে পড়েন। অস্ফুটে বলেন, আমি জানি—মহেন্দ্র এতদিনে প্রমাণ সংগ্রহ করে এনেছে যে, নীলিমা আপনার পৌত্রী নয়!

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন জগদানন্দ। কৌশিকও চমকে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে জগদানন্দ বলেন, আর একটু খুলে বলুন, কী বলতে চাইছেন।

—বলছি যে, আপনার পুত্র সদানন্দ সেন নীলিমার বাপ নয়—এ তথ্যটা মহেন্দ্র আবিষ্কার করেছে। হয়তো সে অনেকদিন ধরেই এটা জানত—সম্প্রতি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করে এনেছে!

মাথাটা নিচু হয়ে গেল জগদানন্দের। অনেকক্ষণ নির্বাক বসে রইলেন তিনি। তারপর মুখ তুলে বললেন, আপনি কেমন করে জানলেন?

—সে প্রশ্ন অবান্তর! এখন দেখান আপনি কি দেখাতে চাইছিলেন যেন?

তবু উৎসাহ ফিরে পেলেন না জগদানন্দ। বললেন, আপনি জানাবেন না—কী সূত্রে এ তথ্যটা আবিষ্কার করেছেন?

—না! সে সর্ত তো ছিল না।

আরও মিনিটখানেক গুম মেরে বসে রইলেন জগদানন্দ। তারপর উঠে গেলেন এবং আলমারি থেকে একটি দলিল নিয়ে এসে নীরবে বাড়িয়ে ধরলেন বাসু-সাহেবের দিকে। কাগজটা খুলে বাসু-সাহেব দেখেন সেটি একটি উইল। অত্যন্ত পাকা মুন্সিয়ানার সঙ্গে জগদানন্দ স্বহস্তে একটি উইল লিখেছেন। তাতে তাঁর যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তির খতিয়ান আছে। ওঁর গুরুদেব পাবেন দশ হাজার, নীলিমার এক মামা দশ হাজার, আর একজন কে যেন পাবেন পাঁচ হাজার, এইভাবে প্রত্যেকেই কিছু কিছু পাবে। নীলিমা পাবে নগদ পঁচিশ হাজার। জগদানন্দের বৈমাত্রেয় ভাইপো যোগানন্দ পাবেন পঞ্চাশ হাজার এবং ওঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বসত বাড়িটা নিব্যূঢ় সর্তে উনি দিয়ে যাচ্ছেন মহেন্দ্রকে!

দীর্ঘ উইলটি পাঠ শেষ করে মুখ তুললেন বাসু সাহেব বলেন পড়লাম।

—পড়লেন তা তো দেখতেই পেলাম। এবার আপনার অভিমত?

বাসু-সাহেব হেসে বললেন, আমার বিশ্বাস এত সহজে মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভরকে বোকা বানাতে পারবেন না! এ উইল পাল্টে যাতে আপনি আবার উইল করতে না পারেন সে ব্যবস্থা তারা করবে। প্রথমতঃ এটি রেজিষ্ট্রি করাবে; দ্বিতীয়তঃ আপনি যাতে তারপর আর দ্বিতীয় উইল না করতে পারেন, সে জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করবে!

—কী ব্যবস্থা?

—চব্বিশ ঘণ্টা আপনাকে নজরবন্দী করে রাখবে!

জগদানন্দ বলেন, আমি জানি। তাই এই ব্যবস্থাটিও করে রেখেছি। দ্বিতীয় উইল আমি আদৌ করব না।

উনি আর একটি কাগজ বার করে দেন—বসত বাড়িটি দান বিক্রয় করার অধিকার দিয়ে বাসু-সাহেবকে একটা স্পেশাল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি। বললেন, আপনি আমার আমমোক্তার-নামা নিয়ে আমার বসত বাড়িটি আমার তরফে নীলিমাকে দান করে দিন। কালই। তারপর পরশু আমি আমার উইলটা অপরিবর্তনীয় শেষ উইল হিসাবে রেজেস্ট্রি করাব এবং একটি কপি মহেন্দ্রকে দেব। আমার বিশ্বাস ও মেনে নেবে। তিনটি কারণে—প্রথমতঃ ও জানে. এ বাড়ির দাম দু আড়াই লাখ টাকা। দ্বিতীয়তঃ আমি আর কদিন? তৃতীয়তঃ আমার এই ডবল ক্রশিংটা ও সন্দেহ করবে না—ভাববে, আমার জীবদ্দশায় যাতে সে পুনরায় ঝামেলা করতে না আসে তাই এই ব্যবস্থা আমি করেছি। আমার মৃত্যুর পরে ও যখন উইল মোতাবেক এ বাড়ি দখল নিতে আসবে তখন সে জানতে পারবে যে, উইল করার আগেই বাড়ির মালিকানা হস্তান্তরিত হয়েছে!

বাসু-সাহেব বলেন, পরিকল্পনাটা ভাল। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না; কিন্তু তাহলে নাতনিকে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা দিচ্ছেন কেন? ওটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে একটু বাড়িয়ে দেওয়া ভাল নয়?

জগদানন্দ হেসে বলেন, সেটা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। আমি দেখতে চাই এই উইল পড়ার পরেও ঐ ছোকরা—কি যেন নাম?—হ্যাঁ জয়দীপ, এ বাড়িতে আর মাথা গলায় কি না! জয়দীপকে আমি উইলে সাক্ষী করব।

—এ বুদ্ধিটা ভালই করেছেন! এক ঢিলে দু-পাখি!

বাড়িতে ফিরে এসে কৌশিক চেপে ধরল বাসু-সাহেবকে, এবার বলুন, কেমন করে জানলেন জগদানন্দের ঐ গোপন রহস্য?

ইজিচেয়ারে বসে পাইপ ধরাচ্ছিলেন বাসু-সাহেব। বলেন, বুঝলে না? পিওর এ্যাণ্ড সিম্পল ম্যাথমেটিক্স! অঙ্ক রে বাবা, অঙ্ক!

—অঙ্ক মানে? কিসের অঙ্ক?—রুখে ওঠে কৌশিক।

—অ্যাস্ট্রনমির। গণিত-জ্যোতিষ! শিবপুর বি. ই. কলেজে অ্যাস্ট্রনমি পড়ানো হয়?

—হয় না; কিন্তু বি. এস্-সিতে আমার অঙ্কে অনার্স ছিল। ওটা বুঝি। ও-ভাবে আমাকে ব্লাফ দিতে পারবেন না। অ্যাস্ট্রনমির অঙ্কে কে কার বাপ

তো কখনও বোঝা যায় না!

—যায় রে বাপু, যায়। শোন বুঝিয়ে দিচ্ছি। কথা প্রসঙ্গে জগদানন্দ নীলিমার জন্ম সম্বন্ধে কী কী বলছিলেন বল দিকিন!

—আমার ঠিক ঠিক মনে নেই, আপনিই বলুন।

—উনি বলেছিলেন, এক নম্বর—ওর জন্ম রাশি সিংহ, দু-নম্বর ও লগন্ চাঁদা মেয়ে, তিন-নম্বর ওর জন্ম লগ্নে রবি, চার নম্বর ওর নবমে শনি। কেমন?

—তা হবে। তাতে কী হল? তাতে কখনও প্রমাণ হয় তার বাপ সদানন্দ নয়?

—হবে রে বাপু, হবে। অঙ্কটা আগে কষতে দাও। প্রথম কথা—'জন্মলগ্ন' কাকে বলে? জান? জন্মের সময় যে রাশি পূর্বগগনে উদয় হচ্ছে। তাই তো!

—হ্যাঁ তাই।

—ওর লগ্নে রবি আছেন, অর্থাৎ জন্ম মুহূর্তে সূর্যও গুটি গুটি উঠছেন? অর্থাৎ ওর জন্ম সূর্যোদয় মুহূর্তে! কেমন?

—তাতে কি হল?

—তাতে প্রমাণ হল ওর জন্মমাস ভাদ্র!

—তা কেমন করে প্রমাণ হল?

—হল না? ওর জন্মরাশি হচ্ছে 'সিংহ'। জন্মরাশি কি? জন্ম মুহূর্তে চন্দ্র যে রাশিতে আছেন! অর্থাৎ চন্দ্র ছিলেন সিংহে। যেহেতু ও লগন্-চাঁদা এবং ওর লগ্নে আছেন রবি—ফলে জন্মমুহূর্তে চাঁদ ও সূর্য দুজনেই সিংহ রাশিতে। নয়? এখন 'সিংহরাশিস্থে ভাস্করে' মানেই 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর!' ওর জন্মমাস ভাদ্র!

কৌশিক একটু ভেবে নিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বাসু বলেন, শুধু ভাদ্র মাসই নয়, ভাদ্রের অমাবস্যায়!

—কেন? অমাবস্যা কেন?

—যেহেতু সূর্য ও চন্দ্র একই রাশিতে! অ্যাস্ট্রনমি পেপারে কত নম্বর পেয়েছিলে?

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে কৌশিক বললে, ও ইয়েস!

—তাহলে এ পর্যন্ত জেনেছি যে, নীলিমা কোন একটি ভাদ্রমাসের অমাবস্যার সূর্যোদয় মুহূর্তে জন্মেছে। এগ্রিড? নাউ! আমাদের চার নম্বর হাইপথেসিস্ ছিল 'নবমে শনি।'

কৌশিক স্বীকার করে, ঐ ব্যাপারটা আমি বুঝিনি। 'নবমে শনি' মানে কি?

বাসু বলেন, তোমার বুঝতে না পারাই স্বাভাবিক। ওটা অ্যাস্ট্রনমির এক্তিয়ারভুক্ত নয়, অ্যাস্ট্রলজির ব্যাপার। 'লগ্ন' থেকে নয়-ঘর গুণে যে রাশি পাওয়া যাবে সেখানে জন্ম সময়ে শনি ছিলেন এটাই বুঝতে হবে। যেহেতু ওর লগ্ন ছিল সিংহ তাই জন্মসময়ে দেখা যাচ্ছে শনি আছেন মেষ রাশিতে। ওর জন্ম-ছটকায় যেটুকু জানা গেল তার সাঙ্কেতিক চেহারা এই রকম—সিংহ রাশিতে আছেন রবি (র), চন্দ্র (চ) এবং লগ্ন (লং) আর মেষরাশিতে শনি (শ)। মজা হচ্ছে শনিগ্রহ এক এক রাশিতে থাকেন আড়াই বছর। মানে গোটা রাশিচক্র পাক মারতে তাঁর সময় লাগে আড়াই ইন্টু-বারো, ত্রিশ বছর! বর্তমান বছরে, এই 1975 সালে শনি আছেন মিথুনে। দেখছি, নীলিমার

বৃষ
মেষ
মীন
মিথুন
শ
কুম্ভ
কর্কট
মকর
সিংহ
র
চ
লং
ধনু
কন্যা
তুলা
বৃশ্চিক

জন্ম সময়ে তিনি ছিলেন দু-রাশি পিছনে। তার অর্থ ওর জন্ম সময়টা আজ থেকে পাঁচ বছর, অথবা ত্রিশ-প্লাস-পাঁচ পঁয়ত্রিশ বছর, কিম্বা ত্রিশ-দুগুণে-ষাট প্লাস পাঁচ পঁয়ষট্টি বছর আগে—কেমন তো? যেহেতু নীলিমাকে পাঁচ বছরের খুকি অথবা পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ি বলে মনে হচ্ছে না তাই ওর বয়স পঁয়ত্রিশ! এগ্রিড? সিদ্ধান্তটা একটা বিকল্প পদ্ধতিতেও প্রমাণ করা যায়—নীলিমা প্রথম সাক্ষাতে বলেছিল তার বয়স চৌত্রিশ; অন্তত একটা বছর হাতে না রেখে কোন যৌবনোত্তীর্ণা অনূঢ়া নিজের বয়স বলে না। ফলে চৌত্রিশ প্লাস এক পঁয়ত্রিশ! সংক্ষেপে নীলিমার জন্ম বৎসর 1940।

কৌশিক এতক্ষণে একটা মস্ত ফাঁক বার করেছে হিসাবে। বললে, তা কেন? শনি মেষরাশির প্রথমদিকে আছেন কিম্বা শেষ দিকে আছেন তা তো জানেন না। আপনি নিজেই বললেন এক রাশি পার হতে শনির আড়াই

বছর আগে। ফলে সালটা 1941 অথবা 1939 ও তো হতে পারে!

—কারেক্ট! ভেরি কারেক্ট! ভেরি ভেরি কারেক্ট। বরং তোমার বলা উচিত ছিল সে-হিসাবে 1938 থেকে 1942 যে-কোন সাল হতে পারে।

—পারেই তো!

—না, পারে না। কেন পারে না জান? খুব সহজ কারণে। ঐ পাঁচটা বছরে পাঁচ-পাঁচটা ভাদ্রের অমাবস্যা এসেছে। তার ভেতর শুধু মাত্র 1940-এর ভাদ্রের অমাবস্যা পড়েছে সোমবারে—যেটা নীলিমার স্বীকৃতি অনুসারে ওর জন্মবার! ফলে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ হল—নীলিমার জন্ম 1940 সালের ভাদ্র অমাবস্যায় সূর্যোদয়ের মুহূর্তে। বাংলা হিসাবে সেটা সতেরই ভাদ্র ১৩৪৭ ইংরাজী দোশরা সেপ্টেম্বর 1940।

—বেশ তাও না হয় মেনে নিলাম; কিন্তু তা থেকে তার পিতৃ-পরিচয়—

—ধীরে রজনী, ধীরে! ব্যাঙ্ক অব বর্মার ড্রাফট্-এর তারিখ ছিল 18.5 1940। জগদানন্দের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সদানন্দ মাসখানেক বর্মায় ছিল। যদি ধরে নিই একেবারে প্রত্যাবর্তনের শেষ দিনে সে ড্রাফটটা নিয়েছে তাহলে সদানন্দের বর্মামুলুকে পদার্পণের তারিখটা হচ্ছে 14.4.1940। যদি ধরে নিই রেঙ্গুনে পদার্পণের দিনই নীলিমার মায়ের সঙ্গে সদানন্দের সাক্ষাৎ ঘটে থাকে তবে দুজনের প্রথম সাক্ষাৎ সময়ে নীলিমার মায়ের গর্ভে ভ্রূণের বয়স অন্ততঃ পাঁচ মাস! Q.E.D.!

কৌশিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনাকে একটা প্রণাম করব বাসুমামা?

বাসু-সাহেব ইঞ্জিচেয়ারের হাতলে ঠ্যাঙ জোড়া তুলে দিয়ে বলেন, ভাগনে মামাকে প্রণাম করবে—এতে আবার তিথি নক্ষত্র দেখার কি আছে? কর!

চার

জগদানন্দের পরিকল্পনাটি খাসা। কিন্তু সেই-মোতাবেক কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়ল। বাসু-সাহেব আমমোক্তার-বলে জগদানন্দের তরফে গোপনে তাঁর বসতবাড়িটি দানপত্র করে দিলেন তাঁর পৌত্রীকে—না, ভুল বললাম! দলিলের কোথাও উল্লেখ নেই দানগ্রহীতা নীলিমা সেন জগদানন্দের পৌত্রী। বরং বলা হয়েছে, যে-হেতু সেন-পরিবারভুক্ত 'কুমারী নীলিমা দেবী' বৃদ্ধ বয়সে দাতা জগদানন্দের সেবা শুশ্রূষা যত্ন আদি করছেন তাই

প্রতিদানে খুশীমনে স্বত্ব বহাল ভবিষ্যতে দাতা নিব্যূঢ়-স্বত্বে ইত্যাদি ইত্যাদি—

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জগদানন্দ জয়দীপ এবং নীলিমাকে তাঁর নিভৃত কক্ষে ডেকে পাঠালেন। দানপত্রর কথা গোপন রেখে উইলখানি ওদের দুজনকে পড়তে দিলেন। দুজনে আদ্যন্ত তাঁর অপরিবর্তনযোগ্য শেষ উইলখানি পাঠ করলে জগদানন্দ প্রশ্ন করেন, তোমাদের মতামত নেবার জন্য এ উইল পড়তে দিইনি, বস্তুতঃ তোমাদের মতামতে এটা পরিবর্তনও করব না আমি; তবু আমি জানতে চাই এ বিষয়ে তোমাদের কিছু কী বলার আছে?

নীলিমা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসেছিল এতক্ষণ। এ প্রশ্নে মাথা ঝাঁকিয়ে শুধু বললে, না!

জয়দীপ কিন্তু স্থির থাকতে পারল না। বললে, আমার একটা কথা বলার ছিল। আপনি এভাবে নীলিমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছেন কেন?

—বঞ্চিত করছি! কে বলল? তাকে তো নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছি!

—এবং আপনার ভাইপোকে দিয়ে যাচ্ছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা, আর নিঃসম্পর্কীয় ঐ মহেন্দ্রবাবুকে দিয়ে যাচ্ছেন এই বাস্তুভিটা।

—হ্যাঁ, তাতে কি হল?

জয়দীপ স্থির হয়ে বসে রইল। জবাব জোগালো না তার কণ্ঠে। শেষে উঠে গেল সে।

পরদিন, শুক্রবার সকালে সে ফিরে এসে বললে, কাল আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। আপনি জানেন যে, আমি নীলিমাকে বিবাহ করিতে চাই। আপনার আপত্তি ছিল। যে কারণে আপনি আপত্তি করছিলেন আশাকরি সেই কারণটা এখন আর নেই। যদি মনে করেন এখনও সেই কারণটি আছে তবে ঐ পঁচিশ হাজার টাকা থেকেও তাকে বঞ্চিত করে যান, আমি ওকে এ বাড়ি থেকে নিয়ে যাই।

জগদানন্দ রাগ করেননি। খুশী হয়েছিলেন। জবাবে বলেছিলেন, নীলুর বিবাহ আমার এই শেষ বয়সের শেষ উৎসব। এ ঝামেলা মিটে যাবার আগে সে বিষয়ে আমি চিন্তা করছি না। উইলটা হয়ে যাক, আপদ বিদায় হ'ক—তারপর তোমাদের সঙ্গে কথা বলব।

—আপদ বিদায় হ'ক মানে? মহেন্দ্রবাবুকে তো আপনি খুশি মনে—

বাধা দিয়ে জগদানন্দ বলেছিলেন, ও কথা থাক!

ঝামেলা কিন্তু মিটল না। মহেন্দ্র এবং বিশ্বম্ভর এ প্রস্তাবে প্রথমটা রাজী হয় নি। শেষে অনেক কষ্টে জগদানন্দ রাজী করান। উইলে আরও উল্লেখ

করা হল যে, এইটিই তাঁর শেষ উইল। যে কোনও কারণেই হ'ক এ উইল পরিবর্তন করে উনি যদি ভবিষ্যতে নূতন উইল প্রণয়ন করেন তবে তা আইনতঃ গ্রাহ্য হবে না।

এরপর মহেন্দ্র-বিশ্বম্ভর পার্টি রাজী হলেন। রাজী হলেন না বাসু-সাহেব। বাহ্যতঃ। তিনি প্রকাশ্যে দেখালেন এ অবস্থায় তিনি মোটেই খুশী নন। উইলে সাক্ষী হিসাবে তিনি সই দিতেও অস্বীকার করলেন। হয় তো সেজন্যই মহেন্দ্র-বিশ্বম্ভর পার্টি আরও খুশী মনে এ ব্যবস্থা মেনে নিলেন। সাক্ষী হিসাবে সই দিলেন এ্যাডভোকেট বিশ্বম্ভরবাবু এবং জয়দীপ। শনি-রবি-সোম তিন দিনই ছুটি। স্থির হল, মঙ্গলবার ওটি রেজিস্ট্রি করানো হবে। আপাততঃ উইলের মূল কপিটি থাকল মহেন্দ্রের জিম্মায়।

ঐ শনিবারেই ঘটল একটা অদ্ভুত ঘটনা। জগদানন্দের সঙ্গে দেখা করতে এলেন একজন অদ্ভুতদর্শন স্যুট পরা ভদ্রলোক! তাঁকে নীলিমা ইতিপূর্বে কখনও দেখে নি, চেনে না। খর্বকায়, হৃষ্টপুষ্ট—বয়স ষাটের কাছাকাছি। নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুটি ছোট—ত্যাড়চা। যাকে বলে মঙ্গোলীয় ছাপ। গায়ের রঙ তামাটে। রুদ্ধদ্বার কক্ষে তিনি জগদানন্দের সঙ্গে কী আলোচনা করলেন তা কেউ জানে না; কিন্তু নীলিমা লক্ষ্য করে দেখে তিনি চলে যাবার পর বিস্ফোরণের পূর্বমুহূর্তে আগ্নেয়গিরির মত গুম্ মেরে বসে আছেন জগদানন্দ। সে প্রশ্ন করেছিল, ও ভদ্রলোক কে দাদু?

হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল। চাপা গর্জন করে উঠলেন জগদানন্দ, খুন করব! সব কটাকে খুন করব আমি! এরা ভেবেছে কি?

ক্রমশঃ বোঝা গেল ঐ অজ্ঞাতনামা ভদ্রলোকটির নাম যু সিয়াঙ। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে তিনি ছিলেন জগদানন্দের বর্মা-অফিসের ম্যানেজার। নীলিমা আন্দাজে বুঝতে পারে—মহেন্দ্র হয় তো এঁর মাধ্যমেই গুপ্তরহস্য সম্প্রতি উদ্ধার করেছেন এবং ধূর্ত বর্মী ভদ্রলোক ব্যাপারটা আঁচ করে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। অর্থাৎ মহেন্দ্রবিদায় পর্ব চুকলেও মুক্তি পাচ্ছেন না জগদানন্দ। এবার তাঁকে যু সিয়াঙ-এর সম্মুখীন হতে হবে। জগদানন্দের নির্দেশে নীলিমা বাসু-সাহেবকে ফোন করল। ওর কাছ থেকে সব শুনে বাসু-সাহেব বললেন, এসব ব্যাপারে আমার চেয়ে কৌশিকই তোমাদের বেশী সাহায্য করতে পারবে। কাল সকালে সে যাবে তোমাদের বাড়িতে।

রবিবার কৌশিক সেই অনুসারে এসে উপস্থিত হল জগদানন্দের বাড়িতে। জগদানন্দ তাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আপনি আশাকরি বুঝতে পেরেছেন আমার সমস্যাটা কী। এই যু সিয়াঙ লোকটাই মহেন্দ্রকে সরবরাহ

করেছে যাবতীয় তথ্য। ঠিক কী কী তথ্য তা আমি জানি না—আন্দাজ করতে পারি। হয় তো যে জাহাজে সদানন্দ গিয়েছিল এবং ফিরে এসেছিল সেই জাহাজের নাম, হয়তো চৌত্রিশ বছর আগেকার সেই প্যাসেঞ্জার লিস্ট-এর ফটো-স্ট্যাট কপি নিয়েছে ওরা। হয়তো যে হোটেলে সদানন্দ রেঙ্গুনে একমাস ছিল তার হোটেল রেজিস্টার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে—অথবা নীলুর মাকে যারা চিনত তাদের নাম ধাম বর্তমান ঠিকানা সব সংগ্রহ করেছে।

কৌশিক জানতে চায়, লোকটা কী চাইছে?

—টাকা! কোনও সঙ্কোচ করেনি য়ু সিয়াঙ—সে স্পষ্ট বলেছে মহেন্দ্রের সঙ্গে তার সর্ত হয়েছিল যে, সে যা আদায় করবে তার অর্ধেক তাকে দেবে। তার আশঙ্কা মহেন্দ্র তাঁকে ফাঁকি দেবে। তাই তার প্রস্তাব মহেন্দ্রকে আমি যা খেসারত হিসাবে দেব বলেছি তার অর্ধেক তাকে দিতে হবে।

—ও কোথায় থাকে?

—ও সোজা এসেছে রেঙ্গুন থেকে। আছে পার্ক হোটেলে, রুম নম্বর 38 বলেছে, আমি কী স্থির করলাম তা ওকে ঐ রুম নাম্বারে ফোন করে জানিয়ে দিতে।

—ওর সঙ্গে মহেন্দ্রের যোগাযোগ হয়েছে?

—আমি জানি না। আমি ওকে বলেছিলাম মহেন্দ্র এ বাড়িতেই থাকে যদি সে দেখা করতে চায় তবে আমি তাকে ডেকে আনতে পারি। তাতে সে রাজী হয় নি। বলেছিল, মহেন্দ্রের সঙ্গে তার যা ফয়শালা করার কথা তা সে জনান্তিকেই করবে।

কৌশিক সব শুনে বলল, ঠিক আছে। যা ব্যবস্থা করার আমি করছি বাসু সাহেবকেও সব জানাবো।

সেদিনই নীলিমা আর জয়দীপ এসে দেখা করল কৌশিকের সঙ্গে। জানতে চাইল—ব্যাপারটা কী?

কৌশিক বলে, নীলিমা দেবী যা আশঙ্কা করেছিলেন ঠিক তাই। অর্থাৎ মহেন্দ্র গোপন খবরটা সংগ্রহ করেছে ঐ বর্মী ভদ্রলোকের মাধ্যমে। উনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে, তথ্যটা ব্ল্যাকমেলিঙ-এর পক্ষে প্রশস্ত। ফলে নিজেই চলে এসেছেন রেঙ্গুন থেকে ভারতবর্ষে।

—কিন্তু গোপন তথ্যটা কী?—জানতে চায় জয়দীপ।

কৌশিক সজ্ঞান মিথ্যা ভাষণ করে, সেটা এখনও জানা যায় নি।

—এখন কি করতে চান?

—প্রথম ব্যবস্থা হচ্ছে সর্বক্ষণ ঐ য়ু সিয়াঙ ভদ্রলোককে নজরে নজরে

াখা। আমাদের জানতে হবে, ওর সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর বর্তমান সম্পর্কটা কী? হেন্দ্রবাবুকেও নজরে নজরে রাখতে হবে।

—আপনি একা মানুষ—দুটো মানুষকে দু'জায়গায় নজরে রাখবেন কেমন করে?

—আমাকে লোক লাগাতে হবে। এ জাতীয় কাজ করার লোক আমার চেনা আছে। দৈনিক চুক্তিতে তাদের এনগেজ করতে হবে।

জয়দীপ বলে, তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। আমি নিজেই ঐ পার্ক হোটেলে গিয়ে একটা ঘর নিই। য়ু সিয়াঙ আমাকে চেনে না। তাকে বন্ধুবন্দী করি। সে কলকাতা শহরও চেনে না, ফলে তার সঙ্গে ভাব করে শহরটা দেখাই—হয়তো কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।

কৌশিক রাজী হল। এ ব্যবস্থাটা ভাল। জয়দীপ বেশ চালাক চতুর কে দিয়ে কাজ হবে। রবিবার বিকালেই জয়দীপ পার্ক হোটেলে একটা র নিল। ঐ আটত্রিশ নম্বর ঘরের পরের পরের ঘরটা—চল্লিশ নম্বর কামরা।

বাসু-সাহেব বাড়ি ফিরে সব কথা শুনলেন। বললেন, আমার কেমন যেন াল লাগছে না কৌশিক। চল, একবার বুড়োর সঙ্গে দেখা করে আসি।

কৌশিক বললে, সেটাই ভাল। বৃদ্ধ সকালবেলা আমাকে পেয়ে খুশী ন নি। আপনার কথা বারে বারে জিজ্ঞাসা করছিলেন।

সত্যই বাসু-সাহেবের সাক্ষাৎ পেয়ে খুশী হয়ে উঠলেন জগদানন্দ। বললেন, মনই একটা কিছু আশঙ্কা করেছিলাম আমি। আজ থেকে শনির দশা শুরু যে আমার।

বাসু বললেন, সেন-মশাই, আমি ওসব শনির দশা, বৃহস্পতির দশা বুঝি । যা বুঝি তা হচ্ছে এই যে, আপনি বর্তমানে একটি প্রচণ্ড বিপদের খীন হয়েছেন। তাই আমি ছুটে এসেছি। মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভর কি ঐ সিয়াঙের আগমন সংবাদটা জানে?

—বোধহয় না। যে সময় য়ু সিয়াঙ আসে তখন ওরা দুজনেই বাড়ি ছিল।

—বুঝলাম। ওরা এখন বাড়ি আছে?

—আছে।

—তবে ওদের ডেকে পাঠান। নীলিমা আর জয়দীপকেও ডাকুন।

সবাই সমবেত হলে বাসু বললেন, আপনারা সকলেই জানেন, গত পরশু দানন্দবাবু একটি উইল তৈরী করেছেন। তাতে কী আছে, আমি জানি না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি ঐ উইল করেন—কিন্তু আপনারা তা

জানেন। উইলটি রেজিস্ট্রি করা হয়নি, কিন্তু তাতে জগদানন্দের স্বাক্ষর আ
--সেটি আইনমোতাবেক সিদ্ধ। আমার মতে, যতদিন না উইলটি রেজিস্ট্রি ক
হচ্ছে ততদিন সেটা উইলের কোন বেনিফিশিয়ারির কাছে থাকা উচিত নয়।

—কেন বলুন তো?—জানতে চান বিশ্বম্ভর উকিল।

—সেটাই প্রথা। তা ছাড়াও কারণ আছে।

—সেই কারণটাই তো আমি জানতে চাইছি।

বাসু-সাহেব হঠাৎ ঘুরে বসেন মহেন্দ্রের দিকে। তাকে সরাসরি প্রশ্ন করে
মহেন্দ্রবাবু, আপনি য়ু সিয়াঙ বলে কাউকে চেনেন?

মহেন্দ্র এ প্রশ্নে হঠাৎ থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু সে জবাব দেবার আগে
বিশ্বম্ভর প্রতিপ্রশ্ন করে, সে প্রশ্নের সঙ্গে এ বিষয়ের পারম্পর্য কি?

বাসু ওর কথা কানে তোলেন না, মহেন্দ্রকেই প্রশ্ন করেন—আপনি সম্প্র
রেঙ্গুনে গিয়ে ঐ য়ু সিয়াঙ-এর সঙ্গে দেখা করেন নি?

মহেন্দ্র আমতা আমতা করে। তাকে থামিয়ে দিয়ে বিশ্বম্ভর বলে, মিস
বাসু, আপনার যা কিছু প্রশ্ন তা আমাকে করবেন। মক্কেলের তরফে আ
তো হাজির আছি।

মহেন্দ্র ঢোক গিলে চুপ করে যায়। বাসু এবার বিশ্বম্ভরের দিকে ফি
বলেন, বেশ আপনাকেই বলছি। আপনার মক্কেল যেমন পঁচিশ বছর পরে এ
খেসারত দাবী করছে, ঠিক সেইভাবে ঐ য়ু সিয়াঙও এসে দাবী করছে টাক
তারও ঐ একই বক্তব্য! সেটা যে কী, তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন?

—না, পারছি না। সেটা কী?

—তার প্রতিও জগদানন্দবাবু নাকি অন্যায় করেছেন। সেও ঐ এ
রকম প্রমাণ দাখিল করে খেসারত দাবী করেছে।

—হতে পারে। তার সঙ্গে আমার মক্কেলের সম্পর্কটা কী? সে
একটা অন্য কেস?

—না, কেস একটাই। তা যাক। আপনি যেমন আপনার মক্কেলের
দেখছেন, আমিও তেমনি আমার মক্কেলের স্বার্থ দেখছি। তাই বলতে চ
উইলটা আপনার মক্কেলের হেপাজতে থাকার সময়—এবং আমার মক্কে
সিয়াঙের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটা ফয়সালা করার আগে যদি আমার মক্কেলের
ভালমন্দ হয়ে যায় তবে তার জন্য আপনার মক্কেল পুরোপুরি দায়ী থাকবে
বুঝেছেন?

বিশ্বম্ভর চোখ থেকে চশমাটা খুলে তার কাচটা মুছতে মুছতে বলেন, আ
না, বুঝি নি। 'ভালমন্দ' বলতে কী মীন করেছেন?

—আই মীন এ্যান এ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার! খুন! এবার বুঝলেন? এস কৌশিক!

উঠে পড়লেন বাসু-সাহেব। ঘরের কেউই তখনও স্বাভাবিকতা ফিরে পায় নি।

পাঁচ

সোমবার সকাল আটটার সময় কৌশিককে ফোন করল জয়দীপ। ছেলেটা খুবই তুখড়! গোয়েন্দাগিরির কাজটা সে ভালই করছে। তার খবর—গতকাল রাত নয়টার সময় মহেন্দ্র পার্ক হোটেলে এসেছিল। আটত্রিশ নম্বর ঘরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে ষড়যন্ত্রকারী কী আলোচনা করেছে তা সে জানে না; কিন্তু রাত দশটা দশে মহেন্দ্র হোটেল ছেড়ে চলে যায়। য়ু সিয়াঙ তখন নিচের ডাইনিং রুমে গিয়ে নৈশ আহার সারে। আহারান্তে য়ু সিয়াঙ নিজের ঘরে ফিরে আসে, মালপত্র বেঁধে ছেঁদে চেক-আউট করে বেরিয়ে যায়।

কৌশিক টেলিফোনে বলেছিল, সে কী! ওকে এত বড় ক'লকাতা শহরে বেপাত্তা হতে দিলেন?

জয়দীপ বলল, আমি অত কাঁচা ছেলে নই। ও যদি ট্যাক্সি নিত তবে ওকে ফলো করতাম; কিন্তু লোকটা ট্যাক্সি ডাকে নি—হোটেলের গাড়িটাই ব্যবহার করেছিল। তাই সামান্য কিছু খরচ করে সহজে জানতে পেরে গেলাম ওকে কোথায় পৌছে দিয়ে এল গাড়িটা।

—কোথায় গেল ও?

—আমার থেকে বর্তমানে ফুট আস্টেক দূরে য়ু সিয়াঙ রয়েছে।

—সে কি! কোথা থেকে ফোন করছেন আপনি?

—দমদম থেকে। ভি. আই. পি. হোটেলের একুশ নম্বর ঘর থেকে। য়ু সিয়াঙ আছে বাইশ নম্বরে। আমিও আজ সকালে পার্ক হোটেল থেকে চেক-আউট করে এখানে চলে এসেছি। এবার ঘটনাচক্রে ওর ঠিক পাশের ঘরটাই পেয়েছি।

কৌশিক বলে, আমার মনে হয় মহেন্দ্র ওকে শাসিয়েছে কাল রাত্রে। বিদেশ বিঁভুই-এ য়ু সিয়াঙ বোধহয় একটু ঘাবড়ে গেছে। ক'লকাতা শহরের খুব একটা সুনামও তো নেই বাইরের দুনিয়ায়। তাই রাতারাতি হোটেল বদলে একেবারে দমদমে গিয়ে উঠেছে। যাতে তেমন তেমন অবস্থা হলে সুট করে প্লেনে চেপে বসতে পারে।

জয়দীপ বলল, আমার কিন্তু মনে হয়, লোকটা সহজে পালাবে না। তাহলে এত খরচ করে বর্মা থেকে সে আদৌ আসত না।

—দেখা যাক।

বেলা বারোটা নাগাদ ফোন করল নীলিমা। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতেও শান্তি নেই। কাল বিকালে বাসু-সাহেব ঐ যে নাটকীয় ভঙ্গিতে 'এ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার' কথাটা শুনিয়ে এলেন তারপর থেকেই জগদানন্দ কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়েছেন। কাল রাত্রে ওঁর একেবারে ঘুম হয় নি। আজ সকালে আলমারি খুলে ওঁর একটা পুরানো দিনের হাতিয়ার বার করেছেন। বর্মায় থাকতে সখ করে কিনেছিলেন। গজদন্তের মুটওয়ালা একটা সৌখিন ছোরা। দেখতে সৌখিন, কাজে দড়—ব্লেডটা তীক্ষ্ণ, আট ইঞ্চি লম্বা। সেটা আর আলমারিতে তোলেন নি—বালিশের নিচে রেখে দিয়েছেন। এ-ছাড়া আজ সকালে যোগানন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর কী সব কথাবার্তা হয়েছে রুদ্ধদ্বার কক্ষে।

—যোগানন্দবাবুটা কে?—জানতে চেয়েছিল কৌশিক।

নীলিমা বুঝিয়ে দিয়েছিল, যোগানন্দ হচ্ছেন সম্পর্কে ওর ছোট কাকা অর্থাৎ জগদানন্দের ভাইপো—সেই যাঁকে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছেন উইলে। যোগানন্দ নির্বিরোধী মানুষ। বিপত্নীক—ছেলে-মেয়েও নেই। থাকার মধ্যে আছে যোগানন্দের এক শ্যালিকা পুত্র—শ্যামল রায়। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। সেও অবিবাহিত। একটা সওদাগরী অফিসে চাকরি করে। ঐ বাড়িতেই থাকে। উপসংহারে নীলিমা বললে, দাদু আপনাকে একবার সন্ধ্যাবেলা দেখা করতে বলেছেন।

—কেন?

—কেন, তা বলেননি। তিনি মনে করেন আমি নাবালিকা। এসব আলোচনায় আমার না থাকাই ভাল।

—কথাটা তো ঠিকই! কুমারী মেয়ে মাত্রেই বাঙালী পরিবারে নাবালিকা—

—তাই বুঝি? বয়সে কিন্তু আমি বোধহয় আপনার চেয়ে বড়!

—হতেই পারে না। কোন অবিবাহিত মেয়ে আমার চেয়ে বয়সে বড়, এটা আমি কখনই মেনে নিতে পারি না!

বিকাল পাঁচটা নাগাদ কৌশিক গিয়ে হাজিরা দিয়েছিল। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটায় ঢুকবার মুখে দেখা হয়ে গেল জয়দীপের সঙ্গে। কৌশিক বললে, এ কি! আপনি এখানে? দমদমের চিড়িয়া?

—ভয় নেই, চিড়িয়া আপনার ভাগে নি। শহর দেখতে বেরিয়েছেন।

জয়দীপ কাজের ছেলে। সে খবর রাখে য়ু সিয়াঙ আজ সকালে একটি টুরিস্ট বাসে সারাদিনের জন্য ক'লকাতা শহর দেখতে বেরিয়েছে। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় টুরিস্ট বাসটা ফিরে আসবে এসপ্ল্যানেড ঈস্টে। জয়দীপ এখন সেখানেই যাচ্ছে। বাস থেকে নামা মাত্র সে হারানো সুতোর খেই ফিরে পাবে এবং তারপর আবার আঠার মত সেঁটে থাকবে তার পিছনে।

কৌশিক বললে, নতুন কোনও খবর নেই ?

—কিছু না। লোকটা একাই ছিল ঘরে। কোন ভিজিটার আসে নি, কোনও টেলিফোনও নয়। আমি ওর মুভমেণ্ট সমস্ত লিখে যাচ্ছি আমার ডায়েরিতে।

জয়দীপ ঘড়ি দেখল। বললে, সময় হয়ে গেছে, আমি চলি।

কৌশিক বলে, চিড়িয়া দমদমে ফিরে গেলে ওখান থেকে আমাকে একটা ফোন করে জানাবেন।

—জানাব।

জয়দীপ চলে গেল। কৌশিককে নিয়ে নীলিমা দ্বিতলে উঠে এল। গৃহস্বামী বললেন, কালকে বাসু-সাহেব ঐ কথাটা বলার পর থেকেই আমার মনটা চঞ্চল হয়েছে। উনি ঠিকই বলেছেন,—ঐ মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভর না পারে এমন কাজ নেই। অথচ ওদের এখন তাড়াতেও পারছি না। মহেন্দ্র বলেছে, উইলটা রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে ওরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এবং আমার জীবদ্দশায় আর বিরক্ত করতে আসবে না। জানি না, সে তার কথা রাখবে কি না; কিন্তু ঐ য়ু সিয়াঙ এসে পড়ায় অবস্থাটা আবার গুলিয়ে গেছে।

—য়ু সিয়াঙ-এর সঙ্গে আপনি কি পৃথকভাবে বোঝাপড়া করতে চান ?

—এখনও মনস্থির করতে পারি নি। যোগানন্দ সেই পরামর্শই দিচ্ছিল।

—যোগানন্দবাবু! তিনি কি সব কথা জানেন ?

—এখন তো দেখছি, জানে। অদ্ভুত ভাল ছেলেটা, জানলে—

জগদানন্দের কথা থেকে বোঝা গেল নির্বিরোধী মানুষ যোগানন্দ বহুদিন আগে থেকেই এ গোপন রহস্যের সন্ধান রাখেন। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এটা জানেন, দ্বিতীয় কারও সঙ্গে আলোচনা করেন নি—এমন কি জগদানন্দের সঙ্গেও নয়। কী দরকার ওসব গ্লানিকর প্রসঙ্গ আলোচনা করার ?—ভাবটা এই। তারপর মহেন্দ্রর আগমন, উইল প্রণয়ন সব কিছুরই খবর উনি রাখেন। একতলার ঘরটিতে বসে আপন মনে হুঁকো টানেন আর চতুর্দিকে নজর রাখেন। কাল বিকেলে স্যুট-বুট পরা যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁকে

ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নি যোগানন্দ। তবে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন লোকটা কে। আজ সকালে তিনি দ্বিতলে উঠে এসে জগদানন্দকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, কাকা কাল বিকেলে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনিই কি আপনার সেই রেঙ্গুনের ম্যানেজার য়ু সিয়াঙ ?

জগদানন্দ চমকে উঠে বলেছিলেন, তুমি কেমন করে জানলে ?

—আন্দাজ করছি। আমি একটা কথা বলতে এসেছি কাকা—

—বল। বস ঐ চেয়ারটায়।

যোগানন্দ বসেন নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলেন, এবার নীলুর বিয়েটা আপনি দিয়ে দিন। শ্যামলের সঙ্গে নয়, ঐ জয়দীপ ছেলেটির সঙ্গেই। ওরা দুজনেই দুজনকে—

মাঝপথে থেমে গিয়েছিলেন যোগানন্দ। বৃদ্ধ বলেছিলেন, কিন্তু তুমি তো এতদিন তোমার শ্যালিকাপুত্র ঐ শ্যামলের সঙ্গেই নীলুর বিয়ে দিতে চাইতে। আজ হঠাৎ তোমার মত বদলালো কেন ?

—শ্যামল ছেলেটা সত্যই ভালো। কিন্তু দিনকাল পালটে গেছে। এখন আর বাপ-মা-কাকা-জেঠাদের পছন্দ অনুসারে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে না। জয়দীপ আর নীলিমা যখন পরস্পরকে—

এবারও সঙ্কোচে থেমে গিয়েছিলেন উনি।

জগদানন্দ বলেন, ঠিক আছে। তোমার কথাটা মনে রাখব। আপাতত একটা ঝামেলায় পড়েছি, সেটা মিটুক।

—সে সম্বন্ধেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমারও বয়স ষাটের কোঠায়। একা মানুষ, কতদিনই বা বাঁচব ? আপনি কেন শুধু শুধু আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, কাকা ?

জগদানন্দ অবাক হয়ে যান। কী বলবেন ভেবে পান না।

—তার চেয়ে ঐ পঞ্চাশ হাজারের ভিতর থেকে বিশ-পঁচিশ হাজার দিয়ে য়ু সিয়াঙ-এর সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।

জগদানন্দ চমকে উঠে বলেন, তার মানে ? কী মেটাবো ?

মাথা নিচু করে যোগানন্দ বলেন, কাকা, এ বাড়িতে আপনার ছেলের মতই মানুষ হয়েছি। আমি তো সবই জানি। আপনি আমাকে যা দিয়ে যাবেন, আমি মরে গেলে ঐ নীলুই আবার তা পাবে। অথচ আজ যদি সব জানাজানি হয়ে যায় হয়তো জয়দীপ বেঁকে দাঁড়াবে। হয়তো নীলু মনের দুঃখে …না-কাকা, আপনি আর আপত্তি করবেন না—

সব কথা শুনে কৌশিক জানতে চাইল কেন তাকে ডেকে পাঠানো

হয়েছে। জগদানন্দ বললেন যে, গতকাল বাসু-সাহেব যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তারপর থেকেই তিনি কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন! গতকাল তাঁর তিলমাত্র ঘুম হয়নি। জগদানন্দ অনুরোধ করলেন, মহেন্দ্র যতদিন না বিদায় নিচ্ছে—মানে আর দু-তিন দিন হতে পারে—ততদিন কৌশিক বরং এ বাড়িতেই রাত্রিবাস করুক। কাল রেজিস্ট্রেশন হবে—তারপরেই মহেন্দ্র চলে যাবে। তখনই কৌশিকের ছুটি।

কৌশিক রাজী হল। বাড়িতে ফোন করে দিল। স্থির হল, কৌশিক থাকবে দ্বিতলে—জগদানন্দের ঘরের বিপরীতে উত্তর দিকের ঘরে। সে ঘরে এতদিন ছিলেন উকিল বিশ্বম্ভরবাবু, অগত্যা তাঁকে একতলায় নেমে যেতে হল। মহেন্দ্রবাবু তাঁর উকিলের কাছাকাছি থাকতে চান, তাই তিনিও দ্বিতল ছেড়ে একতলায় যোগানন্দের ঘরটি দখল করতে চাইলেন। যোগানন্দের তাতে আপত্তি নেই। ক'রাত্রের জন্য যোগানন্দ দ্বিতলের উত্তর-পশ্চিমের ঘরখানি দখল করলেন, ঠিক সিঁড়ির পাশেই। জগদানন্দ, নীলিমা অথবা শ্যামলের শয়নকক্ষের কোনও পরিবর্তন হল না।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে সবাই শুতে যাবে তখন টেলিফোনটা বেজে উঠল। নীলিমা ফোন ধরল। দমদম থেকে জয়দীপ ফোন করছে। সে সঙ্কেতে জানালো পাখি আবার খাঁচায় ফিরে এসেছে। তার ঘরের আলো এইমাত্র নিবল। পর মুহূর্তেই সে ফোন রেখে দিল।

শুতে যাবার আগে কৌশিক সারা বাড়িটা একবার টহল দিয়ে এল। যে যার ঘরে চলে গেছেন। একতলায় মহেন্দ্র এবং বিশ্বম্ভর শুয়ে পড়ছেন। ঘরের বাতি নেবানো। শ্যামল একটা টেবিলে ল্যাম্প জ্বেলে বই পড়ছে। দোতলায় জগদানন্দের ঘরে আলো জ্বলছে। কৌশিক এসে দরজায় টোকা দিল। জগদানন্দ ভিতর থেকে "ল্যাচ-কী' খুলে দিলেন; কৌশিককে দেখে বললেন, আবার কী হল?

—কিছু না। শুতে যাবার আগে দেখে যাচ্ছি। আপনি কি রাত্রে ভিতর থেকে ঘর বন্ধ করে রাখেন?

—এতদিন রাখতাম না। ইদানিং রাখছি!

কৌশিক লক্ষ্য করে দেখে জগদানন্দের খাটের পাশে রাখা একটি সাইড-টেবিল। তার উপর রাখা আছে ঢাকা দেওয়া এক গ্লাস জল, একটি টর্চ, সিগারেট-দেশলাই, ছাইদান। খান কয়েক বই, একটি টেবিল ল্যাম্প এবং একটি সুদর্শন খাপে ঢাকা হাতীর দাঁতের মুঠওয়ালা ছোরা। কৌশিক বলল, আজ আর বইটই পড়বেন না, কাল ঘুম হয় নি, শুয়ে পড়ুন।

শুভরাত্রি জানিয়ে সে বিদায় নিল। 'ক্রুক' করে-ল্যাচ-কী বন্ধ হবার শব্দ হল।

বারান্দায় দেখা হয়ে গেল নীলিমার সঙ্গে। মেয়েটি জানতে চায়, বেড-টি খাবার অভ্যাস আছে না কি?

—পেলে খুশি হই। না পেলেও চলে যায়।

—কটা নাগাদ পেলে খুশি হন?

উপরে একতলা / নিচে দো-তলা

—কাউকে বিরক্ত না করে যদি হয়, তো ধরুন সকাল ছ'টায়।
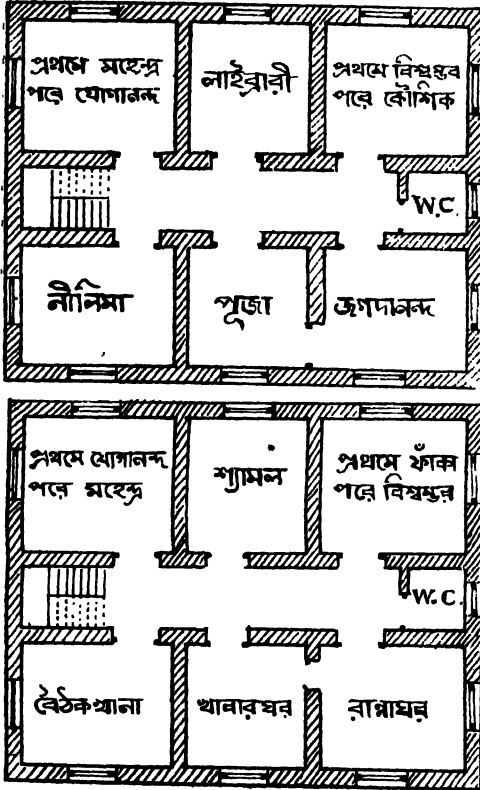
—কেউ বিরক্ত হবে না, কারণ আমি ঐ সময় এক কাপ নিজেই বানিয়ে খাই।

ভোররাত্রে কৌশিকের ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন দরজায় টোকা দিচ্ছে। স্বতঃই নজর পড়ল ঘড়িটার দিকে। ভোর পৌনে পাঁচটা। সবে সকাল হচ্ছে। এত সকালে তো সে বেড-টি খেতে চায় নি। কৌশিক উঠে পড়ে। স্লিপারটা পায়ে গলায়। দরজাটা খুলে দিতেই দেখে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে নীলিমা।

—কি ব্যাপার ? এত ভোরে বেড-টি ?

—আপনি একবার বাইরে আসুন তো—

ওর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের আভাস। কৌশিক তৎক্ষণাৎ বার হয়ে আসে। সামনে জগদানন্দের ঘরের দরজাটা খোলা। নীলিমা সে ঘরে প্রবেশ করে। পিছন পিছন কৌশিক। হাত বাড়িয়ে নীলিমা সুইচটা জ্বেলে দেয়। খাটের উপর জগদানন্দ নেই। বিছানাটার চাদর কোঁচকানো। নীলিমা একটা আঙুল নির্দেশ করে কি-যেন দেখায়। বলে, এর মানে কী ?

ব্যাপারটা বুঝতে পারে না কৌশিক। প্রশ্ন করে, আপনার দাদু কোথায় ?

—দাদু পূজার ঘরে—পূজা করছেন। কিন্তু এটা কী করে হল ?

এক পা এগিয়ে নীলিমা দর্শনীয় বস্তুটার কাছে সরে আসে। এতক্ষণে নজর হয় কৌশিকের। টেবিলের উপর কাল রাত্রে যে কয়টি জিনিস দেখেছিল তার একটা নেই। চামড়ার খাপটা আছে, কিন্তু খাপ থেকে গজদন্তের মুঠটা বার হয়ে নেই অর্থাৎ ছোরাটা অন্তর্হিত !

ভ্রূকুঞ্চিত করে কৌশিক একটি মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। দ্রুত ঘরের চারদিক দেখে নেয়। তারপর বলে, দাদুকে জিজ্ঞাসা করেছেন ?

—না। উনি খুব ভোরে ওঠেন। রোজ এই সময় পূজায় বসেন। আজও তাই বসেছেন। কিন্তু ওঁর ঘরে ঢুকে হঠাৎ এটা নজরে পড়ল আমার। তাই আপনাকে ডেকে তুলেছি।

—হয় তো ঘর খালি রেখে পূজা ঘরে যাবার সময় উনি ওটা তুলে রেখে গেছেন।

—সে-ক্ষেত্রে খাপ সমেত ওটা তুলে রাখাই স্বাভাবিক হত না কি ?

যুক্তিপূর্ণ কথা। কৌশিক বললে, চলুন, প্রথমেই ওঁকে জিজ্ঞাসা করি।

—পূজার সময় কেউ ওঁকে ডাকলে উনি বিরক্ত হন।

কৌশিক সে কথায় কর্ণপাত করে না। পূজা ঘরে গিয়ে হাজির হল ওরা। বৃদ্ধ বিরক্ত হলেন যতটা তার চেয়ে বিস্মিত হলেন বেশি। বললেন, তাই নাকি ? খাপটা আছে অথচ ছোরাটা নেই ? কই চলতো দেখি।

এ ঘরে আবার ফিরে এলেন ওঁরা। বৃদ্ধ বললেন, তাজ্জব কাণ্ড। আমি তো সকালে ওটাতে হাত দিই নি। সকালে ওদিকে নজরই পড়ে নি আমার !

কৌশিক বললে, তা কেমন করে হয় ? রাত্রে আপনি যখন ঘরটা বন্ধ করেন তখন আমি স্বচক্ষে দেখেছি—হ্যাঁ স্পষ্ট মনে আছে আমার—হাতির দাঁতের মুঠওয়ালা ছোরাটা ওখানেই ছিল। রাত্রে ঘর তালাবন্ধ ছিল ভিতর থেকে ! আপনি কখন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন ?

—ঘড়ি দেখিনি। আধঘণ্টা খানেক আগে।

নীলিমা বললে, দাদু যখন বার হয়েছেন তখন আমি জেগে। দোতলায় তারপর আর কেউ আসে নি। এলে আমার নজরে পড়ত।

চকিতে কৌশিকের মনে হল—জগদানন্দ খুন হতে পারেন এমন একটা আশঙ্কা গতকাল করেছিলেন বাসু-সাহেব; কিন্তু উল্টোটাও তো হতে পারে? কাল রাত্রে জগদানন্দের বদলে যদি মহেন্দ্রবাবু খুন হয়ে থাকেন? কৌশিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল জগদানন্দের দিকে। তাঁর মুখ ভাবলেশহীন। কী ভাবছেন তিনি, বোঝার উপায় নেই। স্থির হয়ে বসে আছেন ইজিচেয়ারে। কৌশিক নীলিমাকে বললে, বাড়ির আর সবাই ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আমি এখনই জানতে চাই সবাই সুস্থ আছে কিনা। আপনাদের কাছে ঐ ঘরগুলোর ডুপ্লিকেট চাবি আছে?

নীলিমাও বোধকরি আন্দাজ করেছে কৌশিক কী ইঙ্গিত করছে। তার মুখটা সাদা হয়ে যায়। অস্ফুটে বলে, আপনি কী আশঙ্কা করছেন—

তাকে কথাটা শেষ করতে দেয় না কৌশিক। বলে, সে সব আলোচনা পরে। প্রত্যেকেই ঘর ভিতর থেকে বন্ধ করে ঘুমাচ্ছেন। আমি জানতে চাই তাঁদের কাল রাত্রে কোনও বিপদ হয়েছে কিনা। আপনাদের কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে? তাহলে কাউকে কিছু না জানিয়ে নিঃশব্দে ঘরগুলো দেখে আসতে পারি।

মেয়েটি অনেকটা সামলেছে। তবু সে কাতর ভাবে একবার তার দাদুর দিকে তাকায়। তারপর বলে, আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবির থোকা আছে। আসুন এঘরে।

মেয়েটির পিছন পিছন কৌশিক চলে এল তার শয়নকক্ষে। নীলিমা একটা টানা-ড্রয়ার টেনে খুলল। তারপর বিহ্বল হয়ে তাকালো কৌশিকের দিকে।

—কী হল?— কৌশিক ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করে।

নীলিমার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা। তার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। কথা বার হল না।

—কী হয়েছে বলুন। অমন আমতা করছেন কেন?

—চাবির থোকাটা এখানেই থাকে। সেটা নেই! চুরি গেছে!

কৌশিক দাঁতে দাঁতে চেপে বলে, অর্থাৎ যে সেটা চুরি করেছে তার কাছে কালরাত্রে সব কটা ঘরই ছিল অবারিত দ্বার—খুনীর স্বর্গ!

নীলিমা জবাব দিল না। বসে পড়ল তার খাটে।

—এবং বাড়িসুদ্ধ লোককে না জাগিয়ে আমরা কিছু জানতে পারব না।

এবারও নীলিমা জবাব দিল না। দু-হাতে মুখটা ঢেকে সে নির্বাক বসে থাকে।

জগদানন্দ কখন নিঃশব্দে উঠে এসেছেন তা ওরা খেয়াল করে নি। এবার দরজার কাছ থেকে তিনি বলে ওঠেন, না। আমার কাছে একটা 'মাস্টার কী' আছে, তা দিয়ে সবকটা ঘরের দরজা খোলা যায়। তুমি সব-গুলো ঘর একবার দেখে এস।

হাত বাড়িয়ে একটি চাবি তিনি কৌশিককে দেন। এগিয়ে এসে নীরবে নাতনির মাথায় একটি হাত রাখেন। সে স্নেহস্পর্শে মনোবল ফিরে পায় মেয়েটি। বলে, চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। দাদু তুমি এখানেই অপেক্ষা কর।

তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি। কৌশিক আর নীলিমা বার হল তদন্ত করতে। কৌশিক বললে, প্রথমেই মহেন্দ্রবাবুর ঘর। তিনিই—

হঠাৎ তার হাতটা চেপে ধরে নীলিমা। বলে, কী বলছেন! তার মানে দাদু? ঐ আশি বছরের বৃদ্ধ--

কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ে। চাপা আক্রোশে বলে, কেন? শুধু আশি বছরের বৃদ্ধই বা কেন? তাঁর জোয়ান নাতনিটি কি ছিলেন না এ বাড়িতে?

নীলিমার মুঠিটা আল্‌গা হয়ে যায়। আর কোনও কথা সে বলে না।

ওরা নেমে আসে একতলায়।

সিঁড়ি দিয়ে নেমেই মহেন্দ্রের ঘরের দরজা। নিঃশব্দে কৌশিক মাস্টার কী-টা লাগিয়ে দেয় চাবির ফুটোয়। ক্লিক করে শব্দ হল। সন্তর্পণে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল কৌশিক। দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রইল নীলিমা—একটা হাত মুখে চাপা দিয়ে—যেন একটা অনিবার্য আর্তনাদকে এখনই রুখতে হবে তাকে।

তড়াক করে খাটের উপর উঠে বসল মহেন্দ্র। বলল, এর মানে কী?

ধড়ে প্রাণ এল কৌশিকের। বলল, বেড-টি খাবেন? চা হচ্ছে!

মহেন্দ্র প্রথমেই তোশকের নিচে হাত চালিয়ে কি যেন দেখে নিল। তারপর বললে, ইয়ার্কি করার জায়গা পান নি? চা খাবার জন্যে ডাকতে চান তো দরজায় নক করেন নি কেন? দরজা খুললেন কি করে?

কৌশিক বললে, খামকা চেঁচামেচি করবেন না। চা হয়ে গেছে, মুখে চোখে জল দিয়ে নিন।

বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, কুইক, বিশ্বম্ভর উকিল কোন্ ঘরে শুয়েছিল?

নীলিমা আবার কৌশিকের হাতটা ধরে। অস্ফুটে বলে, বিশ্বম্ভরবাবু নয়, চলুন, বরং ছোটকাকুর ঘরটা দেখে আসি।

—ছোটকাকু ?

—যোগানন্দ। উইল অনুযায়ী যাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার কথা।

খণ্ড-মুহূর্তের জন্য কৌশিক দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর বলে, ঠিক কথা! নেক্সট প্রবাবিলিটি বোধহয়—যোগানন্দ!

সিঁড়ি বেয়ে ওরা উপরে উঠে আসে। ততক্ষণে ওদিককার ঘর খুলে বিশ্বম্ভর উকিলও বার হয়ে পড়েছেন করিডোরে. সম্ভবতঃ মহেন্দ্রের উচ্চ কণ্ঠস্বর কানে গিয়েছে তাঁর। মহেন্দ্রও দরজা খুলে উঁকি দিল।

কৌশিক আর নীলিমা উঠে এল দোতলায়। পিছন পিছন বিশ্বম্ভর আর মহেন্দ্র। তারা দুজনে নিম্নস্বরে কি যেন বলাবলি করছে। কৌশিক যোগানন্দের ঘরের দরজায় করাঘাত করল। কেউ সাড়া দিল না। সেই অবসরে বিশ্বম্ভর আর মহেন্দ্র এসে উপস্থিত হয়েছেন ঐ রুদ্ধ দ্বারের সামনে। জগদানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঘরের দ্বারপথে।

কৌশিক 'মাস্টার কী' দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। চারজনেই হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করল ঘরে। পরমুহূর্তেই নীলিমার আর্ত চীৎকারে চকিত হয়ে উঠল উষা মুহূর্তটি। কৌশিক ধমক দিয়ে ওঠে, চুপ করুন! কেউ কোন কিছু স্পর্শ করবেন না। বাইরে, বাইরে আসুন সবাই—

বিশ্বম্ভর দৃশ্যটা পিছন থেকে দেখতে পায়নি। বললে, কেন মশাই? আপনি হুকুম চালাবার কে ?

কৌশিক বললে, আপনি একা এ ঘরে থাকতে চান থাকুন; কিন্তু পুলিস এসে পড়ার আগে আমি ঘরটা তালাবন্ধ রাখতে চাই। বাইরে আসুন মিস্ সেন।

নীলিমা আঁচলে মুখ ঢেকে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন জগদানন্দ। তাঁর পাঁজরসর্বস্ব বুকে তিনি টেনে নিলেন নাতনিকে। কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি।

মহেন্দ্রবাবু কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ঘরের ভিতর। তাকে পিছন থেকে টেনে ধরল বিশ্বম্ভর। বললে, খবর্দার! কোন কিছু ছোঁবেন না। বাইরে বেরিয়ে আসুন। ওরা আমাদের জড়াতে চাইছে। এখনই পুলিসে খবর দেওয়া উচিত।

হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এল মহেন্দ্র আর বিশ্বম্ভর।

জগদানন্দ নাতনিকে বুকে জড়িয়ে দ্বার পথে দাঁড়িয়েছিলেন। এতক্ষণে তাঁর নজর পড়ল ঘরের ভিতর। খাটের উপর উবুড় হয়ে শুয়ে আছে তাঁর

নির্বিরোধী ভাইপো—যোগানন্দ। তার পিঠের উপর উঁচু হয়ে জেগে আছে একটা সৌখিন ছোরার মুঠ—চমৎকার হাতীর দাঁতের কাজ করা। রক্তে ভেসে গেছে খাট আর মেঝে।

পাশের ঘর থেকে তখন শোনা যাচ্ছে কৌশিকের কণ্ঠস্বর ইস দ্যাট ডবল টু ডবল ওয়ান ডবল-থ্রি ? লালবাজার ?...পুট মি টু হোমি-সাইড, য়ুনিট, প্লীজ ? হ্যাঁ, খুন হয়েছে !

ছয়

মাত্র সাতদিনে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে মামলাটা ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেল এবং আসামীকে তিনি দায়রায় সোপর্দ করলেন। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে কেস উঠল দায়রা জজের আদালতে। এতটা তাড়াতাড়ি সচরাচর হয় না। এ ক্ষেত্রে সেটা করতে হয়েছে রাজনৈতিক চাপে। মামলায় একজন সাক্ষী আছেন যিনি বিদেশের নাগরিক। তিনি সমন পেয়েছেন। বার্মিজ কনস্যুলেট ভারত সরকারকে জানিয়েছেন যে, হয় অবিলম্বে জবানবন্দী নিয়ে তাঁদের নাগরিককে দেশে ফিরে যেতে দিতে হবে অথবা তাঁর ক'লকাতায় অবস্থানের ব্যয়ভার ও খেসারত ভারত সরকারকে বহন করতে হবে। ফলে এই তাড়াহুড়া।

তদন্তকারী অফিসার মোটামুটি নিঃসন্দেহ হয়েছেন অপরাধীর অপরাধ সম্বন্ধে। পুলিসের বক্তব্য অনুযায়ী কেসটা এই—

আসামী জগদানন্দের ভাইপো যোগানন্দ কোন সূত্রে একটি পারিবারিক গোপন রহস্য জেনে ফেলেন। সেই রহস্যটা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে জগদানন্দকে শোষণ করছেন। জগদানন্দ ঐ উপার্জনহীন ভাইপোটিকে এতদিন খোরপোষ দিয়ে যাচ্ছিলেন বিনা প্রতিবাদে। সম্প্রতি যোগানন্দ চাপ সৃষ্টি করায় বৃদ্ধ একটি উইল করে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাবার লোভ দেখান। উইলটি লেখা হয় এবং সেটা পাওয়াও গেছে। রেজিস্টার্ড উইল নয়। তারপর ঘটনার পূর্বদিন রবিবার, যোগানন্দ এবং তাঁর কাকা জগদানন্দ দীর্ঘসময় রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করেন। এই সময় নাকি জগদানন্দ বলে উঠেছিলেন, এরা ভেবেছে কি ? সব কটাকে খুন করব আমি ! তারপর ঘটনার দিন সকালে জগদানন্দ তাঁর আলমারি খুলে একটি ছোরা বার করেন। ঘটনার রাত্রে যোগানন্দ ভিতর থেকে তালা বন্ধ করে ঘরে শুয়ে-

ছিলেন—কিন্তু জগদানন্দের কাছে একটি 'মাস্টার কী' ছিল, যা দিয়ে সব ঘর বাইরে থেকে খোলা যায়।

পুলিসের মতে, মৃত্যুর সময় বারোটা থেকে সোয়া বারোটা। সময়টা নির্ধারণ করা হচ্ছে শ্যামলের জবানবন্দী থেকে। শ্যামল রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত জেগে বই পড়েছে। তারপর সে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে; কিন্তু তার ঘুম আসে নি। ঠিক বারোটার সময় সে বাইরের বারান্দায় কার পদশব্দ শুনতে পায়। এক তলার কোন বাসিন্দা বাথরুমে যাচ্ছে মনে করে সে আর খেয়াল করে নি। পরে অর্থাৎ মিনিট দশেক পরে তার মনে হল পদশব্দটা সিঁড়িতে হচ্ছে। এতে সে কৌতূহলী হয়ে পড়ে। কারণ, দোতলায় পৃথক বাথরুম আছে। সে প্রয়োজনে মধ্য রাত্রে কাউকে উপর থেকে নিচে অথবা নিচে থেকে উপরে উঠতে হয় না। তাই শ্যামল উঠে পড়ে। ঘরের আলো জ্বালে না; জানলা দিয়ে দেখতে চায়। চাদরে আপদমস্তক ঢাকা দেওয়া একজনকে সে সিঁড়ির মুখে দেখতে পায়। লোকটা তখন উপর থেকে নেমে আসছে। লোকটা মাঝারি উচ্চতার, তার মুখটা সে দেখে নি। শ্যামল সাহস করে দরজা খোলে নি; আবার শুয়ে পড়ার আগে ঘড়িটা দেখেছিল। রাত তখন সওয়া বারোটা।

অটোপ্সি-সার্জেনের মতেও মৃত্যুর সময় রাত সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা।

জগদানন্দের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছে। অবশ্য ওঁর সামাজিক মর্যাদা এবং বয়সের কথা বিবেচনা করে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য আসামীপক্ষের ডিফেন্স কাউন্সেল পি. কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল।

বাসু-সাহেব তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়েছেন যথারীতি। তাতে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি নূতন ক্লু, যার সন্ধান তাঁকে দিয়েছে জয়দীপ। বাসু-সাহেব ঐ সূত্রটি যাচাই করে দেখে বুঝেছেন খবরটা মিথ্যা নয়।

জয়দীপ ঘটনার দিন সকাল সাতটা নাগাদ দমদমের হোটেল থেকে ফোন করেছিল। তখন এ বাড়িতে ইন্সপেক্টার তদন্ত করছেন। টেলিফোন ধরেছিল কৌশিক। জয়দীপ বলেছিল, একটা জরুরী খবর আছে, শুনুন—

কৌশিক বলেছিল, যত জরুরী খবরই হোক আপনি এখনই চলে আসুন। এখানে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে, কাল রাত্রে।

—কাল রাত্রে! কী ব্যাপার।

—আপনি চলে আসুন—লাইন কেটে দিয়েছিল কৌশিক।

জয়দীপ বেলা নটা নাগাদ এসে পৌঁছায়। তখন পুলিস চলে গেছে, কিন্তু বাসু-সাহেব এসেছেন। জয়দীপ বলে, আগের রাত্রে দমদম এলাকায় লোড-

শেডিং হয়েছিল। হোটেলে এয়ার কণ্ডিশনার বা ফ্যান চলে নি। রাত ঠিক বারোটা চল্লিশ মিনিটে পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠায় জয়দীপের ঘুম ভেঙে যায়। বার তিনেক টেলিফোনটা বাজার পরেই শোনা যায় য়ু সিয়াঙের ভারি কণ্ঠস্বর।

—হ্যালো!

ইতিমধ্যে জয়দীপ টর্চটা জেলেছে। ডায়েরিটা খুলে তৈরী হয়ে নিয়েছে। স্তব্ধ রাত্রি, গরমের জন্য জানালা খোলা। য়ু সিয়াঙের প্রত্যেকটি কথা সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে ঠিক পাশের ঘর থেকে এবং তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলেছে। আদ্যোপান্ত কথা সে বলেছে ইংরাজিতে। তার আক্ষরিক অনুবাদ নিম্নোক্তরূপ:

"হ্যালো!...হ্যাঁ কথা বলছি...কে?...আমি চিনি না আপনাকে, কী চান? ...এমন মাঝ রাত্রে বিরক্ত করছেন কেন?...হ্যাঁ চিনি, মহেন্দ্রবাবুকে চিনি। আপনি তাঁর কে?...কী? জোরে বলুন!...ও বুঝেছি, সলিসিটার! বলুন আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। পথের কাঁটা দূর হয়েছে মানে কি? টেলিফোনে যদি বলা না যায় তবে মাঝ রাতে বিরক্ত করছেন কেন? আচ্ছা বেশ, আমি সকালে অপেক্ষা করব। সকাল বারোটা পর্যন্ত। শুভরাত্রি।"

বাসু তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েছিলেন। এখানকার সব কাজ ফেলে রেখে সোজা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন দমদমের হোটেলে। ওর কার্ড দেখে য়ু সিয়াঙ বললে, কাল মাঝ রাত্রে আপনিই ফোন করেছিলেন?

বাসু হ্যাঁ-না এড়িয়ে বললেন, মাঝ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে টেলিফোন ধরতে হলে সকলেরই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

য়ু সিয়াঙ বলেন, থাক, কি বলতে চান বলুন? মহেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করে আনলেন না কেন?

বাসু বললেন, মহেন্দ্রবাবুর আসা এখন সম্ভবপর নয়—কিন্তু কালকের সেই কথাটা মনে আছে নিশ্চয়। আপনাদের দুজনেরই পথের কাঁটা দূর হয়েছে।

—পথের কাঁটা! কী বলছেন আপনি। কে সে?

—যোগানন্দ সেন। যাকে জগদানন্দ তাঁর উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কাল রাত্রে তিনি খুন হয়েছেন!

'খুন' কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়াল য়ু সিয়াঙ। বললে, খুন হয়েছেন! বলেন কী! কে খুন করেছে?

বাসু হেসে বলেন, সেটা আর আমার মুখ দিয়ে নাই বা বলালেন।

য়ু সিয়াঙ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল বাসু-সাহেবের দিকে। তারপর বললে, লুক হিয়ার স্যার! ব্যাপারটা একটা মার্ডার কেস। আপনাকে আমি চিনি না। আপনি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার কি না তাও আমি জানি না। আপনি কি প্রমাণ করতে পারেন যে, আপনি সত্যিই—

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, আমার ভিজিটিং কার্ড আপনি দেখেছেন, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সটাও পরখ করে দেখতে পারেন।—পকেট থেকে বের করেন সেটা।

য়ু সিয়াঙ বলে, তাতে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় যে, আপনি ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু, বার-এ্যাট-ল; কিন্তু আপনি যে মহেন্দ্রবাবুর শত্রুপক্ষের ব্যারিস্টার নন তা আমি বুঝব কি করে?

বাসু-সাহেব বাড়িয়ে ধরেন একখানি কাগজ। একটু আগে জয়দীপ যা লিখে দিয়েছে। বলেন, কাল রাত্রি বারোটা চল্লিশ মিনিটে আপনি টেলিফোনে এই কটা কথাই বলেন নি কি? মিলিয়ে দেখে নিন।

য়ু সিয়াঙ অত্যন্ত সাবধানী। কাগজটা পড়ে বললে, হ্যাঁ বলেছি। কিন্তু তাতেও প্রমাণ হয় না যে. আপনি মহেন্দ্রবাবুর উকিল। এটুকু প্রমাণ হয় যে, গতকাল রাত্রে আপনিই আমাকে ফোন করেছিলেন। আপনি প্রমাণ দিন আপনি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার।

বাসু-সাহেব নীরবে উঠে দাঁড়ান। বলেন. আমি একবারও বলিনি যে, আমি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার। আচ্ছা নমস্কার!

—তার মানে?—হতচকিত য়ু সিয়াঙ অবাক হয়ে যায়।

কোর্টে মামলা ওঠার আগের দিন বাসু-সাহেব জনান্তিকে ডেকে পাঠালেন নীলিমা আর জয়দীপকে। বললেন, তোমরা দুজন ব'স। কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।

জয়দীপ আর নীলিমা বসল পাশাপাশি।

—তোমরা জান যে, পুলিসের মতে যোগানন্দ একটা গোপন পারিবারিক রহস্য অবলম্বন করে ব্ল্যাকমেল করছিলেন জগদানন্দকে—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে ওঠে, কিন্তু সেটা তো একেবারে মিথ্যা।

—যোগানন্দবাবুর ব্ল্যাকমেল করাটা মিথ্যা; কিন্তু পারিবারিক রহস্যটার অস্তিত্ব মিথ্যা নয়। বস্তুতঃ সেই রহস্য নিয়ে মহেন্দ্র এবং য়ু সিয়াঙ ওঁকে ব্ল্যাকমেলিং করছিল। কেন, তোমরা জান না?

নীলিমা বললে, জানি। কিন্তু রহস্যটা কী, তা জানি না। আপনি জেনেছেন

—জেনেছি। সে কথা কোর্টে অনিবার্য ভাবে উঠবে। তাই আগেভাগেই তা তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাইছি।

—বলুন?—নীলিমা উৎকর্ণ।

বাসু একটু ইতস্তত: করে বললেন, বলছি; কিন্তু তার আগে মনটা প্রস্তুত কর নীলিমা। খবরটা তোমার পক্ষে শকিং! একটা প্রচণ্ড আঘাত তুমি পাবে—উপায় নেই—এ আঘাত সইবার মত মনের জোর তোমার আছে—আমি বিশ্বাস করি।

মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, বলুন আপনি। আমি প্রস্তুত! দাদু কাউকে খুন করেছিলেন?

—না, খুন নয়। তাছাড়া অপরাধটা তিনি করেন নি।

—তিনি করেন নি? তবে তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করছে কি করে ওরা?

—ঐ যে বললাম। পারিবারিক কলঙ্ক! ধর তোমার বাবার নামে, অথবা মায়ের নামে কোন কথা। যেটা গোপন রাখতে চান জগদানন্দ।

ভ্রূ-দুটি কুঁচকে ওঠে নীলিমার। বলে, প্লীজ, যা বলবার এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলুন আপনি!

—তোমার বাবার সঙ্গে তোমার মায়ের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তার আগেই তুমি এসে আশ্রয় নিয়েছিলে তোমার মায়ের দেহে।

মেয়েটি একেবারে পাথর হয়ে যায়।

জয়দীপ চীৎকার করে ওঠে, আমি বিশ্বাস করি না! বাজে কথা।

নীলিমার চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। অস্ফুটস্বরে বলে, তবে কে আমার বাবা?

—আমি জানি না নীলিমা। আমরা কেউই জানি না! তোমার দাদুও নয়!

হঠাৎ উঠে পড়ে মেয়েটি। দ্রুত পায়ে ঢুকে যায় বাথরুমে। সশব্দে দোরটা বন্ধ হয়ে যায়। জয়দীপ স্তব্ধ বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়। বাসু বলেন, ইয়াং ম্যান! এজন্য যদি নীলিমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে চাও তাহলে এই তোমার সুযোগ। নিঃশব্দে চলে যাও। এতবড় আঘাতটা যখন সয়েছে, তখন তোমার দেওয়া আঘাতটাও ও সইতে পারবে।

জয়দীপ বসে পড়ল চেয়ারে। দৃঢ়স্বরে বললে, মিস্টার বাসু, আপনাকে জানাবার সময় হয়েছে—আমরা বিবাহিত! নীলিমা আমার স্ত্রী।

এবার চমকে ওঠার পালা বাসু-সাহেবের। বলেন, মানে! কবে থেকে?

—দাদু যেদিন উইল করলেন তার পর দিন। ম্যারেজ রেজিস্টার আমার পরিচিত। বিনা নোটিসে রাতারাতি বিয়ে দিতে তিনি আপত্তি করেন নি!

বাসু-সাহেব তাঁর হাতটা বাড়িয়ে জয়দীপের বলিষ্ঠ হাতখানা টেনে নেন বলেন, মাই কন্‌গ্র্যাচুলেসন্স!

সাত

—আদালত যদি অনুমতি করেন তাহলে বাদীপক্ষ একটি সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে এই মামলার উদ্বোধন করতে চান। বাদীপক্ষ আশা রাখেন যে, তাঁরা প্রমাণ করবেন এই মামলার আসামী বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী জগদানন্দ সে একটি পারিবারিক রহস্য উদ্ঘাটনের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশা সুপরিকল্পিতভাবে তাঁর ভাইপো ব্ল্যাকমেলার যোগানন্দকে স্বহস্তে হত্যা করেন আমরা আশা রাখি, প্রমাণ করব যে, এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল রাত বারোটা থেকে সওয়া বারোটার মধ্যে। যখন নিহত যোগানন্দ জগদানন্দের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। আসামীর বয়স এবং মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে এক্ষেত্রে লঘু দণ্ডদান করার প্রশ্ন ওঠে না, যেহেতু হঠাৎ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে এ হত্যাকাণ্ড করা হয় নি—বরং মৃত যোগানন্দকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোভ দেখিয়ে নিশ্চিন্ত করে, তাকে ঘটনার রাতে একতলার বদলে দ্বিতলে নিয়ে এসে যেভাবে আসামী সুপরিকল্পিতভাবে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেন, তাতে তাঁকে চরমতম দণ্ড দিয়ে মাননীয় বিচারক এ আদালতের মর্যাদা রক্ষা করবেন বাদীপক্ষ এমনই আশা রাখেন।

সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটার নিরঞ্জন মাইতি আসন গ্রহণ করলেন। আদালতে জনসমাগম বেশ হয়েছে। আসামীর কাঠগোড়ায় একটি চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ জগদানন্দ। আসামীর বার্ধক্যের কথা বিবেচনা করে বিচারক এটুকু সৌজন্য দেখিয়েছেন। আসামীর মূর্তি ভাবলেশহীন। তিনি কী ভাবছেন বোঝা যাচ্ছে না।

বিচারক সদানন্দ ভাদুড়ী এবার প্রতিবাদীদের দিকে ফিরে বললেন, আপনারা কি কোন প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চান?

সচরাচর বাসু-সাহেব প্রারম্ভিক ভাষণ দেওয়ার বিপক্ষে। আজ কিন্তু তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আদালত যখন অনুমতি করছেন তখন প্রতিবাদী তরফে একটি মাত্র কথাই আমরা বলব: আমরা আশা রাখি, প্রমাণ করব— হত্যার সঙ্গে আসামীর কোনও সম্পর্ক নেই। কে আসামীর স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করেছে তা জানবার জন্য তিনি আমাদের চেয়েও উৎসুক আমরা আশা রাখি, প্রমাণ করব—মৃত যোগানন্দ ব্ল্যাকমেলিং করেন নি কোন দিনই এবং তাঁর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না আসামী

পক্ষে। থ্যাঙ্কু মি লর্ড! বাদীপক্ষ এবার তাঁদের সাক্ষীদের ডাকতে পারেন।

বাদীপক্ষের প্রথম সাক্ষী অটোপ্সি-সার্জেন। তিনি মৃত্যুর কারণ ও সময় প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে যোগানন্দের মৃত্যু হয়েছে রাত সাড়ে এগারোটার পরে এবং সাড়ে বারোটার আগে। জগদানন্দের নামাঙ্কিত ছোরাটিকে তিনি সনাক্ত করলেন।

বাসু-সাহেব তাঁকে আদৌ ক্রশ-এগজামিন করলেন না।

দ্বিতীয় সাক্ষী ইনভেস্টিগেশান অফিসার ইন্সপেক্টার মণীশ বর্মণ। সে তার সাক্ষ্যে ঘটনার দিন সকালে এসে যা যা দেখেছে তার বর্ণনা দিল। প্রতিটি সাক্ষীকের প্রাথমিক জবানবন্দী যা লিখে নিয়েছে তা পড়ে শোনালো। মহেন্দ্র-বাবু, বিশ্বম্ভরবাবু, শ্যামল এবং নীলিমার প্রাথমিক এজাহার। কৌশিকের নাম উল্লেখ করল না। তারপর দমদমে ভি. আই. পি হোটেলের বাসিন্দা য়ু সিয়াঙ-এর জবানবন্দী যা নিয়েছে তাও পড়ে শোনালো। মাইতি ঐ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, আপনার কাছে মিঃ য়ু সিয়াঙ কি স্বীকার করেছিলেন যে, ঘটনার দিন সকাল দশটার সময় বর্তমান মামলায় বাদীপক্ষের কাউন্সেল মিঃ পি. কে. বাসু দেখা করেন?

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়ান: অবজেকশনে য়োর অনার! বর্তমান মামলার সঙ্গে এ প্রশ্ন সম্পর্ক-বিমুক্ত।

মাইতি একটি বাও করে বলেন, মি লর্ড, এ প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা আমার পরবর্তী প্রশ্নেই উদ্ঘাটিত হবে—আই এ্যাশিয়োর য়ু!

—অবজেকশান ওভাররুলড!

মণীশ বর্মণ বলেন, হ্যাঁ, স্বীকার করেছিলেন।

—মিস্টার য়ু সিয়াঙ কি বলেছিলেন যে, ব্যারিস্টার মিস্টার পি. কে. বাসু পরিচয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—

আবার উঠে দাঁড়ান বাসু: অবজেকশন মিঃ লর্ড! বর্তমান সাক্ষীর পক্ষে প্রশ্নের জবাব হেয়ার-সে। আসামীর অনুপস্থিতিতে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর সঙ্গে মিস্টার য়ু সিয়াঙ-এর কী কথোপকথন হয় বর্তমান সাক্ষীর থেকে তার সেকেণ্ড হ্যাণ্ড রিপোর্ট এ মামলায় গ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়।

—অবজেকশান সাসটেইনড!

মাইতি হেসে বলেন, ঠিক আছে। এ ক্ষেত্রে মামলার পারম্পর্য রক্ষার্থে আমি সাময়িকভাবে বর্তমান সাক্ষীকে অপসারণ করে মিস্টার য়ু সিয়াঙকে সাক্ষ্য দিতে ডাকতে চাই।

বাসু বলেন, আমাদের আপত্তি নেই। সে-ক্ষেত্রে বর্তমান সাক্ষীকে ক্রশ

করবার অধিকারও আমরা মজুত রাখলাম।

আদালতের অনুমতি পেয়ে মিস্টার য়ু সিয়াও সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন মাইতি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করলেন—য়ু সিয়াঙ জগদানন্দের রেঙ্গুনস্থ অফিসের ম্যানেজার হিসাবে 1920 থেকে 1940 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চাকরি করেছেন। এখন তিনি রেঙ্গুনে থাকেন। দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষে এসেছেন। 1940 খ্রীষ্টাব্দের আঠারই মে তারিখে তাঁ চাকরি শেষ হয়। ঐ দিন জগদানন্দের পুত্র তাঁর রেঙ্গুনস্থ যাবতীয় সম্পা প্রায় একাত্তর হাজার টাকায় বিক্রয় করে দেন। এই প্রসঙ্গে মাইতি জান চান, সদানন্দ সেন তারপর কবে রেঙ্গুন ত্যাগ করেন ?

—20. 5. 40 তারিখে, মারুতি জাহাজ যোগে।

—ঐ সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও কি প্রত্যাবর্তন করেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনি কি জানেন, সদানন্দ কোন্ তারিখে বিবাহিত হন ?

—হ্যাঁ জানি। বিবাহে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। 13 5.40 তারিখে।

—সদানন্দ কত তারিখে রেঙ্গুনে পদার্পণ করেন ?

—10.4.40 তারিখে। আমি জাহাজ-ঘাটায় এসেছিলাম তাঁকে রিসি করতে।

—এর আগে সাবালক হবার পর ঐ সদানন্দ সেন কি কখনও ব এসেছিলেন ?

বাসু-সাহেব আপত্তি তোলেন, অবজেকশান ! এ প্রশ্নের জবাব সাক্ষী দি পারেন না। প্রশ্নটি অবৈধ !

জজসাহেব রুলিং দেবার আগেই মাইতি বলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। মিস্টার সিয়াঙ, এটা কি স্বাভাবিক যে, আপনার নিয়োগক একমাত্র পুত্র রেঙ্গুনে যাবেন আর আপনি জানতে পারবেন না ?

—না, স্বাভাবিক নয়। সদানন্দ ইতিপূর্বে রেঙ্গুনে এলে আমার তা জা কথা।

—আপনার জ্ঞাতসারে সদানন্দ সেন যৌবনে পদার্পণের পরে ঐ 10.4 তারিখের আগে বর্মায় আসেন নি ?

—না, আমার জ্ঞাতসারে নয়।

—আপনি তাঁর স্ত্রীকে কতদিন ধরে চিনতেন ?

—তার বালিকা বয়স থেকে।

—সে-কি বিবাহের পূর্বে ভারতবর্ষে এসেছিল ?

বাসু-সাহেব আসন ত্যাগ করার উপক্রম করতেই মাইতি বলেন, অল রাইট, অল রাইট! আই উইথড্র। আচ্ছা মিস্টার য়ু সিয়াঙ, বলুন তো, সদানন্দের স্ত্রী যদি কুমারী বয়সে বর্মা ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আসত তা কি আপনার অজানা থাকতে পারত?

—অসম্ভব। কারণ বালিকা বয়স থেকে ও আমাদের বাড়িতেই অন্য ফ্ল্যাটে থাকত।

—তার মানে, আপনার জ্ঞাতসারে সদানন্দ সেনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ 10.4.40-এর আগে কিছুতেই হতে পারে না?

—হ্যাঁ তাই!

—আচ্ছা মিস্টার সিয়াঙ, এবার বলুন তো—ঘটনার দিন, আই মীন যোগানন্দ সেনের হত্যার দিন, মঙ্গলবার সকাল প্রায় দশটার সময় এ মামলার প্রতিবাদী ব্যারিস্টার মিস্টার পি. কে. বাসু কি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

—করেছিলেন।

—তিনি কি নিজেকে মহেন্দ্র বাবুর সলিসিটার হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলেন?

সাক্ষী একটু ভেবে নিয়ে বলেন, না। কিন্তু তিনি এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে আমি মনে করি—তিনি মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার।

—কী ভাবে তিনি সেই পরিবেশ সৃষ্টি করেন?

—উনি তার পূর্ব রাত্রে রাত ঠিক বারোটা চল্লিশ মিনিটে একটি টেলিফোন করে আমাকে বলেন যে, আমাদের পথের কাঁটা দূর হয়েছে।

আদালতে একটা গুঞ্জন ওঠে বিচারক তার হাতুড়িটা পিটলেন। স্তব্ধতা ফিরে এল আদালতে।

—ঠিক কি কি কথাবার্তা হয়েছিল—মানে যতটা আপনার মনে আছে, বলে যান।

সাক্ষী টেলিফোনে কথোপকথনের একটি বিবৃতি দিলেন এবং বললেন কী ভাবে পরদিন ব্যারিস্টার-সাহেবের পরিচয় পত্র পাওয়া মাত্র তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, তিনিই মহেন্দ্রবাবুর সলিসিটার!

—তার মানে আপনি বলতে চান—ঐ দিন রাত বারোটা চল্লিশে প্রতিবাদী ব্যারিস্টার মিস্টার পি. কে. বাসু জানতেন যে, জগদানন্দ বাবুর বাড়িতে একটা খুন হয়েছে?

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে তাকালেন। তিনি কিন্তু কোন আপত্তি

জানালেন না। সাক্ষী চিন্তা করে জবাবে বলল, তা আমি জানি না। তিনি 'পথের কাঁটা' বলতে কী মীন করেছিলেন, তাও আমি জানি না। তবে রাত বারোটা চল্লিশে ঐ রহস্যময় টেলিফোন-কলে আমি খুব বিস্মিত বোধ করি!

—আপনি কি বোধ করেন, তা আমি শুনতে চাইছি না। আমি জানতে চাইছি—টেলিফোনে ঐ মধ্যরাত্রে আপনাদের যে কথোপকথন হয় তার একটি অনুলিপি কি তিনি আপনাকে পরদিন বেলা দশটায় দেখান?

—হ্যাঁ দেখান।

—য়ু মে ক্রশ-এগজামিন—আসন গ্রহণ করেন মাইতি।

বাসু-সাহেবের প্রথম প্রশ্ন, মিস্টার সিয়াঙ, আপনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন কি এ মামলায় সাক্ষী দেবার জন্য?

সিয়াঙ একটু থতমত খেয়ে যায়। সামলে নিয়ে বলে, নিশ্চয় নয়। আমি ভারতবর্ষে এসেছি দেশ দেখতে—আমার পাশপোর্টেও তাই লেখা আছে।

—কলকাতায় পদার্পণের দিনেই আপনি আপনার প্রাক্তন নিয়োগ কর্তা জগদানন্দের সঙ্গে দেখা করেন. তাই নয়?

—হ্যাঁ তাই।

—আচ্ছা মিস্টার সিয়াঙ, আপনি যখন দেশ দেখতেই এসেছেন তখন কলকাতা শহরটা না দেখে সর্বপ্রথমেই আপনি কেন জগদানন্দ সেনের সঙ্গে দেখা করেন?

—তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে। হাজার হোক, তিনি আমার মনিব ছিলেন।

—ঠিক কথা। আচ্ছা এবার বলুন তো—মহেন্দ্রবাবুকে আপনি প্রথম কোথায় দেখেন এবং কবে?

—রেঙ্গুনে দেখি। মাস তিনেক আগে।

—ঠিক কত তারিখে?

—তারিখ্ আমার মনে নেই।

—উনি যেদিন ফিরে আসেন সেদিন আপনি মহেন্দ্রবাবুকে সী অফ করতে রেঙ্গুন এয়ারপোর্টে এসেছিলেন, তাই নয়?

—হ্যাঁ।

—সেটা কত তারিখ?

—তা আমার ঠিক মনে নেই।

—এবার বলুন তো মিস্টার সিয়াঙ—তিন মাস আগে ঠিক কত তারিখে আপনার সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর সাক্ষাৎ হয়, ঠিক কোন্ তারিখে তিনি ফিরে

আসেন তা আপনার মনে নেই—অথচ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার তারিখগুলো আপনার কেমন করে নিখুঁত ভাবে মনে আছে?

মাইতি আপত্তি জানান। এ প্রশ্নের উত্তর সাক্ষী কেমন করে জানবেন?

বিচারক মৃদু হেসে বললেন, অবজেকশান সাসটেইণ্ড!

বাসুও হেসে বললেন, প্রশ্নটা তাহলে অন্যভাবে পেশ করি। আপনি আগেই বলেছেন—এ মামলায় সাক্ষী দিতে হবে তা আপনি জানতেন না, দেশ দেখতে এসেছেন। সে ক্ষেত্রে আমার সহযোগীর প্রশ্নগুলির উত্তর আপনি কেমন করে দিলেন? স্মৃতির উপর নির্ভর করে?

সাক্ষী একটু ইতস্তত: করে বললেন, না, আমার ডায়েরী দেখে তারিখগুলো ঝালিয়ে নিয়েছিলাম আজ সকালে।

—সে হ্যাট! কিন্তু দেশ দেখতে আসার সময় ডায়েরিতে পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কতকগুলো ঘটনা আপনি কেন টুকে নিয়ে এলেন?

সাক্ষীকে নিরুত্তর দেখে মাইতি লাফিয়ে ওঠেন, অবজেকশান য়োর অনার। দ্য কোশ্চেন ইস ইররেলিভ্যান্ট, ইম্পার্টিন্যান্ট অ্যাণ্ড অ্যাবসার্ড।

ভাদুড়ী বললেন, অবজেকসান ওভাররুলড্। আনসার দ্যাট কোশ্চেন।

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে সাক্ষী বললেন, আই ডোণ্ট নো!

—আই নো! —গর্জন করে উঠলেন বাসু। আপনি এসেছিলেন জগদানন্দকে ব্ল্যাকমেল করতে। মহেন্দ্রবাবু আপনাকে ঐ সব প্রশ্ন করেছিলেন, তা থেকে আপনি বুঝতে পারেন এই খবরগুলি দিয়ে জগদানন্দকে ব্ল্যাকমেল করা যায়। তাই কলকাতা পৌঁছেই আপনি ছুটেছিলেন তাঁর বাড়ি। অ্যাডমিট ইট!

সাক্ষী কাঁপতে কাঁপতে শুধু বললে, নো, নো!

বাসু এবার আক্রমণের পদ্ধতি বদলে অন্যদিক থেকে শুরু করেন, ঘটনার দিন, আই মীন যোগদানন্দকে মৃত অবস্থায় যেদিন সকালে দেখা যায়, সেদিন বেলা দশটার সময় ব্যারিস্টার পি. কে. বাসু যখন আপনার সঙ্গে দেখা করেন তখন আপনি তাঁকে প্রথমেই প্রশ্ন করছিলেন—মহেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করে আনলেন না কেন! ইয়েস অর নো?

—ইয়েস!

—তার মানে যোগানন্দ খুন হবার পরে মহেন্দ্রবাবুকে নিয়ে তাঁর সলিসিটারের পক্ষে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসা আপনার কাছে প্রত্যাশিত ঘটনা।

—না তা নয়, মানে—

—আপনি আপনার সাক্ষ্যে এখনই বলেছেন যে, পূর্বরাত্রে টেলিফোনে

'পথের কাঁটা' কথাটা শুনে তার অর্থ আপনি বুঝতে পারেন নি, নয় ?

—হ্যাঁ তাই।

—এ ক্ষেত্রে পরদিন যখন ব্যারিস্টার বাসু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন আপনি কি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন 'পথের কাঁটা' বলতে পূর্বরাত্রে তিনি কি মীন করেছিলেন ?

—না করি নি।

—করেন নি, কারণ 'পথের কাঁটা' ব্যাপারটা কি, তা আপনি জানতেন, তাই নয় ?

—না না, তা নয়। আমার খেয়াল হয় নি।

—দ্যাটস অল, মিঃ লর্ড—আসন গ্রহণ করেন বাসু।

মাইতি উঠে দাঁড়ান। একটি বাও করে বলেন, আমার সহযোগীর জেরা যখন শেষ হয়েছে তখন আমি আদালতকে একটি প্রার্থনা জানাব। বর্তমান সাক্ষীর যে সাক্ষ্য এইমাত্র আদালতে লিপিবদ্ধ হল তার একটি অনুলিপি আমাকে দেওয়ার হুকুম হ'ক। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিবাদী ব্যারিস্টার রাত বারোটা চল্লিশ মিনিটেই জানতেন যোগানন্দ খুন হয়েছেন; কিন্তু তিনি সে খবরটা পুলিসে দেন নি। এ নিয়ে আমি বার এ্যাসোসিয়েশানে মুভ করতে চাই।

বিচারক একটু চিন্তা করে প্রতিবাদীকে প্রশ্ন করেন, এ সম্বন্ধে আপনার কোনও বক্তব্য আছে ?

—নো মিঃ লর্ড! আদালত বাদীর এ প্রার্থনা মঞ্জুর করলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই।

তবু রুলিং দিলেন না জাস্টিস ভাদুড়ী। একটু ইতস্ততঃ করে বাসু-সাহেবকে পুনরায় বললেন, আই উইশ টু আস্ক য়ু এ পয়েন্টব্ল্যাঙ্ক কোশ্চেন কাউন্সেল! আপনি কি ঘটনার দিন রাত্রি বারোটা চল্লিশে জানতেন যে, একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে ?

—নো, মিঃ লর্ড!

—আপনি কি ঐ সময় কোন ফোন করেছিলেন ?

—নো, মিঃ লর্ড। আমি ঐ সময় অঘোরে ঘুমাচ্ছিলাম!

মাইতি উঠে দাঁড়ান। কিছু একটা কথা বলতে যান। তারপর বসে পড়েন।

জাস্টিস ভাদুড়ী বলেন, মিস্টার পি. পি. আপনি অনুলিপি পাবেন। প্লীজ প্রসীড।

পরবর্তী সাক্ষী যোগানন্দের শ্যালিকাপুত্র শ্যামল। সে তার সাক্ষ্যে জানালো, কী ভাবে রাত বারোটা থেকে সওয়া বারোটার মধ্যে সে একটা ছায়া-মূর্তি দেখেছিল।

মাইতি প্রশ্ন করেন, আপনার একথা কেন মনে হল না যে, কেউ হয়তো বাথরুমে যাচ্ছে ?

না। কারণ দোতলাতে এবং একতলাতে পৃথক বাথরুম আছে। সেপ্রয়োজনে বাথরুমে যেতে কাউকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয় না।

—আই সী। আচ্ছা শ্যামলবাবু, এ কথা কি সত্য যে, আপনার মেসো-মশাই যোগানন্দবাবু আপনার সঙ্গে এক সময় নীলিমা দেবীর বিবাহের প্রস্তাব তুলেছিলেন ?

—হ্যাঁ, সত্য কথা।

—তারপর সে বিবাহ-প্রস্তাব কেন ভেঙে যায় ?

—আমি জানি না।

—আপনার আপত্তি ছিল ?

—না।

—নীলিমা দেবীর আপত্তি ছিল ?

—আমি জানি না।

আমার সওয়াল এখানেই শেষ—সহযোগী জেরা করতে পারেন।

বাসু-সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, শ্যামলবাবু, আপনি এইমাত্র বললেন, আপনাদের বাড়িতে রাত্রে বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজনে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয় না, তাই না ?

—হ্যাঁ, তাই বলেছি।

—আচ্ছা এবার বলুন তো—দ্বিতল-বাসী কোন বাসিন্দা যদি দ্বিতল-বাসী কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে খুন করতে চান তবে কি সেই প্রয়োজনে তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে হয় ?

—অবজেকশান য়োর অনার! আর্গুমেন্টেটিভ!

বাসু বাও করে বলেন, মিঃ লর্ড! সহযোগী ডাইরেক্ট এভিডেন্সে প্রমাণ করেছেন—দ্বিতলে নিদ্রিত কোনও গৃহবাসী বাথরুমে যাবার প্রয়োজনে সিঁড়ির ব্যবহার করেন না, জেরায় আমি প্রমাণ করতে চাই, দ্বিতলে নিদ্রিত কোনও গৃহবাসী দ্বিতলে নিদ্রিত অপর কোন ব্যক্তিকে খুন করতে চাইলে তাঁকে সিঁড়ির ব্যবহার করতে হয় না। এতে আপত্তির কি আছে ? হংস যদি ডুবে ডুবে গুগ্‌লি খেতে পারে, তবে হংসীও তা পারে! What's sauce for

the gander should be sauce for the goose!

বিচারক মৃদু হেসে বলেন, অবজেকশান ওভাররুলড।

শ্যামল বললে, না, দ্বিতলবাসী কেউ যদি রাত্রে দ্বিতলবাসী অপর কারও ঘরে ঢুকে খুন করতে চান তাহলে তাঁকে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে না।

—যেহেতু আসামী এবং যোগানন্দ দুজনেই সে রাত্রে দোতলায় শুয়েছিলেন, ফলে সিঁড়িতে আপনি যাকে দেখেছেন সে খুনী হলে অন্ততঃ আসামী নয়?

—হ্যাঁ তাই।

পরবর্তী সাক্ষী মহেন্দ্র বোস। লোকটা মাইতির সওয়ালের জবাব দিতে গিয়ে অদ্ভুত এক আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসল। স্বীকার করল, সে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে জগদানন্দের ম্যানেজার ছিল, তারপর তার চাকরি যায়। এরপর সে দীর্ঘদিন অন্যত্র ছিল। মাস ছয়েক আগে তার সঙ্গে ঘটনাচক্রে যোগানন্দের সাক্ষাৎ হয়। যোগানন্দ নাকি বলেন, তিনি তাঁর শ্যালিকা-পুত্রের সঙ্গে নীলিমার বিবাহ দেবার চেষ্টা করছেন। তাতে মহেন্দ্র বলে, যোগানন্দবাবু আপনি কি জানেন, ঐ মেয়েটির জন্ম সম্বন্ধে একটা রহস্য আছে? যোগানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি মহেন্দ্রকে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে বলেন। তাঁর নির্দেশে মহেন্দ্র রেঙ্গুনে যায়। নীলিমার জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ যু সিয়াঙ-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করে ফিরে আসে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সওয়াল শেষ করে মাইতি বাসু-সাহেবকে বলেন, আপনি এবার জেরা করতে পারেন।

বাসু-সাহেব বলেন, মহেন্দ্রবাবু, আপনার জবানবন্দী অনুযায়ী ছয় মাস আগেও যোগানন্দ নীলিমার জন্ম-রহস্য বিষয়ে কিছু জানতেন না, কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে আশৈশব, জগদানন্দ যে যোগদানন্দকে আশ্রয় দিয়েছেন, ভরণ-পোষণ করছেন তার কারণ এ নয় যে, যোগানন্দ একটি গোপন তথ্য জানেন, তাই নয়?

—আমি স্যার, প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—পারছেন না বুঝি? আচ্ছা বুঝিয়ে বলি। জগদানন্দ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যোগানন্দকে এতদিন যে ভরণ-পোষণ করেছেন তার কারণটা কী?

—আমি জানি না।

—অন্ততঃ সে কারণটা এই নয় যে, তিনি যোগানন্দকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে,—মানে আমি ছয় মাস আগের কথা বলছি—যোগানন্দ নীলিমার জন্ম-রহস্য বিষয়ে কোনও স্ক্যাণ্ডেল ছড়াতে পারত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা তো বটেই। কারণ যোগানন্দ এতদিন কিছু জানতেন না।

—তার মানে ছয় মাস আগে পর্যন্ত যোগানন্দের আর্থিক অবস্থা ছিল হীন। শুধুমাত্র খাওয়া-পরার চিন্তা ছিল না। তাঁর নিজস্ব কোন রোজগার ছিল না, ব্ল্যাকমেলিং থেকেও আয় ছিল না। হয়তো জগদানন্দ কিছু হাত খরচ দিতেন, তাই নয়?

—তাই হবে বোধহয়, আমি তা কেমন করে জানব?

—বাস্তবে যাই হোক, আপনার ধারণাটা তাই ছিল। ঠিক নয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ধারণায় তাই ছিল বটে।

—এবার বলুন তো মহেন্দ্রবাবু, প্লেনে করে রেঙ্গুনে গিয়ে তথ্যটা সংগ্রহ করে জানতে আপনার কত খরচ হয়েছে। আই মীন—রাফ হিসাব। চার-পাঁচ হাজার টাকা?

—অত নয় স্যার। হাজার তিনেক হবে।

—খরচটা কে করল? শ্যালিকা-পুত্রের বিবাহ-ব্যবস্থার তাগিদে নিঃস্ব যোগানন্দ, না আপনি?

একটা ঢোক গিলে সাক্ষী বললে, আজ্ঞে যোগানন্দবাবু নন, আমিই।

—তাই বুঝি! তা নিঃসম্পর্কীয় যোগানন্দের শ্যালিকাপুত্রের বিবাহ হচ্ছে না দেখে আপনি উতলা হয়ে অত টাকা গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে বসলেন কেন?

সাক্ষী রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললে, যোগানন্দবাবু আমাকে বলছিলেন যে, বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি আমাকে ভালমত ঘটক-বিদায় দেবেন। জগদানন্দের অগাধ সম্পত্তি সবই তো পেত ঐ শ্যালিকাপুত্র।

বাসু একগাল হেসে বলেন, এটা বেফাঁস কথা হয়ে গেল মহেন্দ্রবাবু! গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে যখন আপনি রেঙ্গুন যাচ্ছেন তখন তো আপনি নিশ্চিত জানতেন যে, বিয়েটা হবে না! নীলিমার জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে যোগানন্দের সন্দেহ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আপনার তো কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বস্তুতঃ আপনি তো বিয়েটা যাতে ভেঙ্গে যায়—সেই তথ্যই সংগ্রহ করতে গেলেন। তাই নয়?

—আমি স্যার আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না!

—পারছেন না তার কারণ আপনি ন্যাকা সাজছেন। অত্যন্ত মিথ্যা কথা বলছেন!

—কী মিথ্যা বলেছি?

—যোগানন্দের অনুরোধে আপনি গাঁ্যাটের পয়সা খরচ করে বার্মা যান নি। গিয়েছিলেন ব্ল্যাকমেলিং-এর রসদ সংগ্রহ করতে। ফিরে এসেই জগদানন্দকে শোষণ করতে শুরু করেছিলেন, স্বীকার করুন ?

—না স্যার ! আমি···আমি কেন ব্ল্যাকমেলিং করতে যাব ?

বাসু হেসে বলেন, আমি জেরা করব, আপনি উত্তর দেবেন, এটাই আদালতের রীতি। আপনি কেন ব্ল্যাকমেলিং করতে যাবেন সে কৈফিয়ৎ আমার দেবার নয়। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন, তহবিল তছরূপ করেছিলেন বলে আপনার ম্যানেজারী খতম হয়েছিল একদিন ?

—আজ্ঞে না !

—আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে জগদানন্দ যেদিন আপনাকে বাড়ির বার করে দেন সেদিন আপনি তাঁকে শাসিয়ে যান নি যে, এর প্রতিশোধ আপনি নেবেন ?

—না স্যার, এসব কী বলছেন আপনি ?

—ও ! তবে আপনার চাকরি গেল কেন ?

সাক্ষী একটু ভেবে নিয়ে বলে, সদানন্দ মারা যাবার পর উনি ব্যবসা গুটিয়ে আনেন। তাই ম্যানেজারের আর কোন দরকার ছিল না।

—তাই বুঝি ! নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা ! আচ্ছা, এবার বলুন তো মহেন্দ্রবাবু—তাহলে জগদানন্দ তাঁর শেষ উইলে আপনাকে কেন তাঁর বসত বাড়িটি দিয়ে যেতে চাইলেন ?

মাইতি আপত্তি জানান। এ প্রশ্নের জবাব নাকি সাক্ষীর দেবার কথা নয়।

—অবজেকশান সাসটেইণ্ড !

—ঠিক আছে। আমার জেরা এখানেই শেষ।

বাদী পক্ষের শেষ সাক্ষী জয়দীপ রায়। নাম ধাম পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাইতি তাঁকে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন করলেন—আপনি কি নীলিমা দেবীকে বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে কখনও জগদানন্দের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ?

—হয়েছিলাম।

—আপনি কি নীলিমা দেবীর জন্ম তারিখটা জানেন ?

—হ্যাঁ, জানি। দোশরা সেপ্টেম্বর, 1940।

—কেমন করে জানলেন ?

—আমি ওর জন্ম-পত্রিকা দেখেছি।

—দ্যাটস্ অল মিঃ লর্ড !

বাসু কিন্তু দীর্ঘ জেরা করলেন জয়দীপকে। তাঁর প্রথম প্রশ্ন আপনি কি ঘটনার আগের রবিবার সন্ধ্যায় পার্ক হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরটা নিজ নামে ভাড়া নেন?

—হ্যাঁ, নিই।

—আপনার কলকাতায় থাকার জায়গা আছে। তা সত্ত্বেও কেন হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন?

—ঐ হোটেলে আটত্রিশ নম্বর ঘরে উঠেছিলেন মিস্টার য়ু সিয়াঙ। তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখবার উদ্দেশ্যে।

—ঐ রবিবার রাত্রি নটা থেকে দশটা পর্যন্ত মিস্টার য়ু সিয়াঙ একজন দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কথা বলেছিলেন কিনা তা কি আপনি প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানেন?

—জানি। আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম, মিস্টার মহেন্দ্র বোস এবং তাঁর উকিল ওঁর সঙ্গে ঐ সময় রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করতে থাকেন।

—তারপর কি হয় বলে যান—

জয়দীপ তার জবানবন্দীতে বলে যায় পরবর্তী ঘটনা। রাত দশটায় য়ু সিয়াঙ-এর হোটেল ত্যাগ। পরদিন সোমবার সকাল সাতটায় সেও পার্ক হোটেল থেকে চেক আউট করে চলে যায়। গিয়ে ওঠে দমদমের ভি. আই. পি হোটেলে। রাত বারোটা চল্লিশে সে কিভাবে টেলিফোন-মেসেজটা লিখে নেয় এবং সকাল হলে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এসে বাসু-সাহেবকে কাগজখানা দেয় সব বিশদভাবে জানায়।

বাসু-সাহেবের জেরা শেষ হবার আগেই আদালত বন্ধ হল।

বিচারক ঘোষণা করলেন—পরদিন যথারীতি বেলা দশটায় আদালত বসবে।

আট

কোর্ট থেকে ফিরে ওঁরা এসে বসলেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে। একতলার বৈঠকখানায়। বাসু-সাহেব, কৌশিক, জয়দীপ আর শ্যামল। মহেন্দ্র এবং বিশ্বম্ভর বর্তমানে এ বাড়িতে থাকেন না। তাঁরা হোটেলে উঠেছেন। জগদানন্দ দ্বিতলে নিজের ঘরে উঠে গেলেন। এসব আলোচনায় তিনি আজকাল আর থাকেন না।

কৌশিক বললে, আপনার জেরায় আজ বেশ বোঝা গেছে যে, মহেন্দ্র-

সিয়াঙ কোম্পানিই ব্ল্যাকমেলিং করছিল, যোগানন্দ নয়। ফলে জগদানন্দের পক্ষে খুন করার কোনও মোটিভ বাদী পক্ষ দেখাতে পারবে না।

বাসু বলেন, তা তো হল; কিন্তু তাহলে খুনটা করল কে? কেন?

কৌশিক বলে, তা নিয়ে আপনার কেন মাথা ব্যথা? আসামী খুন করে নি এটুকু প্রমাণ করারই তো দায়িত্ব আপনার!

—আই ডোণ্ট এগ্রি। সত্যকে উদ্ঘাটিত করার দায়িত্ব আমার!

নীলিমা একটি স্বগতোক্তি করে, আশ্চর্য, সেই ডুপ্লিকেট চাবির গোছাটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না!

জয়দীপ বললে, না পাওয়াই স্বাভাবিক। সেটা দিয়েই খুনী ঐ দরজাটা খুলেছে। এতক্ষণে সেটা কলকাতার কোন রাস্তায় স্যুয়ারে চলে গেছে! সেটা যথাস্থানে রেখে যাবার ঝুঁকি খুনীটা নেবে কেন?

শ্যামল বললে, বাসু-সাহেব, আপনি জেরায় আর একটু অগ্রসর হলেন না কেন? দ্বিতলবাসীর বদলে খুনী যদি একতলার বাসিন্দা হয় তাহলে দ্বিতলবাসীকে খুন করতে হলে তাকে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হয়—এ কথাটাও তো আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে পারতেন।

—পারতাম। বাট দ্যাটস্ অবভিয়াস্। জাস্টিস ভাদুড়ী জানেন,—দুইয়ে দুইয়ে চার হয়।

কৌশিক বললে, মহেন্দ্র যে বিশ্বম্ভরবাবুকে দিয়ে খেসারত বাবদ একটা ড্রাফট তৈরী করেছিল সে প্রসঙ্গ তো তুললেন না?

—কী লাভ হত কৌশিক? ওরা সেটা অস্বীকার করে যেত। মহেন্দ্র তো স্বীকারই করছে না যে, তাকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এই অজুহাতে সে এ বাড়িতে এসেছে!

—আপনি বিশ্বম্ভরকে কাঠগোড়ায় তুলবেন না? সে রাত বারোটা চল্লিশে ফোন করেছিল কি না—

বাসু-সাহেব কি যেন চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ দাঁড়ান। বলেন, তোমরা কথা বল, আমি, আমি এখনই আসছি।

উনি উঠে এলেন দ্বিতলে। জগদানন্দের ঘরে ঢুকে দেখেন বৃদ্ধ চুপ করে বসে আছেন ইজি চেয়ারে। বাসু-সাহেবকে দেখে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকান। বাসু বসে পড়েন পাশের চেয়ারটায়। বলেন, বলুন তো—আপনি যে আমার মাধ্যমে এ বসতবাড়িটি আপনার নাতনিকে দানপত্র করে দিয়েছেন, এ খবরটা কে কে জানে?

—আপনি, আমি, কৌশিকবাবু আর যোগানন্দ জানত।

—আর কেউ ?

—হ্যাঁ, নীলিমাও জানে !

—নীলিমা কেমন করে জানল ?

জগদানন্দ বলতে থাকেন। বুধবার দানপত্রটা রেজেস্ট্রি হয়। পরদিন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি নীলিমা আর জয়দীপকে দানপত্রের কথা গোপন করে উইলটা দেখান। তারপর জয়দীপ চলে যায়। জগদানন্দ নীলিমার ঘরে এসে দেখেন, মেয়েটা টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছে। জগদানন্দ মর্মাহত হন। নীলিমা ওকে দেখে বলে, তুমি ছোটকাকুকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছ এতে আমি খুশি। তুমি বসতবাড়িটা আমাকে দিচ্ছ না তাতেও আমার দুঃখ নেই দাদু। কিন্তু তুমি ঐ মহেন্দ্রবাবুকে কেন দিচ্ছ বাড়িটা ? কোন সৎ কাজে এটা দান করে যাও না দাদু ? তোমার নামে অনাথ-আশ্রম হ'ক, হাসপাতাল হ'ক ! তুমি যখন থাকবে না তখন তো আর ঐ মহেন্দ্র তোমাকে আর ব্ল্যাকমেল করতে আসবে না ?

জগদানন্দ আর স্থির থাকতে পারেন নি। রঙের টেক্কাটা নীলিমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বুঝিয়ে বলেছিলেন, মহেন্দ্র কোনদিনই উইলের প্রবেট নিয়ে এ বাড়ি দখল করতে পারবে না—কারণ এ বাড়ির মালিক জগদানন্দ নন, নীলিমা।

বাসু উঠে দাঁড়ান। বলেন, কী আশ্চর্য ! কী অপরিসীম আশ্চর্য ! এতবড় খবরটা এতদিন বলেন নি ?

—খবরটা কী এতই গুরুত্বপূর্ণ ?

—আলবৎ ! এ থেকেই যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যোগানন্দকে কে খুন করেছিল।

জগদানন্দ স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

বাসু-সাহেবের গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি কোথায় যেন চলে গেলেন।

কৌশিক বৈঠকখানা থেকে উঁকি মেরে দেখে বললে, এ কি ? উনি এমন কাউকে কিছু বলে না চলে গেলেন যে ?

জয়দীপ হেসে বললে, এ থেকে প্রমাণ হয় বাসু-সাহেব একজন জিনিয়াস্। জিনিয়াসদেরই অমন মগজের দু' চারটে স্ক্রু আলগা থাকে।

নয়

জগদানন্দের বাড়ি থেকে ফিরে এসে বাসু-সাহেব শুনলেন তাঁর জন্য একজন সাক্ষাৎপ্রার্থী নাকি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে। আদালতে এমনিতেই নানারকম ধকল গেছে, সেখান থেকে গিয়েছিলেন জগদানন্দের বাড়িতে, তারপর ক্লান্ত দেহে এতক্ষণে ফিরে এসেছেন নিজের ডেরায়। সন্ধ্যাবেলাটা তিনি কিছুক্ষণ একা থাকেন, কিছুটা স্ত্রীর সান্নিধ্যে গল্পগুজবে কাটান। এ সময় আগন্তুকের ঝামেলা বরদাস্ত হয় না তাঁর। প্রশ্ন করেন, কে লোকটা? কী চায়?

মিসেস্ বাসু বলেন, নাম বলতে আপত্তি আছে তাঁর। ধুতি পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক। বয়স আন্দাজ ত্রিশ। বলেছেন—ব্যাপারটা গোপন।

বাসু-সাহেব জুতার ফিতে খুলতে খুলতে বলেন, ব্যারিস্টারের কাছে সাঁঝের অন্ধকারে যে দেখা করতে আসে তার ব্যাপারটা গোপনই হয়ে থাকে রানু, সেটা কোন সংবাদ নয়। কিন্তু কী করে এসেছে লোকটা? খুন? না তহবিল তছরুপ?

রানী দেবী হেসে বলেন, তোমার কি ধারণা সে-কথা আমার কাছে স্বীকার করার পরেও ভদ্রলোকের গোপনীয়তা বজায় থাকতো?

—ঠিক আছে। পাঠিয়ে দাও। আমি বাইরের ঘরে বসছি।

একটু পরে ওঁর চেম্বারে যে ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন তিনি মোটেই অপরিচিত ব্যক্তি নয়, যদিও তাঁর সাজে পোষাকে একটু অভিনবত্ব আছে। ধড়া-চূড়া খুলে রেখে নিতান্ত বাঙালী বাবুটি সেজে এসেছেন।

—কী ব্যাপার মনীশবাবু? হঠাৎ এভাবে ছদ্মবেশে শত্রুশিবিরে? বসুন।

মনীশ বর্মন ওঁর ভিজিটার্স চেয়ারে বসে বললে, আপনার একটা অভিযোগও কিন্তু টিকছে না বাসু-সাহেব। প্রথমত এটা আমার ছদ্মবেশ নয়, নিতান্তই আমার নামরূপের উপযোগী বাঙালী পোষাক—দ্বিতীয়ত আমি শত্রুপক্ষের লোকও নই। বরং বলব—পাছে আপনি আমার মধ্যে শত্রুপক্ষের আভাস পান তাই পুলিসের সাজ-পোষাক খুলে রেখে এসেছি। সংক্ষেপে আপনার সামনে যে বসে আছে সে ইন্সপেক্টার মনীশ বর্মন নয়, মনীশবাবু!

—ভূমিকাটা ভালই হয়েছে—এবার বিষয়বস্তুতে আসা যাক? কী ব্যাপার?

মনীশ কিন্তু সরাসরি বক্তব্যে আসতে পারল না। কোথায় যেন তার বাধছে। একটু ইতস্তত করল, নড়ে চড়ে বসল। শেষে গলাটা সাফা করে শুরু করল: ভূমিকাটা আমার শেষ হয়নি বাসু-সাহেব। মুখবন্ধ হিসাবে

আরও কয়েকটা কথা বলে নিই। না হলে আমি ঠিক সহজ হতে পারছি না।

—বলুন ?

—প্রথমে কিছুটা নিজের কথা বলি। আমার চাকরি আট বছরের। কলেজে পড়াশুনায় ভাল ছাত্র ছিলাম। পুলিসের চাকরিতে উন্নতি হয়েছে বেশ তাড়াতাড়ি। কিন্তু চাকরি জীবনে একটা অভিশাপ থাকে—জানেন নিশ্চয়ই—আমি সেই অভিশাপের খোরাক হয়েছি। যে কেসটায় এখন আপনি আর আমি বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েছি—আমি জগদানন্দবাবুর কেসটার কথা বলছি—সে কেসে আমি ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি। সব কথাই স্বীকার করব—আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল, যোগানন্দ-হত্যা মামলায় জগদানন্দকে আসামী করাটা ভুল হচ্ছে। আমি আমার রিপোর্টে প্রথম থেকেই বলে যাচ্ছি যে, যোগানন্দকে জগদানন্দ খুন করেন নি, করতে পারেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। কর্তার ইচ্ছার কর্ম। উপরওয়ালার নির্দেশ অনুসারে আমাকে কেস সাজাতে হল। আমি মনে মনে জানতাম যে, আপনি জগদানন্দকে নিরপরাধী বলে নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারবেন। আজকে আদালতে আপনি মামলাটাকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তাতে আমার ধারণা যে সত্য সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মজা হচ্ছে এই যে, আমার উপরওয়ালা কর্তৃপক্ষ সব বুঝেও তাঁর গোঁ ছাড়ছেন না।

মনীশ বর্মন হঠাৎ নীরব হল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখলেন ও আর কিছু বলছে না তখন বাধ্য হয়ে বাসু সাহেব বলেন, বুঝলাম। এখন আপনি কী চাইছেন ঠিক করে বলুন তো ? আমি কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি ? ইচ্ছে করে কেসে হারব ?

মনীশ ম্লান হেসে বলে, পুলিসের চাকরীতে এই হচ্ছে বিড়ম্বনা মিস্টার বাসু। আমি কেসটা হারলে আমার চাকরিতে একটা দাগ পড়বে। সরকারী ফাইলে শুধু লেখা থাকবে কেসটা আমি ইনভেস্টিগেট করেছিলাম, আমিই পরিচালনা করেছিলাম এবং এমনভাবে কেসটা সাজিয়েছিলাম, যাতে অভিযুক্তের শাস্তি হয় নি।

বাসু-সাহেব একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, কিন্তু আমি তার কি করব ?

—সেই কথাই বলছি স্যার ! আমার মনে হল, জগদানন্দ বেকসুর ছাড়া পেয়ে যান তো যান, কিন্তু প্রকৃত অপরাধীকে যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে এ অবস্থা থেকেও আমি ভরাডুবিকে ঠেকাতে পারব। আপনার কীর্তি-কাহিনী সবই আমার জানা। আপনার প্রতিটি কেস-হিস্ট্রি খুঁটিয়ে পড়েছি

আমি। তাই ভাবলাম, আপনি কিছুতেই জগদানন্দকে মুক্ত করে আপনার কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে করবেন না। যোগানন্দকে কে হত্যা করেছে সে রহস্যটা ভেদ না করা পর্যন্ত আপনার রাতে ঘুম হবে না। ঠিক নয়?

বাসু-সাহেব একটা চুরুট ধরালেন।

—তাই আমি আদালত থেকে বাড়ি ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে সোজা আপনার কাছেই চলে এসেছি।

—হুম্। কিন্তু আপনার উপরওয়ালা কি এ তথ্যটা জানেন?

—না। জানেন না। কোনদিন জানতেও পারবেন না। আমি চাই আপনাকে সাহায্য করতে, বরং বলা উচিত আপনার সাহায্যে রহস্যটা ভেদ করতে। আপনি কি রহস্যটার কিনারা করতে পেরেছেন?

—না। তবে কয়েকটা সম্ভাবনার কথা মনে জাগছে।

—আমার মনে হয় আরও কয়েকটি ক্লু, পেলে হয়তো আপনার পক্ষে রহস্যটা ভেদ করা সহজ হবে। সুতরাং সর্বপ্রথমে আমরা আমাদের সংগৃহীত 'ক্লু'গুলো বিনিময় করি। আপনি কী বলেন?

বাসু-সাহেব বলেন, আমার আপত্তি নেই, তবে আমাদের সন্ধির সর্ত-গুলো তার আগে স্থির হওয়া প্রয়োজন। আপনি ঠিক কী চান, তাই আগে বলুন?

—আমার তরফে একটি মাত্র সর্ত। জগদানন্দকে মুক্ত করেই আপনি থামবেন না, প্রকৃত খুনীকে চিহ্নিত করে দেবেন এবং কী সূত্রে তাকে চিহ্নিত করলেন তা শুধু আমাকেই জানাবেন।

—আমি রাজী! শুধু ও-টুকুই নয়, প্রকৃত অপরাধীকে যাতে আপনিই গ্রেপ্তার করেন সে ব্যবস্থাও আমি করে দেব—যদি আদৌ তাকে ধরতে পারি।

—থ্যাঙ্ক য়ু স্যার!

এর পর দীর্ঘ সময় ওঁরা নিজ-নিজ সংগৃহীত তথ্যের আদান-প্রদান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে কৌশিকও বাসায় ফিরে এসেছিল। তাকেও ডেকে পাঠালেন বাসু-সাহেব। তিনজনে গভীর আলোচনায় ডুবে গেলেন। বাসু-সাহেব বলেন, মনীশবাবু, আপনি প্রথমে বলুন হত্যাকারী হিসাবে কাকে আপনার সন্দেহ হয় এবং কেন?

মনীশ বললে, আমার বিশ্বাস যোগানন্দকে যে হত্যা করেছে তাকে আপনারা চেনেনই না।

কৌশিক ঠাট্টা করে বলে, বা ব্বাবা! গোয়েন্দা কাহিনীতে তো এমন

হওয়ার কথা নয় মনীশবাবু,—আসল অপরাধীকে ধরতে না পারলেও তার পরিচয় আমাদের পাওয়া উচিত ছিল।

মনীশ বললে, প্রথম কথা এটা গোয়েন্দা গল্প নয়, বাস্তব ঘটনা। দ্বিতীয় কথা—আমি বলতে চাই যোগানন্দকে যে হত্যা করেছে তাকে না চিনলেও যার নির্দেশে সে হত্যা করেছে তাকে আপনারা চেনেন।

বাসু বলেন, আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।

—আমার ধারণা—এটা পাকা হাতের কাজ। অ্যামেচার নয়, প্রফেশনাল খুনীর কাজ। এ কথা মনে করছি যে 'ক্লু'-টার সাহায্যে সেটা আগে জানাই। সে খবর আপনাদের অজানা। আমি জানি, য়ু সিয়াঙকে আপনারা সন্দেহজনক ব্যক্তি মনে করে নজরবন্দী করেছেন। কিন্তু যার মাধ্যমে করেছেন সেই জয়দীপ ছোকরা হচ্ছে অ্যামেচার। তাই 'ক্লু'-টার সন্ধান সে পায় নি। য়ু সিয়াঙ সম্বন্ধে আমিও খবরাখবর নিয়েছি। আমার সংবাদসূত্র বলছে—য়ু সিয়াঙ ক'লকাতায় এসে সর্বপ্রথমেই জগদানন্দের দ্বারস্থ হয়নি, সে ক'লকাতার 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' জগতের সঙ্গেই প্রথম যোগাযোগ করে টেলিফোনে। দ্বিতীয়ত জয়দীপের ধারণা য়ু সিয়াঙ রবিবার সারাদিন একটা টুরিস্ট বাসে শহর দেখে বেরিয়েছে। খবরটা ভুল। লোকটা অত্যন্ত শেয়ানা। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছিল তাকে কেউ হোটেলে নজরবন্দী করে রেখেছে। তাই রবিবার সকালে সে টুরিস্ট বাসে রওনা হলেও এসপ্ল্যানেডে নেমে যায়। গুণ্ডাদের গোপন আড্ডায় যায় এবং বিকাল তিনটে নাগাদ টুরিস্ট বাসের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আবার অন্যত্র বাসে চেপে বসে। জয়দীপের ধারণা রবিবার সমস্ত দুপুর সে ঐ টুরিস্ট বাসেই ছিল। তা সে ছিল না। তৃতীয়ত, রবিবার রাত সাড়ে নয়টায় সেই 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' জগতের একজন কুখ্যাত গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক পার্ক হোটেলে আসে। যে সময় ঐ হোটেলে মহেন্দ্র এবং তার উকিল য়ু সিয়াঙের সঙ্গে দেখা করে প্রায় সেই সময়ই। সে যে ঠিক কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তা জানি না—তবে আমার অনুমান লোকটা মহেন্দ্র-বিশ্বম্ভর পার্টির সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, এসেছিল য়ু সিয়াঙের কাছেই।

—লোকটার নাম কি ?—জানতে চান বাসু-সাহেব।

মনীশ বর্মন বলে, পিতৃদত্ত নামটা ঠিক কী তা জানি না, পুলিসের খাতায় তার নাম খোকা গুণ্ডা। বার দুই তাকে খুনের মামলায় জড়ানো হয়েছিল, দু বারই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে। তবে ডাকাতির কেসে বছর পাঁচেক একবার মেয়াদও খেটেছে। লোকটা রীতিমতো দাগী। ভবানীপুর থানায় তাকে প্রত্যহ সন্ধ্যায় হাজিরা দিতে হয়।

কৌশিক বলে, ধরা যাক আপনার অনুমান সত্য। এ খুনটা কোন অ্যামেচারের হাতে হয়নি, খোকা গুণ্ডাই আসল অপরাধী। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে মধ্যরাত্রিতে সে কি করে রুদ্ধদ্বার ঘরের ভিতর ঢুকল?

—রুদ্ধদ্বার বলতে দুটো দরজা। সদর দরজা আর যোগানন্দের শয়নকক্ষের দরজা। দুটো দরজার কোনটাই ভিতর থেকে ছিটকিনি বা খিল দিয়ে বন্ধ ছিল না—গা-তালা লাগানো ছিল। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, সবকটা দরজার ডুপ্লিকেট চাবির থোকাটাই ঘটনার পূর্বে চুরি গিয়েছিল।

কৌশিক বললে, তা গিয়েছিল; কিন্তু সে-ক্ষেত্রে যু সিয়াঙকে সন্দেহ করাটা কি স্বাভাবিক? বহিরাগত যু সিয়াঙ কেমন করে নীলিমা দেবীর দেরাজ থেকে ডুপ্লিকেট চাবির গোছাটা চুরি করবে? মহেন্দ্রবাবু সেটা করতে পারে হয়তো—যে-হেতু সে ঐ বাড়িতে ছিল; কিন্তু আপনিই তো বলছেন খোকা গুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল যু সিয়াঙ, মহেন্দ্র নয়। আর তার চেয়েও বড় কথা—মোটিভ। মহেন্দ্র অথবা যু সিয়াঙ কী কারণে যোগানন্দকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগাবে তাই বলুন?

মনীশ বলে, এ বিষয়ে আমার থিয়োরি এই যে, যোগানন্দকে হত্যা করার ইচ্ছা যু সিয়াঙ-এর আদৌ ছিল না। সে ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়েছিল মহেন্দ্রকে খুন করতে। ভেবে দেখুন—ঐ খাটে মহেন্দ্ররই রাত্রে শোওয়ার কথা। যু সিয়াঙ কেমন করে জানবে ওরা ঘর বদলাবে?

কৌশিক অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কিন্তু কে কোন ঘরে রাত্রে শোয় সেটা যু সিয়াঙ জানবে কেমন করে? সে তো মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য একবার ঐ বাড়িতে গিয়েছিল। জগদানন্দের সঙ্গে কথা বলে চলে আসে। তার পক্ষে কি জানা সম্ভব মহেন্দ্র কোন ঘরে রাত্রে শোয়?

মনীশ সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাসু-সাহেবকে বলে, আপনি কি বলেন?

বাসু-সাহেব এতক্ষণ নীরবে ধূমপান করে যাচ্ছিলেন। নড়ে চড়ে বসে বলেন, আমি বলি কি ঘরে বসে এসব তত্ত্ব-আলোচনা না করে, চল আমরা একটু সরেজমিনে তদন্ত করে আসি।

—সরেজমিনে তদন্ত! সে আবার কোথায়?

বাসু বলেন, প্রথম কথা, মনীশবাবু, তুমি এখান থেকে ভবানীপুর থানায় একটা ফোন করে জেনে নাও সেই খোকাবাবু আজ তাঁর হাজিরা দিয়ে গেছেন কিনা। যদি না দিয়ে গিয়ে থাকেন তবে তিনি এলে যেন তাঁকে আটকে রাখা হয়। আমরা রাত নটা নাগাদ ভবানীপুর থানায় যাব। দেখ, তাকে

পাওয়া যায় কিনা।

মনীশ মনে মনে খুশী হল। সে লক্ষ্য করেছে ইতিমধ্যে বাসু-সাহেব 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমেছেন। অর্থাৎ মনীশ বর্মন তাঁর স্নেহের পাত্রে উন্নীত হয়েছে। সোৎসাহে সে বাসু-সাহেবের টেলিফোনটা টেনে নিয়ে ভবানীপুর থানার সঙ্গে যোগাযোগ করল। ভাগ্য ভাল— খোকা গুণ্ডা এখনও তার হাজিরা দিতে আসেনি। মনীশ থানায় জানিয়ে রাখল, সে এলে তাকে যেন আটকে রাখা হয়। বাসু বলেন, প্রয়োজনবোধে খোকাবাবুকে যেন আমার অ্যাকাউণ্টে চা-পান-সিগ্রেট জোগান দেওয়া হয় এটাও বলে রাখ।

মনীশ হাসতে হাসতে বলে, তার প্রয়োজন হবে না। আপনি বিখ্যাত ক্রিমিনাল সাইডের ব্যারিস্টার। অপরাধ জগতের সবাই আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা সৌভাগ্য বলে মনে করে। কিন্তু রাত নটা বাজতে তো এখনও অনেক দেরী। এতক্ষণ কী করব আমরা?

বাসু গাত্রোত্থান করেন, ঐ যে বললাম--একটু সরেজমিনে তদন্ত করব। চল পার্ক হোটেলটা ঘুরে আসি। আটত্রিশ নম্বর কামরাটা একবার স্বচক্ষে দেখে রাখা ভালো।

মনীশও উঠে দাঁড়ায়। বলে, যেতে চান চলুন, কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—য়ু সিয়াঙ ঐ ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিল রবিবার রাত দশটায়। সেখানে অ্যাস্‌ট্রেতে কোনও চুরুটের ছাই অথবা ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে কিছুই পাবেন না! ইতিমধ্যে হয় তো একাধিক বোর্ডার ঐ ঘরে বাস করে গেছে!

বাসু-সাহেব আবার চটি-জোড়া খুলে জুতো পায়ে দিতে দিতে বলেন, তা কি আগে ভাগে কেউ বলতে পারে? কবি বলেছেন, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন!' কী কৌশিক, যাবে না কি?

কৌশিক দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয় নয়! এতদিন পরে সেই ঘরটা সার্চ করতে যাবার মত বাসনা আমার আদৌ নেই!

বাসু বললেন, ঠিক আছে। পরে কিন্তু তুমিই পস্তাবে। চল হে মনীশবাবু।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত হওয়া সত্ত্বেও পার্ক-হোটেলের ম্যানেজার মনীশ বর্মনকে চিনতে পারল। ইতিপূর্বেই সে একবার ধড়া-চূড়া পরে তদন্ত করে

গেছে। বললে, বলুন স্যার, কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?

মনীশ বাসু-সাহেবের পরিচয় দিয়ে বললে, ইনি একবার ঐ আটত্রিশ নম্বর ঘরটা দেখতে চান।

—তাহলে প্রথমেই জানতে হয় ঘরটা অকুপায়েড কিনা।

ম্যানেজার রিসেপশান কাউন্টারে ফোন করে জেনে নিয়ে বললে, ভাগ্য ভাল। ঘরটা এখন ফাঁকা। একটু আগেই খালি হয়েছে। আমিও আপনাদের সঙ্গে আসব?

বাসু বলেন, কোনও প্রয়োজন নেই। একজন রুম অ্যাটেনডেণ্টকে শুধু আমাদের সঙ্গে দিন।

হোটেল বয়ের সঙ্গে ওঁরা লিফ্‌ট-এ করে তিনতলায় উঠে এলেন। ত্রিতলের একক-শয্যা বিশিষ্ট আটত্রিশ নম্বর ঘরটা করিডোরের শেষ প্রান্তে। হোটেল-বয় ঘরের তালা খুলে দিল। বাসু-সাহেব ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কী দেখলেন তা তিনিই জানেন। অতি সংক্ষেপে পরিদর্শন শেষ করে এসে বললেন, চল এবার নিচে রিসেপ্‌শান কাউণ্টারে যাই।

নিচের রিসেপ্‌শান কাউণ্টারে আবার দেখা হয়ে গেল ম্যানেজার ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি বলেন, কি হল ব্যারিস্টার-সাহেব, পেলেন কিছু?

বাসু-সাহেব, তা কিছু কিছু পেলাম বইকি। এবার আমি দেখতে চাই আপনাদের হোটেল রেজিস্টারখানা। যদি কোন আপত্তি না থাকে।

ম্যানেজার বলেন, আপত্তি? বলেন কি? মিস্টার বর্মন যখন চাইছেন তখন সব রকম সাহায্যই করব আমরা। আসুন।

ম্যানেজার পরিচয় করিয়ে দিলেন, এ হচ্ছে মিস্ এডনা পার্কার। আমি যদি না থাকি তাহলে এর কাছে যা জানতে চান জেনে নিতে পারেন।

মিস্ এডনা পার্কার রিসেপ্‌শান-কাউণ্টারে ডিউটি দিচ্ছিল। বছর বাইশ-তেইশ বয়স। দেখতে যতটা সুন্দর তার চেয়ে বেশী দেখাচ্ছে উগ্র সাজের চটকে। নীল চোখ, সোনালী চুল। সবিনয়ে বললে, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়্যু সার্?

বাসু-সাহেব ওর কাছ থেকে হোটেলের রেজিস্টারখানা চেয়ে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। এ কয়দিনে কয়েকপাতা এগিয়ে এসেছে খাতাটা। পাতা উল্টে খুঁজে বের করলেন উনি। হ্যাঁ, এই তো য়ু সিয়াঙের হস্তাক্ষর। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা দশ-এ সে হোটেলে চেক্-ইন করে। আটত্রিশ নম্বর ঘর। স্থায়ী ঠিকানার ঘরে বর্মার একটি বাড়ির নম্বর। 'প্রফেশন'-এর ঘরে লিখেছে বিজনেসম্যান, ব্যবসায়ী। বর্মার নাগরিক। পাস্‌পোর্ট নম্বরের উল্লেখও

করতে হয়েছে। রবিবার রাত দশটা পনের মিনিটে সে হোটেলের গাড়ি নিয়েই হোটেল ত্যাগ করে যায়। বাসু-সাহেব ডায়েরিতে সব কিছু টুকে নিলেন। লক্ষ্য করে দেখলেন, পরের পৃষ্ঠাতেই আছে জয়দীপের স্বাক্ষর—সে রবিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ হোটেলের খাতায় সই করেছিল। অর্থাৎ কৌশিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে সোজা চলে এসেছিল এই হোটেলে। জয়দীপের এন্ট্রিটাও খুঁটিয়ে দেখলেন বাসু-সাহেব। কত নম্বর ঘরে সে উঠেছিল, কবে, কটার সময় সে হোটেল ছেড়ে দেয়।

খাতাটা বাসু-সাহেব বাড়িয়ে ধরেন ম্যানেজারের দিকে। বলেন, এই রেজিস্টারখানা মামলায় প্রয়োজন হতে পারে। আপনি বরং এটা আপনার নিজস্ব সিন্দুকে তুলে একটা নতুন খাতা এখন, এই মুহূর্ত থেকেই চালু করুন। এতে য়ু সিয়াঙের সই আছে, নিজ স্বীকৃতি-মত তার স্থায়ী ঠিকানা, পাসপোর্ট নাম্বার ইত্যাদিও আছে।

ম্যানেজার বললেন, খাতাটা এখনই কাউণ্টার থেকে সরিয়ে ফেলা সম্ভবপর নয়, যে সব বোর্ডার এসেছেন, এখনও হোটেলে আছেন তাঁদের নামগুলি নূতন খাতায় কপি করে নিতে হবে প্রথমে।

বাসু বলেন, বেশ, এখনই কপি করতে দিন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে খাতার কোন ফিগার যাতে কেউ ট্যাম্পার না করে সে জন্য আমি আপনাকে কয়েকটি এন্ট্রিতে গোল চিহ্ন দিয়ে সই দিতে অনুরোধ করব।

ম্যানেজার বলেন, এতে কোন অসুবিধা নেই। আপনি যে যে ফিগারগুলো গোলচিহ্ন দিয়ে দেবেন, আমি তার পাশে পাশে সই দিয়ে দিচ্ছি।

বাসু-সাহেব খাতাখানি টেনে নিলেন। তিন-চারটি এন্ট্রিতে গোল চিহ্ন দিয়ে ফেরত দিলেন। ম্যানেজার তার পাশে পাশে সই দিয়ে দিলেন।

মনীশ কৌতূহল সম্বরণ করতে পারে না। বলে, মাপ করবেন মিস্টার বাসু, আমি কিন্তু মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। এ খাতায় গোঁজামিল দিতে চাইবে কে ? কেন ? য়ু সিয়াঙ তো এখানে মিথ্যা কিছু লেখেনি। তার চেক্-ইন টাইম, চেক-আউট টাইম, রুম নম্বর, স্থায়ী ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর সবই তো জেনুইন ?

বাসু সংক্ষেপে বলেন, সাবধানের মার নেই। বাই দ্য ওয়ে, মনীশবাবু, য়ু সিয়াঙ কলকাতায় এসে খোকা গুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ করছিল এটা তুমি কোন সূত্রে জানলে ? এ ব্যাপারটাও বুঝে নেওয়া দরকার—কারণ য়ু সিয়াঙ নিজেই বলেছে যে, সে এই প্রথম ক'লকাতায় আসছে। সে-ক্ষেত্রে তার পক্ষে অমন একটি কুখ্যাত গুণ্ডার সন্ধান পাওয়া বিস্ময়কর নয় ?

মনীশ বললে, আপনার শেষ প্রশ্নটার জবাব জানি না, কিন্তু প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিতে পারি। পার্ক হোটেল কর্তৃপক্ষ খুব সাবধানী। হোটেল থেকে কোনও বোর্ডার বাইরে কোন ফোন করলে তা অপারেটারের মাধ্যমে যায়। কোন ঘরেই অটোমেটিক ফোন নেই। এঁদের অপারেটারের কাছে নাম্বার চাইতে হয়। অপারেটার যোগাযোগ করে দেয়। বোর্ডারকে টেলিফোনের জন্য আলাদা চার্জ দিতে হয়। তাই অপারেটার খাতায় লিখে রাখে কোন বোর্ডার কটার সময় কত নম্বরে ফোন করছে। সেই সূত্র থেকেই—

মনীশ সাদা বাঙলায় কথা বলছিল এতক্ষণ। এবারে ঘুরে মিস্ এডনা পার্কারকে ইংরাজিতে বললে, আপনাদের সেই টেলিফোনের খাতাটা দেখি?

খাতাটা থাকে পাশের টেলিফোন অপারেটারের কাছে। মিস্ পার্কার খাতাখানা নিয়ে এল। মনীশ তার পাতা উল্টে দেখালো শনিবার রাত্রে আটত্রিশ নম্বর ঘর থেকে য়ু সিয়াঙ একটি টেলিফোন করেছিল সে নম্বরটি চিহ্নিত। অর্থাৎ যে নম্বরে খোকা গুণ্ডার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। বাসু-সাহেব বললেন, এটাও একটা জবর এভিডেন্স। এ খাতাখানাও সেফ্ কাস্টডিতে সরিয়ে রাখা ভাল।

খাতাখানা উনি খুঁটিয়ে দেখলেন। আর যে-সব নম্বরে ফোন করা হয়েছে সেই নম্বরগুলিও উনি ডায়েরিতে টুকে নিলেন। কয়েকটি স্থানে কালি দিয়ে গোলচিহ্ন দিলেন। ম্যানেজার-সাহেবকে আবার সই দিতে হল।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ ওঁরা বেরিয়ে গেলেন ভবানীপুর থানার দিকে।

ভবানীপুর থানায় তীর্থের কাকের মত বসে আছে খোকাবাবু।

ছিপছিপে গড়ন। হৃষ্টপুষ্ট মোটেই নয়। কে বলবে লোকটা গুণ্ডা! সাজ পোষাকে রীতিমত ভদ্রসন্তান। সূচ্যগ্র একটি নূর আছে, মাথায় বড় বড় চুল পিছনে ফেরানো। মুখে বসন্তের দাগ। নেহাৎ গোবেচারি ধরণ।

বাসু-সাহেবকে নিয়ে মনীশ ঘরে ঢুকতেই লোকটা তড়াক করে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বিনীত নমস্কার করে বললে, আবার কি কসুর হল স্যার আমার? এরা আমাকে ঘরে যেতে দিচ্ছে না!

বাসু-সাহেব আসন গ্রহণ করে বললেন, অপরাধ এবার তুমি করনি খোকাবাবু, কিন্তু অপরাধ কেউ না কেউ এখনও তো করছে। তাদেরই একজনকে ধরবার জন্য তোমার সাহায্য চাইছি। যা জিজ্ঞেস করব সত্য জবাব

দেবে। মিথ্যা বললে তুমিই ফাঁসবে কিন্তু!

—বলুন স্যার? মিছে কথা আমি কখনও বলি না—মা-ওলাইচণ্ডীর কসম্!—খোকা গুণ্ডা এখনও গরুড় পক্ষী।

—'য়ু সিয়াঙ' নামে একজন বর্মী ভদ্রলোককে চেন?

—না স্যার! অমন নাম বাপের জন্মে শুনিনি!

—এত তারিখ, শনিবার রাত্রি নটার সময় তুমি পার্ক হোটেলে গিয়েছিলে?

খোকা দু-চোখ বুজে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললে, আজ্ঞে না। সেই শনিবার আমি রাণাঘাটে গেসলাম স্যার। থানার বড়বাবুর কাছে ছুটি নিয়ে গেসলাম। শনিবার হাজিরা দিইনি। পেত্যয় না হয়, বড়বাবুকে শুধোন।

বাসু-সাহেব ধমক দিয়ে ওঠেন, তা থেকে কী প্রমাণ হয়? তুমি শনিবারে থানায় হাজিরা দাওনি মানে কি তুমি কলকাতায় ছিলে না?

—ছুটিতে ছিলাম স্যার! রাণাঘাটে! মা-ওলাইচণ্ডীর দিব্যি!

—শনিবার রাত্রে কেউ তোমাকে রাণাঘাটে দেখেছে প্রমাণ করতে পারবে?

—পারব স্যার! আমার শালার ছাপরায় ছিলাম। সে শালা সাক্ষী দেবে।

—শালার নাম কি ধর্মপুত্তুর?

—আজ্ঞে না, স্যার। যুধিষ্ঠির!

বাসু-সাহেব হেসে ফেলেন। তারপর বলেন, ঠিক আছে। যাঁহা ধর্মপুত্র তাঁহা যুধিষ্ঠির। তার সাক্ষ্যকে কে অস্বীকার করবে? এবার বলত খোকাবাবু, তার পরের সোমবার রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

—রাত কটায় স্যার?

—এই ধর রাত বারোটা নাগাদ?

—নিয্যস্ সত্যি কথা বলব স্যার? অপরাধ নেবেন না তো?

—না, বল না। মা ওলাইচণ্ডীর নামে নাহয় একটা সত্যি কথাই বললে!

—কথাটা পাঁচকান হলে আমার ঝঞ্ঝাট হবে কিন্তু!

—খুব গোপন ব্যাপার নাকি? তা হোক, বলেই ফেল।

—সৌরভীর ঘরে ছিলাম, স্যার।

—সৌরভী! কোথায় তার ঘর?

—হাড়কাটা গলি! দেখবেন স্যার, কথাটা আমার বউয়ের কানে না ওঠে! মাগী ভীষণ খাণ্ডার! কিছুতেই শালী বিশ্বাস করে না—আমি ও পাড়ায় যাই-ই না!

পরদিন কোর্টে যাবার পথে বাসু-সাহেবের গাড়ি এসে থামল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটার সামনে। বেলা পৌনে নটা। আদালতে যাবার জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছে। বাসু গট গট করে উঠে গেলেন দ্বিতলে। জগদানন্দের ঘরে ঢুকে দেখলেন বৃদ্ধ ঠিক কালকের মতই স্থির হয়ে বসে আছেন ইজি চেয়ারে। যেন সারা রাত তিনি ওখানে ওভাবেই বসে আছেন। বাসু জানেন, সেটা সত্য নয়—তবু এটাও জানেন ঐভাবে বসে থাকাটাই এখন তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গি। কাছে এগিয়ে এসে বললেন, সেন-মশাই, দোষটা আমার নয়, আপনার! আপনি ভাইটাল ক্লু-টা আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন বলেই এতদিন কষ্ট পেলেন!

ভ্রূ কুঞ্চন করে জগদানন্দ বলেন, ভাইটাল ক্লু বলতে? ঐ দানপত্র করার খবরটা নীলুকে জানানো?

—এক্‌জ্যাক্টলি! আপনার ক্লু পেয়ে আমি বাকি তদন্তটা করেছি। সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনাকে গ্যারিন্টি দিচ্ছি আজ আপনাকে বেকসুর খালাশ করিয়ে আনব। শুধু তাই নয়, যে আপনার ভাইপোকে হত্যা করেছে আজ তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি! আদালতে পুলিস প্রস্তুত থাকবে।

জগদানন্দের ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। কিছু বলতে পারলেন না তিনি।

—আপনি তৈরী হয়ে নিন! ভয় কি? আজই তো এ যন্ত্রণার শেষ!

ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি টোকা দিলেন নীলিমার ঘরের দরজায়। সে সাজ-পোষাক পালটাচ্ছিল। দরজা খুলে দিয়ে বললে, এ সময়ে আপনি? হঠাৎ?

বাসু বিনা-সঙ্কোচে ঘরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের টুলটা টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, নীলিমা, ব'স ঐ খাটে। তোমাকে একটা কথা বলার আছে।

মেয়েটি বসল। তার শুধু এক চোখে কাজল। সে সঙ্কোচ করল না তাই বলে।

—তোমাকে দুটো কথা বলব। একটা আনন্দের সংবাদ, একটা দুঃখের। কোন্‌টা আগে শুনতে চাও?

—আনন্দের সংবাদটা।

—আজ আদালতে তোমার দাদু বেকসুর খালাস হ'য়ে যাবেন। প্রকৃত অপরাধী কে তা জানা গেছে।

নীলিমা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—বলেন কি! কে সে?

মাথা নাড়লেন বাসু, নট নাউ! এবার দুঃসংবাদটা জানাই? আজ

তোমার একটা বিরাট লোকসানের দিন।

নীলিমা বললে, বুঝেছি! কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই। এ বাড়ির অধিকার যদি না পাই, দাদুর সম্পত্তির কণামাত্র না পাই, তাহলেও আমি দুঃখ করব না। দাদু যে মাথা সোজা করে আজ বাড়ি ফিরে আসবেন এ আনন্দই আমাকে সব দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করবে!

বাসু ওর খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বললেন, ভগবান তোমাকে সেই মনোবলই দিন!

এগারো

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় আদালত বসল।

অসমাপ্ত সাক্ষ্য দিতে উঠে দাঁড়াল জয়দীপ। কোর্ট-পেশ্‌কার মনে করিয়ে দিল—গতকাল হলপ নেওয়া আছে বলে আজ তাকে হলপ নিতে হচ্ছে না, কিন্তু সে আজ যা বলবে তা হলপ্‌ নিয়ে বলা জবানবন্দীই। সাক্ষী বলল, সে জানে!

বাসু প্রশ্ন করেন, কাল আপনি আপনার জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে, সোমবার সকালে আপনি পার্ক হোটেল থেকে চেক আউট করে বেরিয়ে যান। ঠিক কটায় চেক-আউট করেন?

জয়দীপ বললে, ঠিক সময়টা আমার মনে নেই। সোমবার সকালের দিকে। সাতটা থেকে নটা।

—থ্যাঙ্কু! আচ্ছা জয়দীপবাবু এবার বলুন, আপনি কি বিবাহিত?

জয়দীপের মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। মাথা নিচু করে বলে, হ্যাঁ।

—আপনার স্ত্রীর নাম কী?

মাইতি আপত্তি করেননি। সাক্ষী নিজেই বলে ওঠে, সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক!

—সেটা আদালত বুঝবেন, আপনার স্ত্রীর নাম কী?

জয়দীপ বিচারককে সরাসরি প্রশ্ন করে, আমি কি ও প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য?

—অফ কোর্স! য়ু আর!

জয়দীপ মাথা নিচু করে বললে, নীলিমা সেন!

আদালতে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। সকলের দৃষ্টি গেল আসামীর দিকে।

—'নীলিমা সেন' অর্থে আসামীর নাতনি?

—হ্যাঁ, তাই।

—কবে ও কিভাবে আপনাদের বিবাহ হয়েছে ?

দাঁতে দাঁত চেপে জয়দীপ বললে, ঘটনার আগের শনিবার।

—ঘটনার আগে এবং ঐ শনিবারেরও আগে আপনার হবু স্ত্রী কি আপনাকে জানিয়েছিলেন যে, ইতিপূর্বেই জগদানন্দ একটি দানপত্র যোগে আপনার হবু স্ত্রীকে বসতবাড়িটি দিয়ে দিয়েছেন ? ও বাড়ির মালিক আপনার হবু স্ত্রী। হ্যাঁ, না না ?

সাক্ষী একটু ভেবে নিয়ে বলল, হ্যাঁ।

—অর্থাৎ ঘটনার দিন আপনি জানতেন যে, উইল মোতাবেক মহেন্দ্রবাবু কোনদিনই ঐ বাড়ির দখল পাবে না। ইয়েস ?

—ইয়েস !

—আপনি একথাও জানতেন যে, উইল মোতাবেক মহেন্দ্রবাবু ছাড়া অন্যান্য বেনিফিশিয়ারি তাদের ভাগ পাবে, অর্থাৎ যোগানন্দ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন ?

—না জানার কি আছে ?

—আপনি আরও জানতেন যে, উইলটা যদি খোয়া যায় তাহলে আপনার স্ত্রী স্বাভাবিক ওয়ারিশ হিসাবে ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন ?

মাইতি আপত্তি জানান—এ সব প্রশ্ন নাকি অপ্রাসঙ্গিক। বিচারক সেটা মেনে নিতে রাজী হলেন না। ফলে সাক্ষীকে স্বীকার করতে হল, সে সেটা জানত !

—এবার বলুন জয়দীপবাবু, সোমবার আপনি যখন বিকাল পাঁচটায় ঐ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখনও আপনি জানতেন না যে, কৌশিকবাবু সে রাত্রে ওখানে থাকবেন—যেহেতু জগদানন্দবাবু আপনার প্রস্থানের পরে কৌশিকবাবুকে ঐ প্রস্তাব দেন ? ইয়েস ?

—হ্যাঁ, তাই।

—তার মানে দাঁড়াচ্ছে—সোমবার বিকালে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় আপনার জানা ছিল না যে, কৌশিকের রাত্রিবাসের প্রয়োজনে মহেন্দ্রবাবু এবং যোগানন্দ ঘর বদলাবে ?

সাক্ষী চটে উঠে বলে, আপনি কী বলতে চান ? আমি খুন করেছি ?

বাসু শান্তভাবে বলেন, আমি বলতে চাই না মিস্টার রায়, আমি শুনতে চাই। আমার প্রশ্নের জবাব শুনতে চাই। বলুন, বলুন ?

—না, আমি জানতাম না, সে রাত্রে কে কোথায় শুচ্ছেন !

—উহুঁ হুঁ ! ওটা তো আমার প্রশ্নের জবাব নয় ! আপনি 'জানতেন

না' নয়, আপনি 'জানতেন' যে, যে-খাটে যোগানন্দ নিহত হয়েছেন ঐ খাটে মহেন্দ্রবাবুর শয়ন করার কথা! সোজা হিসাবটা স্বীকার করছেন না কেন!

—বেশ তাই না হয় হল। তাই জানতাম আমি।

—এবং জানতেন যে, মহেন্দ্রবাবুর বালিশের নিচে রাখা আছে ঐ উইলটা, যেটা খোয়া গেলে আপনার হবু-স্ত্রী, আই বেগ য়োর পার্ডন,...তৎক্ষণে তিনি আপনার স্ত্রী—ওটা সোমবারের ঘটনা, হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন। স্বামী হিসাবে যাতে আপনারও অধিকার বর্তাবে।

মাইতি উঠে দাঁড়াল, অবজেকশান য়োর অনার। এ সব কী অবাস্তর প্রশ্ন! বিচার হচ্ছে কার? আসামীর না সাক্ষীর?

বিচারক দৃঢ়স্বরে বলেন, অবজেকশান ওভাররুলড্। আনসার দ্যাট!

—না আমি জানতাম না—উইলটা কোথায় রাখা আছে। আমার তা জানার কথা নয়।

—জয়দীপবাবু এবার স্বীকার করুন, সেদিন রাত প্রায় বারোটার সময় আপনি ঐ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে—

চীৎকার করে ওঠে সাক্ষী, ডুপ্লিকেট চাবি আমি পাব কোথায়?

—পাবেন আপনার স্ত্রীর শয়নকক্ষের ড্রয়ারে। যে-ঘরে একমাত্র আপনারই প্রবেশ-অধিকার ছিল—বাট প্লীজ ডোণ্ট ইণ্টারাপ্ট—স্বীকার করুন, রাত বারোটায় ঐ বাড়িতে ফিরে আসেন। ইয়েস অর নো?

—নো! অ্যান এম্ফাটিক নো। রাত বারোটায় আমি ওখান থেকে অনেক অনেক দূরে। পনের মাইল! দমদমের ভি. আই. পি. হোটেলের বাইশ নম্বর ঘরে। রাত বারোটা চল্লিশ মিনিটে যেখানে মিস্টার য়ু-সিয়াঙ টেলিফোন ধরেছিলেন তার ঠিক পাশের ঘরে!

—দ্যাটস্ য়োর অ্যালেবাই! আপনার বজ্রবাঁধুনি রক্ষাকবচ! ঘটনার মুহূর্তে আপনি ছিলেন দমদমে। তাই নয়?

সাক্ষী জবাব দেয় না। জলন্ত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে প্রশ্নকর্তার দিকে।

বাসু-সাহেব বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, মিঃ লর্ড! ঘটনার পারম্পর্য রাখতে বর্তমান সাক্ষীকে সাময়িকভাবে অপসারণ করে আমি অপর একটি সাক্ষীর সাক্ষ্য নিতে চাই।

মাইতির তাতে আপত্তি নেই। বিচারক বললেন, নো অবজেকশান।

নবীন সাক্ষীর নাম ঘোষণা করল নকীব। সাক্ষ্য দিতে এলেন, এডনা পার্কার। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান! পার্ক হোটেলের রিসেপশান কাউণ্টারে কাজ

করেন। বাসু-সাহেব তাঁর নাম ধাম পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি গত মাসের পার্ক হোটেলের রেজিস্টারটা সঙ্গে করে এনেছেন?

—এনেছি।

—ওটা দেখে আপনি আদালতকে জানাবেন কি যে, গত অমুক তারিখ, রবিবার ঠিক ক'টার সময় জয়দীপ রায় স্বনামে আপনাদের হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরটা বুক করেন?

সাক্ষী রেজিস্টার দেখে বললেন, সন্ধ্যা সাতটায়।

—কবে ক'টার সময় তিনি ঐ ঘরটি ছেড়ে দেন?

—মঙ্গলবার সকাল সাতটায়।

—জাস্ট এ মিনিট! ঠিক করে দেখে বলুন, সোমবার সকাল সাতটা নয় তো?

—না! 'মঙ্গলবার' সকাল সাতটায়।

—ঐ তারিখ এবং সময়টা কি লালকালি দিয়ে গোল্লা দেওয়া আছে? এবং তার পাশে কি একটি সই দেওয়া আছে? থাকলে কার সই!

—গোল্লা দেওয়া আছে, সই দেওয়াও আছে। সইটা আমাদের ম্যানেজারের।

—কেন তিনি ওটা সই দিয়েছেন তা আপনি জানেন কি?

—জানি। ম্যানেজার সাহেব আমাকে জানিয়েছেন যে, আপনি তাঁকে ঐ রকম অনুরোধ করেছিলেন। হোটেল-রেজিস্টার যাতে ট্যাম্পার না হয় তাই তিনি সাবধান হয়েছিলেন। আমাকে তিনি ঐ রেজিস্টারটা সেফ-কাস্টডিতে রেখে একটি নতুন রেজিস্টার খুলতে বলেন। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে আমাকে সমন করা হবে—ঐ তারিখ এবং সময় কোন একটি খুনের মামলার গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স!

—এবার আপনি ঐ গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্সটি আদালতে দাখিল করুন।

এডনা পার্কার সেটা জমা দেবার পর বাসু তাকে পুনরায় প্রশ্ন করেন বোর্ডারদের টেলিফোন কলের বিল তৈরী করবার জন্য যে রেজিস্টার রাখা হয় আপনি কি সেটাও এনেছেন?

—এনেছি।

—ওটা দেখে বলুন তো সোমবার, না ইংরাজি মতে মঙ্গলবার রাত বারোটা চল্লিশ মিনিটে ঐ চল্লিশ নম্বর ঘর থেকে দমদম ভি. আই. পি. হোটেলে কি একটা টেলিফোন করা হয়েছিল?

সাক্ষী কী জবাব দিলেন তা শোনা গেল না। ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তেই কোর্টের প্রবেশ-পথে কী একটা হাঙ্গামা বেধে গেল। ঐ দিকে একটা হৈ চৈ ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। বিচারক বারম্বার হাতুড়ির শব্দ করলেন, তবু গণ্ডগোল

থামল না। একজন কোর্টপেয়াদা ছুটে এসে বিচারকের কানে কানে কি একটা কথা নিবেদন করল। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন জাস্টিস ভাদুড়ী ; বললেন, কোর্ট এ্যাডজর্নড ফর হাফ অ্যান আওয়ার !

এতক্ষণে ব্যাপারটা জানা গেল। আদালত থেকে কে একজন সাক্ষী ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। পুলিস প্রস্তুতই ছিল। আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা পার হতেই লোকটাকে পুলিস-ইন্সপেক্টার মনীশ বর্মণ ঝাপটে ধরে। কিছুটা ধস্তাধস্তি। পরে লোকটা গ্রেপ্তার হয়।

বারো

—শেষ পর্যন্ত জয়দীপ ? এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—বললে কৌশিক !

শ্যামল বললে, আমিও না। জয়দীপ দাদুর ছোরা দিয়ে মেসোকে খুন করবে এ যেন ভাবাই যায় না।

বাসু-সাহেব বলেন, তোমাদের কোথায় ভুল হচ্ছিল জান ? খুন করার পূর্বমুহূর্তে জয়দীপ জানত—সে মহেন্দ্রকেই খুন করছে, যোগানন্দকে নয়। ওরা যে ঘর বদলেছে সে কথা সবাই জানত—জানত না তিনজন—য়ু সিয়াঙ, আমি আর জয়দীপ। দ্বিতীয় কথা, জয়দীপের খুন করার আসল উদ্দেশ্য শুধু মহেন্দ্রকে হত্যা করা নয়, মহেন্দ্রের বালিশের নিচে যে উইলটা আছে সেটা হস্তগত করা এবং ঐ সঙ্গে জগদানন্দকে ফাঁসীতে ঝোলানো। একটা কথা নিশ্চয় স্বীকার করবে—যোগানন্দের বদলে মহেন্দ্র খুন হলে—ঐ ছোরায় খুন হলে—জগদানন্দ জামিন পেতেন না। বর্তমান মামলায় জগদানন্দের খুন করার কোন মোটিভ খুঁজে পাওয়া যায়নি। জোড়াতালি দিয়ে পুলিস যে কেসটা সাজিয়েছে সেটা ধোপে টিকল না, টেকার কথাও নয়—কিন্তু যোগানন্দের বদলে মহেন্দ্র খুন হলে জগদানন্দকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হত।

কৌশিক প্রশ্ন করে, তাহলে জয়দীপ পার্ক হোটেল থেকে এসে খুন করার পর রাত বারোটা চল্লিশে দমদমে ফোন করল কেন ?

—ধাপে ধাপে ভেবে দেখ। প্রথমত জয়দীপের প্রথম পরিকল্পনাটা কী ছিল ? মহেন্দ্র নিহত হবে জগদানন্দের ছোরায়। মহেন্দ্রের বিছানার তলা থেকে উইলটা চুরি যাবে এবং জগদানন্দ ফাঁসিতে ঝুলবেন। উইল না থাকায় সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তার স্ত্রী—অর্থাৎ সে নিজে। কিন্তু খুন করেই সে নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। হয়তো টর্চের আলোয় সে দেখেছিল খুন হয়ে গেল যোগানন্দ। তখন আর কিছু করার নেই। মহেন্দ্র কোন ঘরে শুয়েছে

তা সে জানে না। ফলে দ্বিতীয় খুন করবার মত সাহস তার তখন নেই। সে পালিয়ে গেল পার্ক হোটেলে। পার্ক হোটেলের ঘরটা সে ছাড়েনি, যদিও দমদমের হোটেলেও স্বনামে একটা ঘর নিয়েছিল।

খুব সম্ভব সে একটি অ্যাটাচি কেস নিয়ে এসেছিল, তার ভিতর রক্তাক্ত গায়ের চাদরটা সে লুকিয়ে নিয়ে যায়। সর্বাঙ্গ চাদরমুড়ি থাকায় তার গায়ে বা জামা-কাপড়ে রক্ত লাগেনি। পার্ক হোটেলে পৌঁছে তার মনে হল, জগদানন্দের পক্ষে যোগানন্দকে হত্যা করার কোনও হেতু খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখনও যোগানন্দের পক্ষে ব্ল্যাকমেলিং করার আষাঢ়ে পরিকল্পনাটা পুলিস করেনি। ও স্থির করল, ওকে দুটো জিনিস তখনই করতে হবে। প্রথমত নিজের জন্য একটা মোক্ষম আলেবাই তৈরী করা। দ্বিতীয়ত সন্দেহটা মহেন্দ্র-বিশ্বম্ভর পার্টির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। তারই ফলশ্রুতি ঐ টেলিফোন। পার্ক হোটেল থেকে সে দমদমে ফোন করে য়ু সিয়াঙের জবাবগুলো লিখে রাখে! আমাদের বলে, সে দমদমে হোটেলে পাশের ঘর থেকে ঐ জবাবগুলো শুনে শুনে লিখেছে।

কৌশিক বললে, তা না হয় বুঝলাম! কিন্তু আপনি ওকে কেমন করে সন্দেহ করলেন?

—ঐ টেলিফোন কলটা থেকেই। কে ওটা করতে পারে?

—কেন, বিশ্বম্ভরবাবু? মহেন্দ্র? যদি ওঁরাই এটা করে থাকেন।

—ভুল বলছ কৌশিক। তা কি সম্ভব? প্রথম কথা, ওরাই যদি খুন করে থাকে তবে সেটা ওরা মধ্যরাত্রে কেন জানাতে যাবে য়ু সিয়াঙকে? কাজের কথা তো কিছু ছিল না—একমাত্র সকালবেলা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছাড়া? তার জন্য ঐ মাঝরাতে ওরা ঐ ভাষায় টেলিফোনে কথা বলবে? ঐ 'পথের কাঁটা' দূর করার কথা? দ্বিতীয়ত রাত বারোটায় খুন করে, তার চল্লিশ মিনিট পরে কোথা থেকে ওরা ফোন করল? বাড়ির ফোন নিশ্চয়ই ব্যবহার করবে না। ফোনটা আছে বৈঠকখানায়—তার সামনেই শ্যামল শুয়ে আছে। বলতে পার, ওদের কাছে সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবি আছে। তাতেই বা কি? অত রাত্রে পাবলিক টেলিফোন বুথ পাবে কোথায়? কোনও পেট্রোল স্টেশান বা ওষুধের দোকান থেকে অমন ভাষায় ফোন কি ওরা করতে পারে?

—ঠিক কথা। এভাবে আমরা ভাবিনি।

—ফলে ফোন করার উদ্দেশ্য আর কিছু। আমার স্বতঃই মনে হল জয়দীপ ঐ ভাবে প্রমাণ রাখতে চেয়েছে যে, সে রাত বারোটা চল্লিশে দমদমের হোটেলে ছিল। জয়দীপ বুদ্ধিটা করেছিল ভালই—কিন্তু সে একটিমাত্র ভুল করে ধরা পড়ে গেল।

—কী ভুল?

—আমাকে সে চিনতে পারেনি! সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে, পার্ক হোটেলে গিয়ে আমি রেজিস্টার দেখে আসব।

—নীলিমা বলে, কিন্তু আপনি আমাদের বিয়ের কথাটা কেমন করে জানলেন? আমি তো বলিনি।

—না, তুমি বল নি। বলেছিল জয়দীপই। সেটাও তার একটা চালে ভুল হয়েছিল।

বাসু-সাহেব চলে আসবার আগে নীলিমা তাঁকে জনান্তিকে পাকড়াও করল। বলে, একটা কথা ব্যারিস্টার-সাহেব। আপনি বলেছিলেন—আদালতে আমি প্রচণ্ড একটা লোকসানের মধ্যে পড়ব। ওটা আপনারও ভুল হয়েছিল। প্রেমে আমি এমন কিছু অন্ধ হয়ে যাই নি যে, খুনী জেনেও জয়দীপকে আমি ক্ষমা করব।

বাসু বললেন, থ্যাংকস্ নীলিমা। বাই দ্য ওয়ে, তুমি 'শেষের কবিতা' পড়েছ?

—হঠাৎ এ প্রশ্ন?

—শেষের কবিতার শেষ কবিতার মোদ্দা কথাটা কী বল ত?

—'পরশুরামে'র মতে—'উৎকর্ণ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে!'

—ঠিক কথা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—অতঃপর তোমাদের জীবন 'শ্যামলে শ্যামল' এবং 'নীলিমায় নীল' হয়ে উঠুক!